কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সন্‌জীদা খাতুন

পরিবেশক :

ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলাবাজার
ঢাকা

প্রথম সংস্করণ :
মে, ১৯৫৮

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীনিতাই চন্দ্র দাস
১৩এ, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা—২৬

ছেপেছেন :
শ্রীমতী কৃষ্ণা গায়েন, এম, এ
মুদ্রণিকা
১৩এ, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা—২৬

প্রচ্ছদ-সজ্জা :
কাইয়ুম চৌধুরী

দাম : পাঁচ টাকা মাত্র



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সনজীদা খাতুন

প্রসংগ-সুচী

পরিচিতি

আমার পরম স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুন এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে যখন এম. এ. পড়বার জন্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এসে ভরতি হলেন তখনই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য পূর্বেই হয়েছিল। তাঁর কন্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাঁর মধ্যে সুশিক্ষিত পরিবারের প্রখর বুদ্ধিদীপ্তি ও অকুণ্ঠ জ্ঞানতৃষ্ণার উদার প্রভাবের ছাপ লক্ষ্য করে তাঁকে সাগ্রহে নিজের ছাত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। তারপর তাঁর নিজের ও তাঁর সমগ্র পরিবারেরই সুসংস্কৃত ভাবপরিবেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। সুখের বিষয়, শ্রীমতী সনজীদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রত্যাশা জেগেছিল, সুদীর্ঘ কালের নিকট সাহচর্যেও তা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। তাঁর সুপরিচ্ছন্ন সাহিত্যবোধ ও সদাজাগরূক অনুশীলন স্পৃহা আমাকে পরিতৃপ্ত করেছে। তাঁর মধ্যে যে উৎসুক জ্ঞানতৃষ্ণা ও অক্লান্ত শ্রমশীলতার পরিচয় পেয়েছি তা আধুনিক কালের ছাত্রসমাজে খুব সুলভ নয়। তাঁর এই নিত্য-জিজ্ঞাসু সাহিত্যচর্চার অন্যতম সুফল 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'-নামক গবেষণাগ্রন্থখানি।

লেখিকাকে এই গ্রন্থখানি রচনা করতে হয়েছে নির্দিষ্ট সময় ও বিধিপরিবিধির মধ্যে। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে থেকে নানা কারণে তাঁর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থপত্রিকাদি পাওয়াও সম্ভব ছিল না। তথাপি তিনি এক বৎসর সময়ে সীমাবদ্ধ উপকরণ নিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর তথ্যসংকলন ও পরিবেশন-নৈপুণ্য। এই গ্রন্থের শেষে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে তথ্য-সম্ভার সংগৃহীত হয়েছে তা অভিজ্ঞ গবেষকের পক্ষেও তৃপ্তির বিষয়

হতে পারত। কিন্তু শুধু তথ্য পুঞ্জীভূত করার মধ্যে নয়, পরন্তু তার সুনিপুণ বিশ্লেষণের মধ্যেই রয়েছে তাঁর যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয়। শুধু তাই নয়, এই তরুণ বয়সেও লেখিকা এই গ্রন্থে যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত না হলেও গৌরবের বিষয়। কাব্যের ভাববিচার ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেয়ে বিষয়বিচার ও ভাষা ছন্দ প্রভৃতি কাব্যাঙ্গ বিশ্লেষণের প্রবণতাই এ গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আমার মতে অসম্পূর্ণ উপকরণ নিয়ে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বিচারে অগ্রসর না হয়ে লেখিকা সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তথ্যগত অপূর্ণতা নিয়ে কারও কবিত্ববিচারে কিংবা কোনো কাব্যের রসবিশ্লেষণে ত্রুটি থেকে যাওয়া অনিবার্য। সত্যেন্দ্রনাথের মতো কবি সম্পর্কে একথা আরও বেশি খাটে। কারণ তাঁর কবিত্ব মূলতঃ আত্মনিষ্ঠ বা ভাবগত নয়, তাঁর কবিতা ছিল প্রধানতঃ বিষয়প্রতিষ্ঠ।

কিছুকাল পূর্বে হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি তৎপূর্বেই পরিকল্পিত ও সমাপ্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ এটি রচনার সময়ে লেখিকার সামনে সত্যেন্দ্রসাহিত্য আলোচনার কোনো আদর্শ ছিল না। আর সত্যেন্দ্রসাহিত্য প্রকৃতি ও আকৃতিতে কোনো পূর্বতন কবিকীর্তির অনুকৃতিমাত্র নয় বলে তাঁর পক্ষে উক্ত আলোচনার পথও সুগম ছিল না। এই অবস্থায় হরপ্রসাদ মিত্রের মতো অভিজ্ঞ লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বর্তমান গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবার খুবই আশঙ্কা ছিল। সুখের বিষয় লেখিকার সনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা ব্যর্থ হয়নি : 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ' প্রকাশের পরেও এই পুস্তকের প্রয়োজনহানি অথবা মূল্যাবনতি ঘটেনি ;. বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণে ও তথ্যসমৃদ্ধিতে এটির স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়োজনীয়তা এখনও স্বীকার্য। বস্তুতঃ এটিকে হরপ্রসাদ বাবুর গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করলেই সত্যেন্দ্রসাহিত্য-চর্চার পথ সুগমতর হবে বলে মনে করি।

গ্রন্থটি লেখিকার প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা। ফলে এটিতে স্বভাবতঃই কিছু কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। আশা করি কালক্রমে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা নিজেও এই বিষয়ে সচেতন

হবেন এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সেরে নিয়ে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দান করবেন। আমার বিশ্বাস লেখিকা যদি একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাহলে তাঁর সাধনায় বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়বে। আমার এই আশা দুরাশা নয়, তিনি তা সপ্রমাণ করুন—এই কামনা নিয়ে আমি তাঁর ভাবী জীবনের সাহিত্যসাধনার পথের দিকে সস্নেহ ও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকব।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
১৭ই আষাঢ় ১৩৬৪

প্রবোধচন্দ্র সেন

॥ প্রস্তাবনা ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে যেসব কবি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধ করি সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু জনপ্রিয়তার উপরেই সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে না, তার আলাদা বিচার চাই। সেই বিচারে অনেকে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাকে অসামান্য মূল্য দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে অকিঞ্চিৎকর বলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যথার্থ সত্য এই দু-এর মধ্যবর্তী বলেই মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল অতীত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ছোট বড় অনেক কবি সাহিত্যের আসরে অবতরণ করেছেন এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভাব ও ভঙ্গীর দিক্ দিয়ে যথেষ্ট পরিবর্তনও দেখা দিয়েছে। কাজেই বাংলার কাব্যজগতে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কতখানি, অর্থাৎ কালের নিকষপাথরে তাঁর কবিপ্রতিভা কতখানি খাঁটি বলে প্রমাণিত হবে, সে আলোচনার সময় উপস্থিত হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা ও কর্মকীর্তির স্থায়ী মূল্য কতখানি, তা নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থটিকে পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে সত্যেন্দ্রনাথের চরিতপরিচয় ও সাহিত্যিক পরিবেশ আলোচনার দ্বারা বিষয়বস্তুর অবতারণা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর কাব্যরচনার ভিত্তি, তাঁর কাব্যের বিভিন্ন দিক্ ও বিচিত্ররস সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ব-ও উত্তর-সূরিগণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস করেছি।

সত্যেন্দ্রনাথ যে একজন গল্পলেখকও ছিলেন, সে কথা আজকাল লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। আলোচনার পূর্ণতার খাতিরে পঞ্চম অধ্যায়ে সে বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের

গদ্য রচনার আলোচনা এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কবি হিসেবে তাঁকে বিচার করাই এর প্রধান লক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথের কবিধর্মী মনের সঙ্গে গদ্যধর্মী মনের এমন একটা যোগ ছিল যে, তাঁর গদ্য রচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই সত্যের উদ্‌ঘাটন না হলে তাঁর কাব্যপ্রতিভার আলোচনায় মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরচনা অপ্রচুর নয়, কিন্তু তার প্রচার অধিক হয়নি। কিছু-সংখ্যক রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। শুধু গদ্যরচনা নয়, তেরশ আট সাল থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর পর পর্যন্ত তাঁর গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র, বাণী, বিচিত্রা, বঙ্গলক্ষ্মী, দেশ ইত্যাদি অন্তত: আট-নয় খানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভবন এবং অন্যান্য দু-এক স্থান থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর যত রচনার সন্ধান করতে পেরেছি, গদ্যপদ্যনির্বিশেষে তার একটি কালানুক্রমিক তালিকা গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করে দিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের যে কটি ছদ্মনাম সকলের কাছে সুপরিচিত, তা বাদে আর-একটি নাম শ্রীমতী মমতা ঘোষের নিকট হতে উদ্ধার করা গেছে। নামটি 'ত্রিবিক্রমবর্মন্'। শ্রীশ্রীনবকুমার কবিরত্নের কালেই ইনিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই নামে প্রকাশিত রচনা 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছিল। পরিশিষ্টের ভূমিকায় উল্লিখিত কয়েকটি অপ্রাপ্ত পত্রিকার সন্ধান আমি অল্পদিন হল পেয়েছি। সেগুলিতে প্রকাশিত রচনাগুলির তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

সাল	মাস	পত্রিকা	পৃষ্ঠাসংখ্যা	রচনার নাম
১৩২১	বৈশাখ	ভারতী	৭৮	কালীপ্রসন্ন সিংহ (কবিতা)
,,	,,	,,	,,	অথ টিকিমেধ যজ্ঞ (কবিতা)
,,	জ্যৈষ্ঠ	ভারতী	২০১	সবুজপরী (কবিতা)
,,	আষাঢ়	ভারতী	৩২৬	পিয়ানোর গান (কবিতা)
,,	ভাদ্র	ভারতী	৪৪৭	জন্মাষ্টমী (কবিতা)
১৩২৩	বৈশাখ	ভারতী	৩	প্রণাম (কবিতা)

সাল	মাস	পত্রিকা	পৃষ্ঠাসংখ্যা	রচনার নাম
১৩২৩	শ্রাবণ	ভারতী	৪৭৮	মাতৃভাষা কি পেত্নী ভাষা? (প্রবন্ধ)—শ্রীনবকুমার কবিরত্ন
"	ভাদ্র	ভারতী	৫৮৩	অভিভাষণ না অতিভাষণ (প্রবন্ধ)—শ্রীনবকুমার কবিরত্ন
"	আশ্বিন	ভারতী	৫৯৫	অতিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব (প্রবন্ধ)—শ্রীনবকুমার কবিরত্ন
"	"	ভারতী	৬৮৪	জাফ্‌রাণিস্থান (কবিতা)
"	"	ভারতী	৭১০	রামছুটায়ন (কবিতা) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন
১৩২৪	কার্তিক	ভারতী	৭০০	বদ্ধঘরের ঘুল্‌ঘুলিতে (কবিতা)
"	পৌষ	ভারতী	৮৮৫	কাগজের হাতী বা নব্যদিঙ্‌নাগ্‌-প্রশস্তি (কবিতা) —কলমগীর
"	মাঘ	ভারতী	৯৫৫	রুষিযার কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) (ক) ভোরের বেলা (খ) তুষারনদীর জাগরণ (গ) নিবেদন (ঘ) তবু (ঙ) আপ্ত (চ) সাঁচ্চা চল্লা (ছ) কালো শাল
"	ফাল্গুন	ভারতী	৯৮৭	পুশকিনের কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) (ক) স্বপ্নময়ী (খ) মাদুলি (গ) ভগ্নহৃদয় (ঘ) আমার ছবি

সাল	মাস	পত্রিকা	পৃষ্ঠাসংখ্যা	রচনার নাম
১৩২৪	ফাল্গুন	ভারতী	১০৪৫	কোরিয়ার কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) (ক) জলৌকা ও মহীলতা (খ) ভগবানের চিড়িয়াখানা (গ) স্পষ্ট
১৩২৬	আষাঢ়	ভারতী	২০০	বুদ্ধপূর্ণিমা (কবিতা)
,,	শ্রাবণ	ভারতী	৩০৮	মার্কিণ কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) (ক) নেইঘরের ঘুমপাড়ানী (খ) কাঠ-গড়া
,,	আশ্বিন	ভারতী	৫১৮	জলচর ক্লাবের জলসারম্ভ (কবিতা)—শ্রীসলিলোল্লাস সাঁৎরা
১৩২৭	শ্রাবণ	ভারতী	২৮৯	বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ (প্রবন্ধ), (সমালোচন)—শ্রীঅশীতিপর শর্মা
১৩৩০	জ্যৈষ্ঠ	ভারতী	৯৩	বিদেশী কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) (ক) গান (খ) ভুলভাঙা (গ) সুন্দরীর অর্ঘ (ঘ) নির্বিরোধ ও স্বর্গ (ঙ) পাকা মুসলমান (চ) মৃত্যু ও টেক্স (ছ) বিরাট্ মানব (জ) শিশু (ঝ) মূর্খ

এছাড়া 'ভারতী' ১৩২৩ এর পৌষসংখ্যায় 'মাসকাবারী' আলোচনার মধ্যে 'কাব্যে নীতি' শীর্ষক একটি সমালোচনাসংক্রান্ত রচনা আছে। সেটি

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের 'অতিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব' কবিতার সমালোচনার জবাবে লেখা। রচনা সত্যেন্দ্রনাথের হওয়াই সম্ভব। 'শ্রীঅশীতিপর শর্মা' রচিত 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' প্রবন্ধ সত্যেন্দ্রনাথের 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' কবিতার আলোচনাবিষয়ক। প্রবন্ধে কবিতাটির সমালোচন-ছলে বিরূপ সমালোচকদের যুক্তিতর্কের হাস্যকরতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এটিও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বলেই ধরে নেওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের 'কলমগীর' ও 'সলিলোল্লাস সাঁৎরা' ছদ্মনামে লেখা কবিতাদুটির উল্লেখ উপরের তালিকায় করা হয়েছে। কবিতাদুটির নাম যথাক্রমে 'কাগজের হাতী বা নব্যদিঙ্‌নাগ্‌-প্রশস্তি' ও 'জলচর ক্লাবের জলসারঙ্গ'। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগ্রন্থে এই দুটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'নেইঘরের ঘুমপাড়ানী' কবিতাটিকে সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা বলে ধারণা করে গ্রন্থে সেই হিসাবেই কবিতাটির আলোচনা করেছি। কিন্তু এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে এটি একটি মার্কিণ কবিতার অনুবাদ।

সত্যেন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা বিশেষ হয়নি, এমন বলা যেতে পারে। তবুও তাঁর সম্বন্ধে যেখান থেকে যে আলোচনা ও অভিমতের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তারও একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল। বর্তমান গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে রচিত। এই লেখা প্রায় সমাপ্ত হবার পরে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র-রচিত 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। কাজেই এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবার যথোচিত সুযোগ আমার হয়নি।

এই গ্রন্থ রচনায় যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, পরিশিষ্টের তৃতীয় বিভাগে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল। পরিশিষ্টের শেষভাগে সমগ্র গ্রন্থটির একটি নির্দেশিকা সন্নিবেশ করেছি। আশা করি তাতে এই গ্রন্থ ব্যবহারের সহায়তা হবে।

এবারে গ্রন্থের মুদ্রাকরপ্রমাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। প্রধান প্রমাদ যেটি হয়েছে সে হচ্ছে আধুনিক ও প্রাচীন বানানের সংমিশ্রণ। ঢাকায় বসে কলকাতার এই প্রমাদ সংশোধন

আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হয়নি। দূরত্বের দোহাই এবারের মতো আমার অপরাধকে লঘু করে দেবে বলে ভরসা করি। পরবর্তী সংস্করণে আমার প্রহরা যাতে সতর্ক হয় তার জন্য প্রস্তুত থাকব। কোথাও কোথাও ছাপায় বেশ বড় রকমের ত্রুটি থেকে গিয়েছে ; যেমন পরিশিষ্ট ক-এর প্রথম পৃষ্ঠায় '১৩০৮' সালের জায়গায় '১০৩৮' ; পরিশিষ্টের ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পংক্তিতে 'বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি'র জায়গায় 'বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি' ও পরিশিষ্টের ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে ১৩২৯ এর জায়গায় ১৯২৯। আবার, ৪৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতি 'অভ্র-আবীর' গ্রন্থের 'জাতির পাঁতি' থেকে গৃহীত, 'সেবা-সাম' থেকে নয় ; এবং ১২৯ পৃষ্ঠার নবম পংক্তিটি উদ্ধৃতির অংশ নয়, গ্রন্থরচয়িতার মন্তব্য। আরও নানা ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। তবে সেগুলি গ্রন্থপাঠে তেমন বিঘ্ন ঘটাবে না মনে করে উল্লেখ করা হল না।

এই গ্রন্থটি মূলতঃ বিশ্বভারতীর এম. এ. পরীক্ষার গবেষণানিবন্ধ-রূপে রচিত হয়েছিল। ওই নিবন্ধটিকে বর্তমান গ্রন্থরূপে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার গবেষণাকার্য আরব্ধ ও সম্পন্ন হয়েছিল বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সযত্ন পরিচালনায়। বস্তুতঃ গ্রন্থখানির পরিকল্পনা থেকে রচনাসমাপ্তি পর্যন্ত প্রতি পর্যায়েই তাঁর সস্নেহ উপদেশনির্দেশ আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তাঁকে আমার অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ডক্টর অনিল কুমার গায়েন এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা গায়েন এম. এ. আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশেই গ্রন্থমুদ্রণের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ; নতুবা আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। তাঁদের উভয়ের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। অন্যান্য যাঁদের পরামর্শ ও সহায়তায় এই গ্রন্থ পুষ্ট হয়েছে তাঁদের মধ্যে ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ, ডক্টর মনোমোহন ঘোষ ও অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, কৃতজ্ঞচিত্তে এই কয়জনের নাম উল্লেখ করা অবশ্যকর্তব্য। আরও যাঁদের সহায়তা আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছে, তাঁদের নাম অনুল্লিখিত রইল।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করতে হয়েছে। গ্রন্থ রচনায় আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই এই গ্রন্থে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা অপ্রত্যাশিত নয় ; আমিও এই বিষয়ে অনবহিত নই। তথাপি ভরসা করি সত্যেন্দ্রসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে এবং তার পূর্ণতর আলোচনার উপকরণ সংগ্রহে আমার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে গণ্য হবে না। যদি এই গ্রন্থের ভাগ্যে পাঠকসমাজের অনুকূল দৃষ্টিপাত ঘটে এবং সত্যেন্দ্রপ্রতিভার প্রতি অধিকতর আগ্রহ সঞ্চারে কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তা হলেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনে উৎসাহ লাভ করব।

১১৩, সেগুনবাগান, ঢাকা
১লা মাঘ ১৩৬৪

আনজীলা খাতুন

প্রথম অধ্যায়

অবতারণা

ক—চরিত পরিচয়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, বিজ্ঞানানুরাগী ও ইতিহাসপ্রেমিক অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র এবং রজনীনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে নব-চেতনার সঞ্চার হয়েছে। সে ইংরেজি ১৮৮২ সালের কথা। পিতামহ অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি সাহিত্যিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ইতিহাস-প্রিয়তা লাভ করেছিলেন। যে যুগে তাঁর আবির্ভাব সে যুগটাও ছিল তাঁর মনোবিকাশের অনুকূল। তাঁর জন্ম হয়েছিল (বাংলা ১২৮৮, ৩০শে মাঘ, রবিবার) মাতুল কালীচরণ মিত্রের গৃহে। মাতুল ছিলেন সে যুগের অগ্রণী সাহিত্যসেবকদের অন্যতম। এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক-বোধের উত্তরাধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ করে সে যুগেরই সন্তান হয়ে উঠলেন। তিনি স্বদেশকে ভালবাসলেন। স্বদেশের দুঃখদুর্দশা তাঁর প্রাণে বড় গভীর ক'রে বাজল। তিনি এই দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। স্বদেশপ্রেমের ঐকান্তিকতায় দেশের মূল দুর্বলতাগুলো তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখতে পেলেন বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির অভাব কি করে ভারতবাসীকে অন্ধ করে রেখেছে। তারা যা করে, তা বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে করে না—অন্ধভাবে পূর্ব সংস্কারের অনুগমন করে মাত্র। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে নানা অবিচার, অনাচার। মানবত্বের অবমাননা হচ্ছে দেশের সর্বত্র। তিনি বুঝলেন এই ত্রুটি দূর না হলে দেশের দুঃখদুর্দশা ঘুচবেনা, দেশ চিরদিনই বিদেশের কবলিত হয়ে থাকবে। মানুষে মানুষে একাত্মবোধ জাগাতে হবে সবার আগে। তিনি উপলব্ধি করলেন এর জন্যে চাই জ্ঞান আর প্রেম। আরও চাই শক্তি, প্রাণময় উৎসাহ এবং আশা। এইজন্যে এসব শক্তির আধার স্বরূপ এক একটি বস্তুকে আরাধনা করে হোমশিখা প্রজ্জলিত করে যজ্ঞশেষে 'সাম্য-সামে'র গান গেয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেন জনচিত্ত উদ্বোধনের পথে।* এ যাত্রা তাঁর

* 'হোমশিখা' সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু তাঁর সমস্ত কাব্যের মূল কথাগুলি সংহত আকারে পাওয়া যায় বলে এ গ্রন্থকে সমগ্র কাব্যের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

কোনকালেই ফুরোয়নি। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন, ভারতবাসীকে তার মহিমোজ্জ্বল ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁর সেই কাজের ভার দিয়ে গেছেন মানবত্বে বিশ্বাসী পরবর্তী স্বদেশ-হিতৈষীদের হাতে।

অনেক প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের মতই সত্যেন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে বাইরের কাব্য ও সাহিত্যাদির প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিল বেশী। ফলে, তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় (১৮৯৯ খৃঃ) দ্বিতীয় বিভাগে এবং এফ. এ. পরীক্ষায় (১৯০১ খৃঃ) তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েও, পরিশেষে বি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারেননি। মামুলী বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন শেষ হলে তিনি মাতুলের ব্যবসায় কার্যে যোগদান করেন। কিন্তু এই অর্থকরী পথ তাঁকে বাঁধতে পারল না। এর বহু পূর্বেই তাঁর সাহিত্য-রচনার হাতে-খড়ি হয়ে গেছে।* এবারে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করলেন।

বেণু ও বীণার 'দুর্দিনে অতিথি' (শ্রাবণ, ১৩০৪), 'ঝড় ও চারাগাছ' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর কিশোর বয়সের কোমল হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর শেষ জীবনের কবিতাতেও দেখা যাবে। প্রভেদ এই, এখানকার আত্মপ্রকাশে শিশুর মত সরলতা আছে: পরবর্তীকালের প্রকাশ পরিমার্জিত। বালক বয়স থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় সমাজে অবজ্ঞাত দুঃখী আতুরজন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কীটের জন্যও করুণায় বিগলিত হয়েছে। এ সময়ে তিনি কেবল বেদনাই অনুভব করেছেন আর

* তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ। এটি কোন সাহিত্যকর্ম নয়। সে সময়ে তাঁর বয়স মাত্র তের বৎসর। 'ভারতীর' ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত (৩পৃঃ) 'ছন্দ সরস্বতী' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন। এই সময়ে লেখা তাঁর প্রথম কবিতা

'কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞান হীন আমি দীন সন্তান তোমার'॥—

এমনিধারা গোটা আষ্টেক দশেক লাইন। 'বেণু ও বীণার' 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'—কবিতাটি ১৩০০ সালে লেখা।

পরবর্তীকালে এর প্রতিবিধানের চেষ্টায় জন-চিত্তকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন; কখন উদাত্ত আহ্বানে, কখন বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের কঠিন কশাঘাতে।

এফ. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার সময় পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 'সবিতা'য় (১৩০৭) এর পরিচয় সুস্পষ্ট। এই দীর্ঘ কবিতাটি 'হোমশিখা' গ্রন্থের প্রথম কবিতা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং এই বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট জ্ঞানের ছাপ পড়েছে। তাঁর বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাধারা সারা জীবনের রচনাকেই বৈশিষ্ট্য দান করে মূল্যবান্ করে তুলেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম লেখা স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (১৩০০) ১৩১৩ সালে প্রকাশিত বেণু ও বীণা গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। এর পূর্বেই ১৩১২ সালে 'সন্ধিক্ষণ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তাতেই জনসমক্ষে তাঁর স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এর পর থেকে তাঁর মৃত্যুর পর পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থেই আমরা তাঁর এই দেশ-প্রীতির নিদর্শন দেখতে পাই।

(সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসচেতন ও অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে শুধু স্বদেশপ্রেম নয়—বিশ্বপ্রেম, মানবত্ববোধ, সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম-বোধ, মাতৃভাষানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ হয়েছিল। বিশ্বপ্রেমিক, মানবত্বের পূজারী ও সাম্যবাদী সত্যেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে গেয়ে গেছেন,

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

* * *

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে'।

'মানুষ' তাঁর কাছে কৃত্রিম বিভেদ এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর উর্ধে। এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের দিকে চেয়েই তিনি জেনেছেন,

'বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।'

আর জেনেছেন,

'শূদ্র মহান্, গুরু গরীয়ান্'।

মেথরকে জেনেছেন, 'নির্ব্বিকার সদাশুচি' 'গঙ্গাজল' বলে।
তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে বলেছেন,

'এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।'

সমাজের নানা অন্যায়, অবিচার তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিয়েছে। বালক বয়সে মাতার সঙ্গে একাদশী করতে গিয়ে তিনি বিধবাদের দুঃখ উপলব্ধি করেন। সেই থেকে তিনি এই সকল আচারের বিরোধী হয়ে পড়েন। 'নির্জ্জলা-একাদশী' কবিতায় তিনি একাদশীর বিধান-কর্ত্তাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেছেন। এ সূত্রে 'দোরোখা একাদশী, কবিতাটিও স্মরণীয়। মাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি তাঁকে সমাজের এই দিকটি সম্বন্ধে সচেতন করেছিল। উদার মতাবলম্বী সত্যেন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মাতৃভক্তির অনেক নিদর্শন বন্ধুমহলে সুপরিচিত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতিভরা কোমল অন্তঃকরণে বিশেষ ঘটনাগুলো বড় গভীর ছায়া রেখে যেত। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

সত্যেন্দ্রের চিত্ত এমন সজাগ ছিল যে জগতের যে কোন স্থানে অসাধারণ মহৎ ঘটনা কিছু ঘট্‌লেই তাঁর অন্তর সাড়া দিয়ে উঠ্‌ত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, ম্যাক্‌সুইনীর প্রায়োপবেশন, টলষ্টয়ের গৃহত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা—সবই তুল্যভাবে সত্যেন্দ্রকে বিচলিত কর্‌ত।

—(সত্যেন্দ্র পরিচয় ; 'প্রবাসী' ১৩২৯ শ্রাবণ ; পৃঃ ৫৯০)

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করত। সে যুগের হিন্দু-মুসলিম মিলনকামী মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই দুই

জাতিকে একত্র মিলিত হতে দেখলে তাঁর আনন্দের আর পরিসীমা থাকত না। 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থের 'ফুল শিণি' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

প্রবীণ সাহিত্যিক কালীচরণ মিত্রের প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে তিনি আনন্দলাভ করতেন। তাঁর সাহিত্যরস বিচারের শক্তি সম্বন্ধে কবিবন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

'সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্দ্রের খুব উঁচু ছিল। তিনি বল্‌তেন—"বাংলাদেশে আড়াইজন সত্যিকার কবি জন্মেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্র-নাথ এক, আর মাইকেল আধ।" আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি স্বীকার করতেন দু'জনকে—কালিদাস, তারপর রবীন্দ্রনাথ। য়ুরোপেও তিনি তিন-চারজনকে মাত্র শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্বীকার কর্‌তেন—গ্যেটে, হিউগো, শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তিনি কবি বলেই স্বীকার করতেন না; এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রের ধারণায় পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আমেরিকার ওপর তিনি বড় চটা ছিলেন সে দেশে একজনও খাঁটি কবি জন্মেনি ব'লে। তিনি বল্‌তেন—"ওদের দেশে দুটি মাত্র ত কবি, এক লংফেলো আর হুইট্‌ম্যান্‌; একজনের ছন্দ মিল জুটেছিল ত ভাব জোটেনি, অপরের ভাব জুটেছিল ত ছন্দ মিল জোটেনি। দুয়ের সমন্বয় না হলে কি কবি?" এই দুয়ের সমন্বয় থাক্‌লেও তিনি ব্রাউনিংকে বড় কবি ব'লে স্বীকার কর্‌তেন না, বল্‌তেন—"ওসব কবিতা নয় ত হেঁয়ালি।" আমাদের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাটক রচয়িতা ব'লে দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল'।

—('সত্যেন্দ্র পরিচয়' 'প্রবাসী' ১৩২৯ শ্রাবণ; পৃঃ ৫৮৯—৫৯০)

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু বিশ্বকবিকে চিনতে সত্যেন্দ্রনাথের একটুও দেরী হয়নি। তাই ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত করবার আগেই তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করে সত্যেন্দ্রনাথ দেশবাসীর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালন করেছিলেন।

পুরাণ ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল গভীর। পুরাকালের জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রদ্ধেয় চরিত্র তাঁর পূজা পেয়েছে। তাঁর অনেকগুলি গাথাকবিতা এঁদের বন্দন-সংগীতে মুখরিত। যার মধ্যে মহত্ত্ব-সম্ভাবনা নিহিত বলে মনে করতেন তাকেই কবি পূজার অর্ঘ্য দিতেন। 'ছেলের দল'কে তিনি অর্বাচীনতার দোষ দিয়ে অবহেলা করেননি। কিশোরদের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল।

ইতিহাস-পুরাণ ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, নানা ভাষা ও সাহিত্য এবং বিভিন্ন দেশীয় আচারাদি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল ব্যাপক। তিনি ফারসী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। 'হসন্তিকা' গ্রন্থের 'জবান-পঁচিশী' কবিতায় তাঁর ঊনত্রিশটি ভাষাজ্ঞানের পরিচয় আছে। 'জ্যোতিষের চর্চা তাঁর অবসর বিনোদনের ব্যসন ছিল' (উল্লিখিত প্রবন্ধ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। পিতামহের মূল্যবান্ পুস্তকাগারটি তাঁর হাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পুস্তক-বিলাসী। অনেক চেষ্টা করে তিনি নানাস্থান থেকে ভালো ভালো গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর পুস্তকাগারে যে দুটি মূল্যবান্ সংগ্রহ সুধীজনের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে, তার একটি 'জ্ঞান তপস্বী' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, অপরটি সত্যেন্দ্রনাথের। এই সাধক তাঁর জ্ঞানকে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন। নানা ভাষার সাহিত্যে অধিকার থাকার দরুণ তিনি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে অনেক মূল্যবান্ সম্পদ দিয়ে যেতে পেরেছেন। পান্তম্, তান্‌কা ইত্যাদি নূতন ধরণের সনেটের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটেছে তাঁরই সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে। কি কবিতায়, কি নাটকে, কি উপন্যাসে, সর্বত্রই তিনি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যরস বাংলাভাষীর কাছে পরিবেশণ করে গেছেন। এ সম্বন্ধে যে তাঁর কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল তা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করি,

'অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনো কবির সন্ধান পেলে সত্যেন্দ্র তাঁর কবিতা পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেন; সেই কবিতা অশেষ চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারলে আগ্রহে তা' সেই কবিরই ছন্দে অনুবাদ করে' বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কর্‌তেন। নানা দেশের কবিত্বরস বিশেষ-

ভাবে সম্ভোগ করবার সুবিধা হবে বলে' তিনি নানা দেশের ভাষা শেখবার চেষ্টা করতেন।'

—('সত্যেন্দ্র পরিচয়'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

পল্লীর ভাষার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অতুলনীয়। গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তাঁর মত গ্রাম্য পরিভাষা সংগ্রহ খুব কম লোকেরই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সাহসিকতার সঙ্গে কবিতায় ব্যবহার করে তিনি আপন কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এসম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান্ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেগুলি অলিখিত থাকায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

ছন্দ সৌষম্য সম্বন্ধে তাঁর ক্ষমতা ও কৃতিত্বের কথা প্রায় প্রবাদ স্থানীয় হয়ে রয়েছে। যেমন ছন্দ বিন্যাসে তেমনি অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি মাত্রেরই প্রকৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথেও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। তাঁর প্রকৃতি প্রীতির নিদর্শন কাব্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সত্যনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ যা কিছু সত্য বলে জানতেন—তার অন্যথা কিছুতেই স্বীকার করতেন না, সহ্যও করতেন না। তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রও যদি ভিন্নমত প্রকাশ করতেন, তবু তিনি আপন বিশ্বাসে অবিচলিত থাকতেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে পূর্বোদ্ধৃত এক অংশে দেখা গেছে—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল তা তাঁর পরম পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও পরিবর্তিত করতে পারেননি। এমনি ছিল তাঁর দৃঢ়তা। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোনও এক সময় রবীন্দ্রনাথ, এবং সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজীর কোনও কাজ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ এবং কঠোর মন্তব্য করেন। এর মধ্যে গান্ধীজীর প্রতি যে অবহেলার ভাব দেখা গিয়েছিল, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'গান্ধীজী' কবিতায় তার বিশেষ নিন্দা করেছিলেন। তাঁর কাছে যা

অসত্য—তা শ্রদ্ধা ভালবাসার দোহাইও মানেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলতেন, 'সে যে সত্যেন্দ্র'!

—(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ)

এ নিষ্ঠা তাঁর সকল ক্ষেত্রেই সমান ছিল। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে কখনই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধেও কিছু রেখে ঢেকে বানিয়ে বলতে তিনি জানতেন না।

মানবত্ব বোধের ঔদার্য থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের সকল মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই চারিত্রপূজা ছিল তাঁর চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের পট সংগ্রহ করে তিনি গৃহসজ্জা করতে ভালবাসতেন। আবার এঁদের মধ্যে কেউ বিশেষ অশ্রদ্ধেয় কাজ করলে মত বদল করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। যেখানে যে কেউ মহৎকাজ করেছেন তাঁর প্রতিই সত্যেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার ডালি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানই হোক বা সামান্য মেথরই হোক। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিমিত। এঁর উদ্দেশে তিনি অনেক কবিতা-পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার নিন্দা প্রশংসায় কখনই কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না। তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন স্বল্পভাষী। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ এই কবির 'চম্পা' কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করায় তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনার 'চরমমূল্য' পেয়েছেন মনে করে আনন্দিত হয়েছিলেন। (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) কিন্তু সে আনন্দ অন্তরেই সংগুপ্ত ছিল। বাল্যবন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে জানা যায় তাঁর মনে কবি যশাকাঙ্খা কিংবা সাহিত্য সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভের আকাঙ্খা বর্তমান ছিল।*

রসিকপুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ মৌখিক কথাবার্তায় যেমন—(চিঠিপত্র পড়ে জানা যায়), পত্রাদিতেও তেমনি স্বরচিত ছড়া কাটতে ভালবাসতেন। যেমন পত্রের শেষে,

* 'সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা' অধ্যায়ে এসম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যাবে।

'আমার সম্মান নিত্য
হইতে বিশ্বাসী ভৃত্য'

তাঁর এই অভ্যাস Pope এর জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ কবি Pope কবিতা রচনার অভ্যাসের জন্য পিতার কাছে প্রহার খেয়েও বলেছিলেন,

'Papa Papa pity's sake,
I shall never verses make'.

পদ্য রচনার ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের অবস্থাও অনেকটা এইরকম ছিল। বাংলার গুপ্ত কবির সঙ্গেও এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। তাঁর রসিকতা করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা 'হসন্তিকা' ইত্যাদি গ্রন্থের হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে।

কিশোরদের জন্য লেখা কবিতাগুলিতে সতেন্দ্রনাথের আবেগভরা মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়,

'নারী সত্যেন্দ্রের চোখে মহিমাময়ী দেবী, মায়ের জাতি!'
—(সত্যেন্দ্র স্মরণে; 'ভারতী' ১৩২৯, পৃঃ ৪০২)

এই 'মায়ের জাতির' উপর সমাজের যেসব উৎপীড়ন—তার বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন।

শিশুদের প্রতিও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ ছিল। তাই বাৎসল্য-রসের কবিতাতে অতখানি আন্তরিকতা ধরা পড়েছে। মাতুলের বালিকা কন্যার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। 'কুহু ও কেকার' শিশুর মৃত্যু বিষয়ক কবিতাগুলি এই ঘটনা উপলক্ষে লেখা। এগুলির বেদনা-করুণতা মর্ম্মান্তিক।

ব্যক্তিজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ নাস্তিক বলে পরিজ্ঞাত ছিলেন (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁর কবিতায়, বিশেষ করে শেষ দিকের ভগবদ্ভক্তিমূলক কবিতাগুলিতে যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় প্রকৃত পক্ষে তিনি নাস্তিক

ছিলেন না। তবে ধর্ম বলতে তিনি কতকগুলি প্রাণহীন আচার বুঝতেন না, সেও সত্য।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে পাণ্ডিত্যভার, ছন্দ-সর্বস্বতা, সাময়িকতা প্রভৃতির যে অভিযোগ আছে—সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সেগুলির অনেকখানি স্বীকার করে নিয়ে তার মূল কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

'তাঁহার চরিত্র ছিল বালকের মত অপরিণত। তিনি বালকের মতই উত্তেজনা প্রবণ, বালকের মতই কৌতূহলী, এবং বালকের মতই সরল ও অকপট ছিলেন। বিশ্বাসের সাহস, অবিশ্বাসের অসহিষ্ণুতা, এবং পক্ষপাতের উগ্রতা—এই তিন দোষই তাঁহার মানস প্রকৃতিতে কিছু অধিক পরিমাণে ছিল'।

—(আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' পৃঃ ২০০)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ, তার বিচার হবে 'মূল্য বিচার' প্রসঙ্গে (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। সেখানেই তাঁর পাণ্ডিত্য-ভার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এখানে শুধু এইটুকুই বলবার রয়েছে যে মোহিতলাল যাকে সত্যেন্দ্রনাথের বালক-সুলভ অপরিণতির ফল বলেছেন, তাকে আমরা বলব কবি-সুলভ কোমল হৃদয়ের অনুভূতিপ্রবণতার লক্ষণ। একে দোষ বলে গণ্য করা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা তাঁর জীবৎকালেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। তিনি চারিত্রিক ও সাহিত্যিক উভয় প্রকার গুণেই সকলের মনোহরণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি দেশবাসীর প্রীতি এত অধিক ছিল যে মৃত্যুর পর (বাংলা ১৩২৯) তাঁর স্মৃতিরক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব বিপুল উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হয়। তবে কর্ম্মকুশলতার অভাবে সে উৎসাহ কার্য্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু দেশের সুধীবৃন্দ যে তাঁকে হৃদয়ের কোন স্থানে আসন দিয়েছিলেন, এ থেকেই আমরা তা অনুমান করতে পারি।

খ—সাহিত্যিক পরিবেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার যে ধারা প্রবর্তন করেন, তা অনুসরণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কয়েকজন কবি। ঐ যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে এঁদের মত এতটা বৈশিষ্ট্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভ্রাতাদের মধ্যে এই কয়জনই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বস্তুত: তখনকার দিনের বাংলার সব কবিই রবিপ্রদক্ষিণ করেই জ্যোতি: বিকিরণ করছিলেন। এই রবিমণ্ডলীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বৃহস্পতিস্থানীয়। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়বড়াল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতন্ত্র পথে সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকদের উপরে তাঁদের প্রভাব নানা কারণে সত্যেন্দ্রনাথের মত এত সুস্পষ্ট, গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে স্বীকৃত হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ কবি গোবিন্দদাসকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি নিজেও মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্ষয় বড়ালের উপরেও রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট ব্রাউনিঙ, হুগো প্রভৃতির প্রভাব ছিল। তৎকালীন কিম্বা পরবর্তী কোন কবির উপর অক্ষয় বড়ালের কোন প্রভাব দেখা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে সেকালে বেশ কয়েকজন কবি কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু উক্ত গুরুর ভঙ্গিতে এমন একটি উগ্র স্বাতন্ত্র্য ছিল, যা শিষ্যদের পক্ষে অনুসরণ করা ছিল প্রায় অসাধ্য। সুতরাং এই পথ শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সাহিত্যগগনের মধ্যাহ্নসূর্যস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আপন মর্যাদা লুপ্ত করে বসেছিলেন। তাই প্রতিভা থাকা সত্বেও তিনি হয়ে রইলেন অবহেলিত। অন্যথায় তাঁর রচনাভঙ্গির বলিষ্ঠতা যে পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেনি, এমন নয়। বিশেষ ভাবে আলোচনা করলে আজও কোন কোন কবির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যাঁদের লেখায় ভাবে কিংবা ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের ভঙ্গির বিশেষ ছায়াপাত হয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তাঁর হাসির কবিতা বাংলা

সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্তিকার' কোনও কোনও কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানের' ছাপ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমমূলক গানগুলিও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্য যখন এই অবস্থায় সেই সময় রবীন্দ্রভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ আপন সুরের সুপ্রকট পার্থক্য নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন। ছন্দ ও ভাষার উপর তাঁর অনন্যসুলভ অধিকারের দরুণ তিনি অল্প দিনেই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। রবি-মণ্ডলীতে বৃহস্পতির স্থান অধিকার করতে তাঁর দেরী হলনা। তাঁর প্রতিভার দীপ্তির কাছে অন্যান্য গ্রহেরা ম্লান হয়ে গেলেন।

চরিত পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অসমসাহসী মৌলিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যবোধের জন্মগত অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া পিতামহের দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানলিপ্সা তাঁর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার ছিলেন সে যুগের একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেই কাজে প্রবৃত্ত হন। সত্যেন্দ্রনাথও যে একথা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। অক্ষয়কুমার নবজাত গদ্য-সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে যথেষ্ট শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। শিল্পবোধের উৎকর্ষ সত্যেন্দ্রসাহিত্যকেও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 'জ্ঞানতপস্বী' অক্ষয়কুমার একটি মূল্যবান্ পুস্তক সংগ্রহ রেখে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই সব পুস্তক থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করতে সক্ষম হন। সেই জ্ঞানের প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে আছে। এই ভাবে আপনাকে গড়ে নেবার কাজে তিনি পিতামহের কাছ থেকে বহুল পরিমাণে সাহায্য পেয়েছিলেন।

কালীচরণ মিত্র ও তাঁর বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথম জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। মাতুল কালীচরণ মিত্রের উৎসাহেই তিনি প্রথম অনুবাদকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এই দুজনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গল্প রচনাতেও উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। মাতুলের 'হিতৈষী' পত্রে প্রথম রচনা প্রকাশিত হবার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা বিষয়ে উৎসাহিত হন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি মাতুলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'তীর্থসলিল' প্রকাশের

আগে পর্য্যন্ত তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ছাড়া আর কোন প্রসিদ্ধ পত্রে রচনা প্রকাশ করেননি। বালক বয়স থেকে এইসব প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকের সাহায্যে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল।

বন্ধুসঙ্গ সকলের পক্ষে লাভজনক হয় না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুভাগ্য রীতিমত ঈর্ষ্যার যোগ্য ছিল। কিশোর বয়সেই তাঁর সাহিত্যরসিক বন্ধু লাভ হয়েছিল। তাঁর প্রথম পুস্তিকার প্রকাশ ঘটনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 'সবিতা' মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে তাঁর কিশোর হৃদয়ে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন, তার মূল্য সামান্য নয়। এছাড়া ১৩৪৯ সালের প্রবাসী, অগ্রহায়ণ এবং মাঘ সংখ্যায় সুরেশচন্দ্র রায় লিখিত 'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে প্রকাশিত পত্রগুলি থেকে আমরা জানতে পারি বাল্যবন্ধু, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পত্রে কবির চমৎকার সাহিত্যালোচনা হত। তাঁর কাছে লেখা পত্রে কবি নিজের সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই ধরণের আলোচনা করবার মত বন্ধু সাহিত্যসাধকদের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান।

এরপর সতীশচন্দ্র রায় ও অজিত চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রনাথের দুই অকালমৃত বাল্যবন্ধুর কথা বলা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথের মত এঁরাও ছিলেন পরম রবীন্দ্রভক্ত। সাহিত্য ক্ষেত্রে উভয়েরই বিশেষ দান আছে। এঁদের সাহিত্যিক মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন—

'সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরবর্ত্তী বিশিষ্ট কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।'

—(বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—৩য় খণ্ড)

সতীশচন্দ্র রায় গাথা কবিতা রচনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের ও সেইদিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায়,

'ইহার [গাথা কবিতা রচনার] ইঙ্গিত কবি পাইয়াছিলেন সতীশচন্দ্রের রচনায়।'

(ঐ)

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সত্যেন্দ্রনাথ যে দুটি শ্রেষ্ঠবন্ধু লাভ করেন, তাঁরা হচ্ছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। উভয়েই নাম করা সাহিত্যিক। এঁদের সংসর্গে এসে সুধী সমাজে অনায়াসে পরিচিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাবে উপকৃত হয়ে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে তাঁর নতুন রচনা পড়ে শোনাতে বড় ভালবাসতেন। ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত চারুচন্দ্রের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, তাঁদের চরিত্রের সাধর্ম্য পরস্পরকে কত ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতি উভয়ের অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা কি ভাবে বিভিন্ন উপলক্ষে নিবেদিত হয়েছে, উভয়ে একত্রে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই বন্ধুটিও তাঁরই মত দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণ, মেলা দেখা ইত্যাদিতে উৎসাহী ছিলেন। এই সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ পল্লী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার গণ্ডী বাড়াবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাংলা গদ্যের শক্তিশালী লেখক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'পাদচারণ' কবিতাগ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে প্রমথ চৌধুরী অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তার জবাবে একটি পত্র কবিতা লেখেন।*

উল্লিখিত কজন ছাড়াও 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'বঙ্গদর্শন', 'যমুনা' প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্যিক মণ্ডলীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। ('শারদীয় জনসেবক' ১৩৬১, পৃঃ ১১৯। 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা'—হরপ্রসাদ মিত্র)। এঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ। এঁদের সাপ্তাহিক মজলিসের প্রধান বিষয় ছিল নতুন রচনা পাঠ। এরই একটিতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। এই আসরগুলি রীতিমত লোভনীয় অনুষ্ঠান ছিল। এই দলের সকলের যে সাধারণ গুণটি তাঁদের একত্র মিলিত করেছিল, তা এঁদের অকৃত্রিম রবীন্দ্র-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথও

---

* কবিতাটি ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সবুজপত্রে'র ২৩০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল।

বিভিন্ন সময়ে এঁদেরকে একত্রিত করে তাঁর অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করে আনন্দ লাভ করেছেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁর কথা সর্বশেষে আবার বলব—তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় এঁর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তবে পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবেই লেখনী চালনা করেছেন। বাংলা ১৩১৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে বলেছেন। (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ১২০)। এর পূর্বে ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃঃ ৪৯৪) 'নব্য কবিতা' সম্বন্ধে তাঁর একখানি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর স্বনামে ও ছদ্মনামে তাঁর আরও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। এতেও তাঁর যে ক্ষমতার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে তা অস্ফুট থাকতে পারত। এইরকম অগ্রজ সাহিত্যিক এবং বন্ধুদের সাহচর্য তাঁর এ ক্ষমতাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইংরেজি ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অধিক হয়। ১৯১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। এইভাবে কবিগুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছিলেন। এরই গুণে তিনি কবিগুরুর ব্যর্থ অনুকরণ চেষ্টা এড়িয়ে আপন পথে আপন সাধ্যানুযায়ী সাহিত্যরচনা করে যেতে পেরেছেন। এজন্য যে মনের জোর চাই, তা তাঁর নিজের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; আর তার সঙ্গে ছিল তাঁর অন্য বন্ধুদের উৎসাহ।

এই পর্যন্ত গেল তাঁদের কথা, যে সব সাহিত্যিক বা সাহিত্যানুরাগী সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সহায়ক হয়েছিলেন। এঁদের প্রতিবেশ তাঁকে কত ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সেকথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর উপর তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদির প্রভাবের কথাও কিছু উল্লেখ করব। সমাজ এবং দেশের আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন সত্তার অধিকারী হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে ত সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী

সত্যেন্দ্রনাথও এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি।

শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনী'র একস্থানে বলেছেন—

'বাংলা দেশের আকাশ তখন [১২৯০ সালে] রাজনৈতিক উত্তেজনায় ধূমাচ্ছন্ন।'

এর দুবছর আগে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে। তাঁর জন্মের সালেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়ে পরাধীন জাতির মনে নবপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী নানা ধারায় চিন্তা করতে সুরু করেছিল। ১২৯০-৯১ সালের কথায় শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে বলছেন—

'তখন প্রায়ই ইংরেজ কর্ম্মচারী, বণিক ও গোরারা ভারতবাসীর উপর কারণে অকারণে উপদ্রব করিত, নিষ্ঠুর হত্যার কথাও সময়ে সময়ে শোনা যাইত; কিন্তু তাহার প্রতিকার প্রায়ই হইত না।'

সুতরাং বিদেশীশাসকদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ধূমায়িত হতে লাগল। ফলে ১২৯২ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী এই আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। ১৩০০-১৩০১ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলছিল। ১৩০০ সালে বালক সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশ সম্বন্ধে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নামে এক কবিতা লিখলেন। ১৩০৫ সাল থেকে কয়েকজন নেতার পরিচালনায় জনসাধারণ ক্রমে সংঘবদ্ধ হতে লাগল। লোকমান্য 'তিলক' শিবাজী উৎসবের প্রবর্ত্তন করে জাতীয় ঐতিহ্য স্মরণের বিশেষ আয়োজন করলেন। সাহিত্যে মারাঠা ও শিখ ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়সমূহ উৎসাহের সঙ্গে আলোচিত হতে লাগল। জাপানের ওকাকুরা, ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণ এই সময় অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। এরই কিছুদিন পর পাশ্চাত্ত্য শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে জাপানের জয় হল। তাতে এশিয়ার শক্তির প্রমাণ হয়ে গেল। সেই সময়ে শুধু বাংলা বা ভারতই নয়, সমগ্র এশিয়াই প্রাণচাঞ্চল্যে অধীর হয়ে মুক্তি আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইংরেজ

শাসকগণও রাজদ্রোহ রোধের চেষ্টায় তৎপর হয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে লাগলেন। একদিকে লর্ড কার্জনের শাসন, অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা জনগণকে উন্মত্ত করে তুলল। ১৩১২ সালে কার্জন বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে সেদিন ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের যে শক্তির প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, শাসকসম্প্রদায় তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এর আগে থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশের দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। ১৩০৫ সালে রচিত এবং ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'সবিতা' কাব্যে তিনি জ্ঞানের অর্হণার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য স্মরণ করে পরাধীনতার বেদনায় বলেছেন—

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,

('সবিতা,' হোমশিখা)

বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলনে মুখর পরিবেশেও সত্যেন্দ্রনাথ নীরব থাকেননি। ১৩১২ সালে তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' প্রকাশিত হয়। এতে পরাধীন জাতির প্রতি জাগ্রতির আহ্বান উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হল। বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনে ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। রাজনীতিতে তাদের অংশ-গ্রহণ জনচিত্তে বিশেষ সাড়া জাগায়। সতেন্দ্রনাথের 'সন্ধিক্ষণে' এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। পরবর্তী বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ১৩২৬ সালে রাওলাট আইন পাশ। এর প্রতিবাদে জোর আন্দোলন শুরু হল। পুলিশের জুলুমও চরমে পৌঁছল। তার পরিণাম জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এঘটনার উল্লেখ রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফরিয়াদ' কবিতায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারীদের নেতা ডায়ার নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবৃন্দকে ক্ষতিপূরণদানের প্রস্তাব করায় উক্ত কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৩২৭ সালের দিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীজির বিপক্ষ মতাবলম্বীদের মধ্যে কোন কোন সাংবাদিক গান্ধীজি সম্বন্ধে নানা ধরণের অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই মনোভাবের প্রতিবাদে বিরুদ্ধবাদীদের

প্রতি কটাক্ষ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন (বেলাশেষের গান, 'গান্ধিজী')। ১৩২৮ এ গান্ধীজি চরকা-নীতি অবলম্বন করলেন। এ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা লেখেন ('চরকার আরতি'—বেলাশেষের গান, 'চরকার গান'--বিদায় আরতি)। ভারতীয়দের হোমরুল দাবীর বিষয় নিয়ে তিনি 'দাবীর চিঠি' কবিতাটি লিখেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন নেতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এই ভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের কালের কতকগুলি সামাজিক আন্দোলনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের দুই বছর পর থেকে ব্রাহ্মসমাজের নতুন শাখা পরম উৎসাহে হিন্দুসমাজের সংস্কার কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁরা—

'যে সব অর্থহীন সংস্কার হিন্দুসমাজকে অতীতের সহিত নিগড়বদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইবার বাধা সৃষ্টি করিতেছে, এবং যে বর্ণভেদপ্রথা সমাজদেহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া মানুষে মানুষে দুরপনেয় ব্যবধান গড়িতেছে।'

—('রবীন্দ্রজীবনী', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)

তারই বিরুদ্ধে 'জেহাদ' চালালেন। আর ও কিছুকাল পরে (১২৯১ সালের দিকে) হিন্দু সমাজ আপন সম্মানবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অন্য সমাজের সংস্কারব্রতীদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হিন্দুসমাজের কুসংস্কারগুলিকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই অনড় মনোবৃত্তির ফলে সকল প্রগতিপ্রয়াস ব্যর্থ হল। নব্যহিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রয়াসকে নিন্দা করতে লাগলেন। এই দুই সমাজের বিরোধ এবং সংস্কারবিরোধীদের পশ্চাম্মুখীন মনোবৃত্তি তৎকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এই সংস্কারবিরোধীদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল, (হসন্তিকা) এইসব কবিতার অন্যতম উদাহরণ। 'পাতিল প্রমাদ' (বিদায় আরতি) কবিতাতেও সেকালের কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ

করা হয়েছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর আরও অনেক কবিতা আছে। [যথাস্থানে তার আলোচনা সন্নিবিষ্ট হবে]। সমাজে পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি অনেকদিন থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু জাতীয় জাগরণের যুগেই এসবের কুফলের প্রতি সকলের দৃষ্টি বেশী করে আকৃষ্ট হল। পণপ্রথার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার অন্তর্জ্বালা নিবারণের উদ্দেশ্যে কিশোরী স্নেহলতার আত্মহত্যা সে যুগে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' [অভ্র-আবীর] কবিতায় এই পণপ্রথাকে ধিক্কার দিয়েছেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর 'আদর্শ বিয়ের কবিতা' [হসন্তিকা] উল্লেখযোগ্য। হিন্দুসমাজের বিধবাদের জন্য নিষ্ঠুর আচারের বন্ধন, এবং এই সকল আচারের বিধানদাতাদের আরাম-আয়েশ সম্বন্ধে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি বহু প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই বিষয়েও কবিতা লেখেন 'দোরোখা একাদশী', [বিদায় আরতি]। একাদশী সম্বন্ধে তাঁর অপর কবিতা 'নির্জ্জলা একাদশী' [অভ্র আবীর]। সমাজের নানা অন্যায় অবিচার নিয়ে মানবতার কবি সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী অক্লান্তভাবে সঞ্চালিত হয়েছে। সাম্যবাদ তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচের ভেদ নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। সামাজিক অবস্থার বিড়ম্বনা নিয়ে লেখা কবিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত 'কেরাণীস্থানের জাতীয় সঙ্গীত' [হসন্তিকা]।

সাহিত্য জগতের বাদানুবাদও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় যুগিয়েছিল। তাঁর 'অ!', 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ', 'কদলী-কুসুম', 'হরফ-রিপাব্লিক [হসন্তিকা] ইত্যাদি উপরোক্ত সাহিত্যিক বচসারই ফল। এই আলোচনার দ্বারা দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক প্রসঙ্গ অনেক সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের কবিাতর উপজীব্য হয়েছে। তাঁর কালে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর আলোচনায় ভারত এবং সমগ্র এশিয়া মুখর হয়ে উঠেছিল। কবির বহু রচনায় এই পরিবেশের প্রচুর ছাপ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্যেন্দ্র-কাব্যের ভাবধারা

ক—জ্ঞানের সাধক সত্যেন্দ্রনাথ,
তাঁর বিজ্ঞানানুরাগ ও ঐতিহ্যপ্রীতি

(সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভেই জ্ঞানসাধনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, দেশবাসীকে তা জানিয়েছিলেন এবং নিজে এই সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। অল্প বয়স থেকেই স্বদেশের রাজনৈতিক জীবনের বিশৃঙ্খলা, সামাজিক জীবনের অনাচার, অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপকতা ইত্যাদি তাঁর অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে জ্ঞানের সাধক গোখ্‌লের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

নিরক্ষরের দুঃখ কি যে ভুল্‌ছ কি তা' ভুলছ তবে,
সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে,
ঠকিয়ে ওদের খায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে,
রোজা ও ভূত ঘাড় ভাঙে হায়, মারী প্রথম ওদের মারে,
অন্নাভাবে শুকায় ওরা জমিদারের গোষ্ঠী পুষে,
সাত পয়ুরি ধার নিয়ে হায় শুধ্‌তে নারে সাতপুরুষে,
হিসাব কিতাব বুঝতে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে,
নিত্য ঢেরা-সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বস্‌ল পথে,
আড়কাঠি ছায় ওদের চালান, ফাঁড়িদারে ও বেগার ধরে,
দাবৃড়ি-ভোতা ক্যাবলা হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে,
এম্‌নিধারা হাজার জুলুম সইছে যত নিরক্ষর
বেঁচে মরে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরন্তর।

—(অভ্রআবীর, '৺গোখ্‌লে')*

এফ, এ, ক্লাসে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করে প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভের পর তাঁর কাছে ভারতবাসীর দুর্দ্দশার মূল কারণটি

* 'চারিত্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ' অনুচ্ছেদে জ্ঞানের সাধকদের সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে। কবির পিতামহ 'জ্ঞান তপস্বী' অক্ষয় কুমার দত্ত সম্বন্ধীয় আলোচনাও সেখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে ভারতবর্ষের মৌলিক ত্রুটি কোনখানে, তা' ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষ একসময়ে জ্ঞানের সাধনা করেছিল। এদেশের সেই গৌরবের যুগে অন্যান্য জাতি ভারতীয়ের পৌরোহিত্য মেনে নিয়েছিল সশ্রদ্ধ-চিত্তে—

'ভারত দেখায় পথ বিশ্বে পিছে ধায়'

—(হোমশিখা, 'সবিতা')

কিন্তু তারপরে এল অজ্ঞানতার যুগ—

'সহসা আবেশে, যেন স্বপনে বিভোর,—
নীরব, নিস্পন্দ, আত্মহারা,
স্বপনে করিয়া ভুল,
হারাল জ্ঞানের মূল,
না বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-তৃষা ;
ঠেলিল অমৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশা।'

—(ঐ)

এইভাবে জ্ঞান-সাধনা বন্ধ হয়ে রইল, আর জাতীয় জীবনে দেখা দিল 'অবসাদ' এবং 'ঔদাস্য'।

'ঊর্দ্ধে যারা ছুটেছিল আলোকের পথে—
সবলে তেয়াগি' ধরণীরে,
এবে তারা পাংশু মেঘ অশুভ, মলিন,
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে।'

—(ঐ)

ঐ তিমিরের জন্যই ভারতমাতার এই দুর্দশা। নিজেদের প্রকৃত অবস্থা, অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব, বিজ্ঞানের অনাচ্ছন্ন চিন্তাধারার অভাবেই সকল বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। সত্যেন্দ্রনাথ তাই সব কিছুর 'জনয়িতা', জ্ঞানের আধার-স্বরূপ 'সবিতা'র বন্দনা করলেন—জ্ঞানের আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর করবার প্রার্থনায়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

'ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়। রমণীয় দীপ্তি দেবতায়। আমাদের বুদ্ধি বিধাতায়॥' তাঁর একান্ত কামনা ছিল, সেই পুরাকালের মত আবার ভারতবাসী জ্ঞানের মর্যাদা উপলব্ধি করুক, জ্ঞানের শুভ্র আলোকচ্ছটায় সব মোহ, সব অন্ধকার বিদূরিত হোক। তিনি বুঝেছিলেন, জ্ঞানের আলোকে সবদিক সমান ভাবে উদ্ভাসিত না হলে আংশিক জ্ঞান মঙ্গলজনক হয় না। 'সবিতা'র ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ বললেন—

'ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন ?…দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়।…যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্প শিক্ষা কর্ত্তব্য।'

—(ভূমিকা, 'সবিতা')

অন্যান্য দেশ সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার উত্তরোত্তর উন্নতির ফলেই আমাদের দেশকে এত পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে পেরেছে। জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য আপন ঐতিহ্যকে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দর্শন-বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়ের জ্ঞান। কিন্তু ভারত কেবল দর্শনচর্চার দ্বারা আপন জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তাতে মঙ্গলের আগমদ্বার রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞানেরই জয় জয়কার। সুতরাং ভারতবাসীকেও বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। এদেশের মানুষ বিজ্ঞানেই সব চাইতে বেশী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন ভারতীয় সমাজের যত কুসংস্কার আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—তার মূলে রয়েছে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। তাই তিনি বিজ্ঞানচর্চার উপরে জোর দিলেন। বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের আলোক

'আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরু শির।'

বিজ্ঞানের আলোকে পথের দিশা পেয়ে বিশ্ব বলছে—

কই সুখ ? কোথা হায় উৎস করুণার ?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে ;

তবে বৃথা দিবারাতে
মিথ্যা দেবতার মাথে
কি হ'বে বরষি পুষ্পচয় ?
চল জ্ঞানপথে।

—(হোমশিখা, 'সবিতা')

'সন্তোষ' এবং 'শান্তি'র ছদ্মবেশে যে 'ঔদাস্য' আমাদের অধিকার করেছে তা কখনও মঙ্গলময় সুখের সন্ধান দিতে পারে না। এ বিশ্বে সমস্যার অন্ত নেই এবং 'বিশ্বের সমস্যা সমাধান' না হলে মঙ্গলময় সুখও চিরআয়ত্তের বাইরে। আমাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে বিস্তীর্ণ অজ্ঞান-তিমিরে তার ক্ষীণ আলোক মুমূর্ষর হাসির মত ভয়ানক বলে বোধ হয়। 'একের নিধন বিনা বাঁচে না অপর' এই সব জ্ঞান আমাদের ভীতির উদ্রেক করে বলে চাই আরও জ্ঞান, আরও বড় সত্যের উপলব্ধি, যার ফলে এর অন্তর্নিহিত মঙ্গলময়তা আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে। চতুর্দিকের উদ্ভাসিত আলোতে দেখা দেবে—

'সৌন্দর্য্য—কবিতা—আভরণ !
অবশেষে তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।'

—(ঐ)

এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি ব্যক্তিগত সাধনার শেষে নাও আসতে পারে। কিন্তু সেই সাধনার ফল নিয়ে অগ্রসর হয়েই জ্ঞানের পরবর্ত্তী পথচারীরা ক্রমে একদিন সত্যের সন্ধান পাবে।

জ্ঞানের পূর্ণতা শুষ্ক জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে আসে, এমন ধারণা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। এদিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান সাধনায় আমরা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব। তিনি বলেছেন, প্রেম ছাড়া জ্ঞান বোঝা স্বরূপ। 'জ্ঞানে যাহা হয়ে আছে বোঝা' তাকে তিনি 'প্রেমের পরশে' 'সোজা' করবার কথা বলেছেন। (হোমশিখা, 'সোম') জ্ঞানের সঙ্গে শুধু প্রেম নয়, শৌর্যও চাই। তাঁর বন্দনার ভাষায়—

'মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার,
প্রেম যার প্রাণের সাধনা,

শক্তি তার প্রধান নির্ভর,
ভয়াবহ শৌর্য্যে তার ঘৃণা,
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিনা।'
—(হোমশিখা, 'সর্ব্বংসহা')

এই 'ত্রিবিদ্যা সাধনে'র ফলেই—

'দগ্ধ করি' বৈতরণী—বিস্মৃতির তীরে
লোকাচার—কুশ-পুত্তলিকা,
জ্বলিবে জ্ঞানের দীপ্তশিখা !'
—(ঐ)

সকল অকল্যাণের মূল বিনষ্ট হবে। মানুষ সাম্যের মহা মহিমা বুঝবে। তাতেই জ্ঞানের সার্থকতা।

স্বদেশ ও স্বসমাজকে দুর্যোগমুক্ত করতে হলে ভারতবাসীকে বিজ্ঞানের সাধক এবং ঐতিহ্য-সচেতন হয়ে উঠতে হবে, একথা স্বদেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী সত্যেন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দুটি জ্ঞানের আত্যন্তিক অসদ্ভাবের দরুণই ভারতবাসীর দুরবস্থা,—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্ত্তী অংশে আমরা তাঁর বিজ্ঞানানুরাগ ও ঐতিহ্যপ্রীতির কথা আলোচনা করব।

বিজ্ঞানানুরাগ

'হোমশিখা'র কবিতাগুলি রচনার সময় সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তা এত প্রবল ছিল যে প্রায় সব কটি কবিতাতেই বিজ্ঞানের কোন না কোন বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'সবিতা'তে পৃথিবীর সৃজনকথা, জড় থেকে জীবনের বিকাশ ও জীবের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণালোক প্রতিফলনের প্রসঙ্গে এটি বোঝা যায়। সূর্যকে বসুন্ধরার 'জনয়িতা' রূপে কল্পনা করার মধ্যেও তাঁর বিজ্ঞানাশ্রিত চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে—

'বর্ষ, যুগ, হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস'

ধরে নানা অপরূপ জীবের বিবর্তনের ইতিহাস জানা গেছে, তার উল্লেখ রয়েছে 'সোম' কবিতাতে। 'সর্ব্বংসহা' কবিতাটিতে তাঁর বিশ্বৈক্যানুভূতির যে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তার পিছনেও রয়েছে বিবর্তনবাদের সমর্থন। তিনি বলেছেন—

'মনে হয় তোর দেহে ফিরে
    দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,—
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তনু মন ;—
    শস্যে মিশি কখন শিশুতে,
    স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে।
গন্ধ হয়ে রহিগো কুসুমে,
    রস হ'য়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হ'য়ে মেঘে, ধুমে,
    জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে,
শব্দরূপে পিককণ্ঠে,—নির্ঝরের জলে।
    তনু মন প্রাণ মিশে যায়,
    একে একে পৃথ্বী তোর কায় !'

বিজ্ঞান সচেতনতার পরিচয় রয়েছে ছোটখাট কথাতেও—

'ধূলি বিনা রশ্মি সে নিষ্ফল।'

'সমীরে'র বন্দনা করতে গিয়ে বলছেন—

'বিশ্বজুড়ি বাজে তব বাঁশী!
বজ্রের দামামা কাড়া,
পাপিয়ার নৈশ সাড়া,
তোমারি বীণার ভিন্ন সুর।'

একথা বলতে বায়ুর সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। 'সিন্ধু' কবিতায় কিছুটা প্রাণীতত্ত্ব আলোচনা আছে। ভীতিপ্রদ অতিকায় সামুদ্রিক জীবদের জীবন-লীলার কথা বলেছেন তিনি সেখানে। 'স্বর্ণগর্ভ' কবিতায় মহাশূন্য সম্বন্ধে কবির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুপ্রকট। সুনির্দিষ্ট পথে চিন্তা করে কবি বলতে পেরেছেন—

'মহাশূন্য! পূর্ণ সর্বধনে!
মহামৌন! সঙ্গীত আলয়!
অন্ধকার! সহস্র তপনে—
লক্ষ সুধাকরে আলোময়!
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে,
সূর্য্য হতে শশধরে,
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন!
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন!'

'সাগ্নিকের গানে'—

'এই ধূলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে,
রাখে নব তারার সংবাদ!
ক্ষুদ্র নর তুচ্ছ নহে আর,
জেনেছে সে—এ বিশ্বের আত্মীয় সে নিজে।'

এ তত্ত্ব জেনেই কবি বিশ্বমানবের মূলগত ঐক্যের কথা বারবার বলেছেন। বলেছেন—

'অনাদি অনন্ত এক ধারা জীবনের !
যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন,
চলিয়াছে মনের বিকাশ,—
অন্তরের আনন্দ উচ্ছ্বাস,
বিশ্ব ক্রোড়ে দুলিছে পুলক অকারণ !'—

এই ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের সমন্বয় ঘটেছে।
মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

'সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকের মত জীবনের সর্ব্বত্র তথ্যের সত্য খুঁজিয়াছিলেন।'

—('সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৯)

জীবন-যাত্রার প্রারম্ভেই দেখা গিয়েছিল দেশের দিকে চেয়ে তিনি যে সব তথ্য জানতে পেরেছিলেন—তার মূল সন্ধানে বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ছিল সদাজাগ্রত—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সব কিছুর মুল্য নির্ধারণ করতে তিনি ভালবাসতেন। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত রয়েছে 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থের 'মাটি' কবিতায়। সেখানে মাটির মূল্য নির্ধারণ করতে তিনি বলেছেন—

'এই মাটি গো এই পৃথিবী, এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা, তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।'

* * *

'মাটি তো নয়—জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা, মাটিই প্রাণের পারাবার !'

* * *

'মাটির মাঝে যা আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সূতার লাটাই মাটি, জীবন ধারার আধার সেই !'

'বেণু ও বীণার' 'মেঘের কাহিনী'তেও তাঁর বিজ্ঞান সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'মুদ্রারাক্ষস' বলেছেন—

'বিংশশতাব্দীর সুশিক্ষিত কবির কাব্যে বৈজ্ঞানিক সত্যও কাব্যের ইন্দ্রজালে মোহন হইয়া দেখা দেয়। কবি ও কবিপ্রিয়ার যে মিলন সে যে আজকে ক্ষণিকের খেয়ালে ঘটে নাই, তাহা যে জন্ম-জন্মান্তরের আকাঙ্খার ফল, ভাবিতে গিয়া কবি দেখিতেছেন,

"তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে,—ছিলাম যখন পাপড়ি ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্যকেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে।"

এই তত্ত্বটিকেই কবি আর একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন,

"পাখী শাখী মানুষ হল, তবু
মনের মতন মন হল না তবু
ভেঙ্গে আমায় গড়তে হবে প্রভু !"

ইহা কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য।

['কুহু ও কেকা,' 'প্রবাসী' ১৩১৯ আশ্বিন, পৃঃ ৬৯৪]

কেউ কেউ অভিযোগ করেন, প্রথম জীবনের রচনায় বিজ্ঞানের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যায়—পরবর্তী জীবনে তা অটুট ছিল না। এ অভিযোগের আপাতসমর্থক উক্তি তাঁর কবিতায় পাওয়া যাবে সত্য, কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ হ্রাস পেয়েছিল। বাংলা দেশের শ্যামশ্রী আর স্বাচ্ছন্দ্য চিরকাল বাঙালীর প্রাণকে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে। সেই বাংলার উদার আকাশ, বিশাল প্রান্তর ছেয়ে যখন 'বিজ্ঞানোন্নত শিল্প' আপনার কালিমা ছড়াতে লাগল, তখন বাঙালীর চিত্ত বিজ্ঞানের এই দর্পিত বিজয়-অভিযানকে সমর্থন করতে পারল না। তারা দেখতে পেল,

'কলে গড়া 'কম্ফট !'—খেসারৎ বিস্তর।'

এই বিজ্ঞানোন্নতির ফলে,

'বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি !
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড় ;
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্‌ণ
ভেগে যায় 'মেট্‌' সাথে, অনাচার করে ভিড় ।
পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পর্দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোল শিখা বাড়েরে বে-ফর্দা'

[বেলা শেষের গান, 'চর্কার আরতি']

এরই জন্য বিজ্ঞান-সচেতন কবি-প্রাণও এই 'বিজ্ঞানোন্নত শিল্প'কে গালি দিয়েছে,

'বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা ঝট্‌কায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাট' ! উপে গেল সত্ত্ব !
হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মত্ত !

[ঐ]

বিজ্ঞান যে কালিমা বিষ উদ্গার করেছে, তার তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ বিদ্বেষবশতঃই নতুন সৃষ্টি উড়োজাহাজের প্রতি কবির বিমুখতা।

'কলের চিম্‌নি কুশ্রী করেছে ধরা,
'করোগেট'গুলো দেখে দেখে আঁখি জরা ;
চোখ জুড়াইতে নীলাকাশ ছিল বাকী,
তারেও কুশ্রী করিলে টিনের পাখী !
হাঁফ্‌ ছাড়ে লোক যে আকাশ পানে চেয়ে,
তাও দিতে চাও বিজ্ঞাপনেতে ছেয়ে !
সৃজিয়াছে তোরে বিজ্ঞান-বুড়ো কাণা,
ওরে কদাকার ভূত-বাদুড়ের ছানা !
ওরে ভূতে-পাওয়া ! ওরে ও সাগর-পারী !
দেশে দেশে তুমি অকালে ছড়াবে মারী ।'

'সাগর-পারী' জিনিষ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রবণতা এবং অসহযোগের মনোভাবটিও সে যুগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। এ ছাড়া উড়োজাহাজের সঙ্গে সভ্যতা বিধ্বংসী যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত।
কবির অভিযোগ,

'রাক্ষসীরীতি শিখায়েছ তুমি রণে'

আরও অভিযোগ আছে,

'শান্তিকালে প্রজার ভালে বোম্ ছাড়ে সেই
চিড়িয়াগাড়ী থেকে।'
[বেলা শেষের গান, 'সাল-তামামী']

এইজন্যই কবি উড়োজাহাজের প্রতি এত বিরূপ হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের এই অনিষ্টকারী যান্ত্রিকতার প্রতি জগতের আবেদন কবির ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে,

'ক্ষমা দেরে আর না।'

এই বিমুখতা বিজ্ঞানের শুভদিকের প্রতি, এমন মনে করলে ভুল হবে।

ঐতিহ্যপ্রীতি

পুরাণ ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঠককে বিস্ময়-বিমূঢ় করে। তাঁর কাহিনীকাব্যগুলির বিষয় প্রধানত: ছিল পুরাণ-ইতিহাসের ঘটনা। ঐ সব ঘটনাকে সজীব-ভাবে বর্ণনা করে প্রতিটি চরিত্রকে তিনি স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। এগুলি আমাদের প্রাণে গভীর ছাপ এঁকে দেয়। তাঁর এই জ্ঞান কাব্যের নানা বিভাগে পরিস্ফুট হয়েছে। কল্পনায় প্রাচীন যুগকে জাগ্রত করে তার রহস্যময়তা উপভোগ করতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর এই বালকসুলভ রোমাঞ্চপ্রীতি বেণু ও বীণার 'মমি' কবিতাটিতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য আলোচনার দ্বারা জনগণের প্রাণে দেশপ্রেম উদ্বোধনের চেষ্টা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধীয় ব্যাপক জ্ঞানকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (২য় সংস্করণ) গ্রন্থের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধে কবির এই ঐতিহ্য আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন,

'সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির মূলে ছিল বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসাধনের প্রয়াস—বিদেশী আদর্শকে স্বীকার করিয়া তাহারই কষ্টিপাথরে স্বজাতি ও স্বদেশের অতীতকে খাঁটি সোনার ঔজ্জ্বল্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান যাহা অনুভব করিতেছে অতীতের সহিত তাহার বিরোধ নাই; ভারতীয় সাধনার ধারায় মানব-সভ্যতার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত ছিল, সেই ধারা শেষের দিকে শৈবালাচ্ছন্ন হইয়াছে মাত্র—এই যে আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় তাহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন।'

—(পৃঃ ২০৪)

এই আত্মপ্রসাদ এবং আশ্বাস দেশবাসীকে হৃত মর্য্যাদা পুনোরুদ্ধারের চেষ্টায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ পরাধীন স্বদেশের দিকে চেয়ে বারবার এদেশের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। প্রথম জীবনের কাব্য 'সবিতা'তে তিনি বলেছেন,

'কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়।

(হোমশিখা)

আর্য ঋষিদের জ্ঞানচর্চ্চার উৎকর্ষ, বিশ্ব-পূজ্য জ্ঞানের পূজারি বোধিসত্ত্বের সাধনার কথা, জাতি বিস্মৃত হয়েছে। সেই সাধনার ধারা লুপ্ত হয়ে এদেশকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর দুঃখ ছিল ভারত একদিন সমস্ত বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে, আর আজ যখন প্রতীচ্যে আলো জেগেছে, তখন 'প্রাচ্য অন্ধকার'। যে সব স্থান বা কীর্তির সঙ্গে অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে—সেগুলির কথা আলোচনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, কখনও বা বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভেবে দুঃখে ভেঙে পড়েছেন। অতীতের গৌরবের স্মৃতিতে তাঁর বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠত। 'গঙ্গা-হৃদি-বঙ্গভূমি' 'আমরা' ইত্যাদিতে তার পরিচয় রয়েছে। 'সময়-সাগর-জলে মগ্ন' প্রাচীন ভারতের একমাত্র চিহ্নস্বরূপ 'অক্ষয় বট' (বেণু ও বীণা) সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। কারণ পুরাণের কাহিনীতে যেমন,—সিদ্ধার্থ ও রাজা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনীতেও তেমনি, এর উল্লেখ আছে। তাই সেকালের ঘটনাসমূহের একমাত্র সাক্ষী এই 'অক্ষয়' বিটপী কবির প্রাচীন-কীর্তি-পূজারি অন্তরকে আকৃষ্ট করেছে। সিংহল দ্বীপের কথা বলতে গিয়ে কবি বারবার 'বঙ্গের বীরসিংহের নাম' স্মরণ করেছেন। শুধু ইতিহাস নয়, পুরাণের স্মৃতিও আছে এই দ্বীপের সঙ্গে,

'ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহের' বশ,—সিংহল নাম যায়।'

এই 'সিংহল',

'বঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম'।

'ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।'

এতে কবির অতীতের গর্ববোধের সঙ্গে বর্তমানের আক্ষেপ মিশ্রিত রয়েছে।

'শোন নদে'র তীরের পাটলিপুত্র নগরে গ্রীকসেনাবিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত তাঁর মহিমামণ্ডিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এই নগরে ধর্মাশোক রাজত্ব করেছেন। গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনলীলাও এই নদেরই তীরে সংঘটিত হয়। কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে এর বন্দনা করেছেন,

'ওগো শোন! স্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোনা!
তোমার ও ঊর্মিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি বোনা!'

'বারাণসী' নগরী সত্যেন্দ্রনাথের 'জাগ্রত-চোখে' স্বপ্ন এনে দিয়েছে। তার শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ চিত্তে এই নগরীর প্রাচীন কীর্তিরাজির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দর্শন করেছেন কবি। এই গৌরবমণ্ডিত স্থান কবির চোখে অপরূপ মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। সেই বেদ-উপনিষদের যুগের বারাণসী, মহাভারতের কাহিনী, হরিশচন্দ্র-বিম্বিসার-অশোকরাজার যুগের স্মৃতিমাখা বারাণসী। তাছাড়া সাহিত্যসৃষ্টির পীঠস্থানও এই নগরী,

'এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা'

'এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান।'

বাংলার নবজীবন সঞ্চারকারী প্রতাপ রায়ের শেষ স্মৃতিও আছে বারাণসীরই বুকে। কবি বিশ্বাস করেন, এই পুণ্যভূমি আজও 'তৃষিত জগতে'র জন্য অমৃত পাত্র নিয়ে প্রকৃত অবসরের অপেক্ষায় আছে। মানুষ নিশ্চয়ই সকল দ্বন্দ্ব বিভেদ ভুলে একদিন 'বিশ্বনাথের আকাশের তলে' মিলিত হবে। এই মিলন যাতে শীঘ্র হয়, তার জন্য ঐতিহ্যসম্পদশালী বারাণসীর কাছে কবি আকুল প্রার্থনা করেছেন।

'ওঙ্কারধামে'র শিল্প ধ্বংসোন্মুখ, তবু তাতে প্রতিভার যে চিহ্ন বর্ত্তমান তার মূল্য অসীম,

'শিল্পীর তপে হেথা অপ্সরা
রয়েছে পাথর হয়ে।'

(কুহু ও কেকা)

এ শিল্প বোবা পাথরের বাঁধনে থেকেও বলে অনেক কিছু। কিন্তু,

'জানেনা হিন্দু কীর্তি আপন!
হায় নিদারুণ লাজ!'

তাই 'ওঙ্কারধাম'কে,

'ধ্বংশের দাড়া অশথ শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি' ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিয়রে মরণ-কাঠি।'

কবি জানতেন, যে জাতি আপনার অতীতকে অর্থাৎ ভিত্তিকে জানে না, সে জাতির উন্নতি নেই, তার 'শিয়রে'ও 'মরণকাঠি', তাকেও ধ্বংসের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে। তাই এ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার জন্য ঐতিহ্য আলোচনার শেষে কবি স্বজাতিকে ধিক্কার দিয়েছেন।— 'সরযূ' নদী রঘুকুলের পুণ্য-স্মৃতি-বাহিনী। পুরাণের বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা, ইক্ষ্বাকু, রাম প্রভৃতি এই নদীর কূলে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁদের রাজধানী অযোধ্যা নগরী আজও সরযূতীরে বিদ্যমান। পুণ্যশীলা সীতার পদাঙ্ক পড়েছে এই নগরীর বুকে। সেই দিগ্বিজয়ী রাজাদের বীরত্ব, কীর্তিরাজি আর চরিত্রবল অযোধ্যা আর সরযূকে যে গৌরবে উজ্জ্বল করেছিল তার ছটা যেন আজও সরযূর 'সন্ন্যাসিনীর বেশে'র অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই 'অনিন্দিতা'র অঙ্গের 'চন্দ্রমালার জ্যোতি' এর অতীত সমৃদ্ধিকে স্মরণ করিয়ে দেয়! কবি বলছেন,

'দুঃখ দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী-লক্ষণে'।

(বেলা শেষের গান)

কবি নতশিরে লোকপিতা রামের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দুঃখ করেছেন,

'রাবণ-জয়ীর জনম ঠাঁই-এ দাঁড়িয়ে আজি ধ্বজা বাবরশাহী,
যে বাবরের ধর্ম্মী-গরব ডুবে গেছে রাঙা মদের হ্রদে ;
"মুণ্ড-পাহাড়" ভিন্ন যাহার ভূমণ্ডলে অন্য কীর্তি নাই,
সেই গড়েছে ভজন-শালা, ভিতের পাথর ভিজিয়ে দেমাক মদে।'

(বেলা শেষের গান)

কিন্তু এদিনও থাকেনা। ইতিহাসের চলার পথে ধূলো হয়ে গুঁড়িয়ে যায় সকল দম্ভ।

'যুগের পরে যুগ চলে যায় নাগর-দোলায় চলছে ঘোরাঘুরি,
ওঠা-নামার চলছে তুফান, আগমনী ডাকছে বিসর্জ্জনে,
ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উঁচিয়ে ছায়া-তূরী,
নেচে চলে হিন্দু মোগল, প্রসেনজিতের প্রাচীন ও পত্তনে।
রয়না দেমাক, রয়নাক' জাঁক, অটুট কারো না রয় জারিজুরি,
থাকে কেবল পুণ্যশ্লোকের পুণ্যস্মৃতি প্রাণের রামায়ণে।'

তাই দম্ভের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে—কিন্তু 'পুণ্যশ্লোকে'র পুণ্যস্মৃতি'র মর্যাদা নিয়ে আজও সরযূ মহিমোজ্জ্বল। ইতিহাসের চাকা ঘুরে চলেছে,

'রঘুকুলের ক্ষত্রিয়েরা একাগাড়ীর করছে গাড়োয়ানী,
বাবরশাহের খান্দানীরা আজকে শুনি রেঙ্গুনে দপ্তরী!'

কাল-চক্রে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা ইতিহাসের প্রতি আমাদের শঙ্কামিশ্রিত সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সত্যেন্দ্রনাথের 'দিল্লী-নামা'তেও ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতির পথে ক্ষমতালোভী, প্রভুত্বগর্বী শত শত রাজার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। মানুষের এই ভাগ্যবিপর্যয় না স্থান, না কাল—কিছুকেই স্পর্শ করে না। দিল্লীকে উদ্দেশ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'শত শত রাজ মুকুটের মণি
ধূলা হয়ে আছে তোমার পায়ে,

দর্প ও মান গুঁড়া হয়ে আছে
তোমার পায়ের ডাহিন বাঁয়ে।
স্থির হয়ে বসে আছ তুমি একা
অবিরাম যাওয়া আসার স্রোতে।'
(পঞ্চদশ কলি, বেলাশেষের গান)

সপ্তম কলিতে কবি বলেছেন,

'ধূলিভূত সোনা শোণিতের কণা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচে!'

* * *

'কোনো বাদশার কায়া ঢাকি' হেথা
কোটি মুদ্রার কবর রাজে,
গোলামের হাতে পরাণ হারায়ে
কেহ পচে পড়ি পথের মাঝে।'

'দিবালোকে'ও 'আরব-রজনী' স্বরূপ এই 'মোহিনী' 'নগরীচূড়া'র মোহে ভুলে,

'ক্ষমতা-মদের লক্ষ মাতাল
ঘুমাল ও বুকে প্রলাপ করে।'
(পঞ্চম কলি)

এই ঐতিহাসিক নগরীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের কথা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই সব কবিতায় যে রস সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন 'ইতিহাস রস'। ইতিহাস এসব কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠে আমাদের প্রাণে যথার্থরূপে প্রতিভাসিত হয়। 'দিল্লীনামা' কবিতায় ইতিহাসের অসংখ্য বিষয়ের আভাস উল্লেখ রয়েছে। তাই ইতিহাসের সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ কবিতার পূর্ণ রসাস্বাদন অসম্ভব। ইতিহাস আলোচনায় সমৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের আরও দুটি কবিতা ('কবর-ই-নূরজাহান'—অভ্রআবীর ; 'রাজবন্দিনী'—তুলির লিখন) আছে, তাতে ইতিহাসের যে সব তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কোনও ইতিহাস গ্রন্থেও সে সব বিষয়ে তার চাইতে বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ কবিতাগুলি

একটুও তথ্যভারাক্রান্ত নয়, এগুলির কাব্যরস অত্যন্ত উপভোগ্য। এই ধরনের কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উল্লিখিত তিনটি কবিতাতে তাঁর ইতিহাসপ্রীতির পরিচয় সুসঙ্গতভাবে প্রকাশিত হয়ে কবিতাগুলিকে সার্থক করেছে। ইতিহাসের প্রচ্ছদভূমিতে নূরজাহানের প্রেমের কথা (কবর-ই-নূরজাহান) এবং রাজবন্দিনীদের চমকপ্রদ জীবনকাহিনী (রাজবন্দিনী) সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এগুলির মধ্য দিয়ে অতীতের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এই কবিতাগুলির রস কালাতিশায়ী।

ইতিহাস সত্যেন্দ্রনাথের অণু-পরমাণুতে এমন করে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, যে কোন প্রসঙ্গে এমনকি প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়েও তাঁর প্রাচীন কীর্তির কথা মনে পড়ত। 'দার্জ্জিলিঙের চিঠি' (কুহু ও কেকা) তে কুয়াশায় ঢাকা দার্জ্জিলিং পাহাড়ের সোন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে,

'লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াশায় ?
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজও পুজা পায় !
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড়-তমঃ নিজের প্রতিভায়।'

দার্জিলিং পাহাড়ের সৌন্দর্য তাঁদের প্রাণেও বিস্ময় জাগিয়েছিল, তাঁরাও কবির মত এককালে ওই পথে গেছেন, সেই কল্পনা কবিকে আনন্দে শিহরিত করেছে। কবি সেই কীর্তিমান পুরুষদের সঙ্গে এক অদৃশ্য মায়া-বন্ধন অনুভব করেছেন। 'তাতারসির গানে'র আনন্দোৎসবের কথার মধ্যেও বঙ্গের গৌরবের কথা কীর্তিত হয়েছে,

'রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙ্গালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন পাটালি।'

ইত্যাদি

(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)

সাম্যের গান গাইতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পুরাণ ইতিহাসের নজীর উপস্থিত করতেন। বর্ণভেদ প্রথার কুফল বর্ণনা করে এই প্রথা লুপ্ত করবার

আবেদন জানাতে গিয়ে পুরাণ ইতিহাসের বর্ণভেদপ্রথাবিরোধী ঘটনার আভাস দিয়ে কবি বলেছেন,

'গ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুপ্ত
করিবে মাথায় পুষ্পবৃষ্টি,
আশিসিবে তোরে কণাদ কবষ
মহীদাস-মাতা পুণ্যবতী,
কল্যাণ তোর করিবে কামনা
তপতী এবং সত্যবতী।
বিশ্বামিত্র করিবে আশিস
ল'য়ে বশিষ্ঠ-সুতারে বামে।'

(বিদায়-আরতি, 'নবজীবনের গান')

সাম্যবিরোধী উচ্চবর্ণ যখন শাস্ত্রের কথা বলে আপত্তি তুলেছে তখন সত্যেন্দ্রনাথ পুরাণের এই সব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের। (বিদায় আরতি, 'পাতিল প্রমাদ')। ভেদাভেদ বিস্মৃত হয়ে মিলিত হবার আবেদন জানাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা।
মিলনের সাম তারা অবিরাম
গাহিল যে সেকি মিথ্যা হবে।'

(ঐ)

ইতিহাসের আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহ ছিল। কিন্তু 'হানাহানি'র কাহিনীর মধ্যে কবি ইতিহাসের যথার্থ সৌন্দর্য দেখতে পান নি। ইতিহাসের রাজা রাজড়াদের যত বলদর্প—কীর্তিগৌরব—সবই ধুলায় মিশিয়ে যায়—কিন্তু যাঁরা 'গুল্ চামেলির চাষ করেছেন, যাঁরা 'কোকিল বুলবুল' জুটিয়ে 'পিউ কাঁহাদের' মেলা বসিয়ে গেছেন—তাঁদের স্মৃতি চিরঅমলিন। তাই কবি বলেছেন 'মহাকালের অট্টহাস' স্বরূপ 'হানাহানি'র পথ না নিয়ে,

'বন্‌রাণীকে পুষ্পেরি তাজ পরায় যে তার তত্ত্ব নে,
তারাই পটু সত্যি-অটুট ভাবের শিরাজ-পত্তনে।
ঝড়ের ফাঁকে উজল আঁখে এই ধরাকে দেখছে কে,
পাপিয়া ডাকে কার ফাগুনের ক্বণন-রবে কান রেখে?'

তাদের সন্ধান নিয়ে ঐপথে চললেই সুন্দর ইতিহাস সৃষ্টি হবে। 'শর্কী'-সৈয়দ-সুলতানদের স্মরণ-সাধন জড়োয়া তাজ' রূপ গৌড়ে এই 'শিরাজে'র আদ্‌রাটুকু দেখা গিয়েছিল। গৌড়ের রাজারা দর্পে দুবেলা দিল্লী দখল করতে গেলেও সুন্দরের সাধনাও করেছেন। তাঁদের পথ নিয়ে অগ্রসর হলেই ক্রমে একদিন হিন্দে 'শিরাজ' গড়া সম্ভব হবে।

খ—সত্যেন্দ্র-কাব্যে মানবিকতা, সমাজনীতি ও ধর্মবোধ

সর্বমানবের জন্ম যে সহানুভূতি, তাকেই বলি মানবিকতা। মানুষের প্রকৃত ধর্ম এবং আদর্শ সমাজের ভিত্তিই এই। কিন্তু সকলের মধ্যে সচরাচর এই অনুভূতির সদ্ভাব দেখা যায় না। একদল ক্ষমতাশালী লোক অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবার জন্ম নানাপ্রকার উপায় আবিষ্কার করেছে। তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আর সম্প্রদায়গত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ। এদের কারসাজিতে শূদ্র, নারী, কৃষক, মজুরের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ। এই নিপীড়িত মানবতার দুঃখে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন—নতুন বাণী পৌঁছাতে হবে সকলের কানে, তাদের ভিতরকার সুপ্ত মানুষকে তুলতে হবে জাগিয়ে। সকল মানুষই মানুষ, কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়—এই মহাসাম্যের গানে তিনি দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করলেন। বললেন, মানুষে মানুষে থাকবে মহান্ প্রেমের বন্ধন, হিংসা-দ্বেষ-লোভ ত্যাগ করতে হবে। জাগরণী গাইবার আগে তিনি 'সমীরে'র কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর গান যেন এমন গান হয়—যাতে,

'বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায়।'

(হোমশিখা, 'সমীর')

তারপর তাঁর কণ্ঠে 'মহামিলনের গীতি' ধ্বনিত হয়ে উঠল,

'মানিনা অন্ধ বিধি ও বিধান মানিনা অন্ধধারা,
মানিনা তাদের সংসারে যারা করেছে দুঃখকারা।
প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি;
আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্দা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।
মাংসপেশীর শাসন মানিনা, মানিনা শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।'

(হোমশিখা, 'সাম্যসাম')

ধর্মমোহে অন্ধ নিপীড়িত জনকে ডাক দিয়ে বললেন,

'জানুপাতি' কেন রয়েছে নীরবে অবনত করি' মাথা ?
কারা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা ?
ঘণ্টা ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কারা ?
অঙ্কুশ হানি' অঙ্গে কে তব বহায় রক্তধারা ?'...

(ঐ)

ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াতে বললেন তিনি তাদের।

এদেশের সমাজে বহুদিন ধরে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত। নীচু বর্ণের প্রতি উঁচুবর্ণের ঘৃণা এবং বিবেচনাহীন দুর্ব্যবহারের কথা সুবিদিত। মানুষে মানুষে এই ভেদ সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতিপূর্ণ অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তাঁর কাছে,

'বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।'

(অভ্র-আবীর, 'জাতির পাঁতি')

তার উপর তিনি সম্মান দেন শুধু তাঁকে, যাঁর মধ্যে আছে মহান্ প্রাণ। যিনি সত্যিকার মানুষ। মনুষ্যত্বের মধ্যেই আসল ধর্ম্ম নিহিত। এই ধর্ম্ম যার মধ্যে নেই সে উচ্চবর্ণের হলেও পূজ্য নয়! তাঁর ভাষায়,

'যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',
ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।'

(ঐ)

এই হাড়ীর পরিবর্তে 'ব্যবসা যাদের রজতমূল্যে নিজ পদধূলি দান' তারা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে শ্রদ্ধার্হ নয়। এইজন্যই মেথর এবং শূদ্র তাঁর কাছে 'মহান্' এবং 'গুরুগরীয়ান্'। মানবের সেবার জন্য তারা

যে হীনতা স্বীকার করে, তা সকলেরই অনুসরণীয়। কারণ তাদের কাজ কল্যাণের জন্য—তাতে লাঞ্ছনা যা তা উপেক্ষা করবার যোগ্য। তাঁর মতে,

'দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব'

(বিদায়-আরতি, 'সেবা-সাম')

বংশগৌরব যে কি পরিমাণ অর্থহীন, তার বুনিয়াদ যে কত অচিরস্থায়ী সত্যেন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন। বলেছেন,

'বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।'

(ঐ)

ইতিহাসে দৃষ্টান্ত রয়েছে বুনিয়াদে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই,

'নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি'

(ঐ)

আরও আছে সুদীন কসাই, রুইদাস মুচি, গুহক চাঁড়াল, বলাই হাড়ী এদের উদাহরণ। পুরাণ ইতিহাসের নজীর থেকে বোঝা যায়, সে কালে বর্ণ আর বংশের ভেদ এমন করে গণ্য করা হতনা। বশিষ্ঠস্থতা ছিলেন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের স্ত্রী, ব্যাস ছিলেন 'ধীবর-ভাগিনা', কানু ছিলেন 'গোয়ালার ভাতে পুষ্ট', কিন্তু তাতে এঁদের কারোই অমর্যাদা হয়নি, বরং আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের কথা স্মরণ করা হয়ে থাকে। সমাজের রক্ষণশীল দল অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধমত প্রচার করতে গিয়ে পুরাণের এই নজীরগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবার যে চেষ্টা

করেছিলেন তা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বিদ্রূপ করেছেন। ('পাতিল-প্রমাদ', বিদায় আরতি)। শুধু এ বিষয়ে নয়, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমাজের নানা দুর্নীতিকেই তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন ('আদর্শ বিয়ের কবিতা', হসন্তিকা)।

বর্ণভেদ যেমন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক বলে মনে হত, তেমনি সাম্প্রদায়িকতাও ছিল তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী'র মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করতেন না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধটাই সেযুগে ছিল প্রকট। সেই সময়ে তিনি প্রচার করেছিলেন,

'পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হ'ন্।'

(কুহু ও কেকা, 'ফুল শির্ণি')

মানবত্বের পূজারী সত্যেন্দ্রনাথ সেই সময়েই গেয়েছিলেন,

'এক মার কোলে বসি' কুতুহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন-সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি'

(ঐ)

এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন সংঘটন তাঁর স্বপ্ন ছিল। কোন উপলক্ষে এদের মিলনের সম্ভাবনা দেখলে তিনি প্রফুল্ল হতেন। তাই 'আমাদের এই দেশে',

'সত্য পীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দুমুসলমান'

(ঐ)

—এ তাঁর গৌরবের বিষয় ছিল। 'হিন্দু-মুসলমানে' 'প্রীতির রাখী' বেঁধে দিয়েছিলেন বলে গান্ধিজীকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মানবিকতার আলোচনায় স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমত্ব-বোধের কথাটিই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু নিখিল মানবের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা তার প্রকাশও কাব্যে পরিদৃষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল্-প্রাইজ প্রাপ্তিতে সত্যেন্দ্রনাথের এই আনন্দ হয়েছিল যে,

'প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্তসাগর মিল্‌ল আসি'

এবং

'কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে'

'হোমশিখা' গ্রন্থের 'সাগ্নিকের গান' কবিতায় কবি বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তাঁর একত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন,

'বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের—
এক দাবী, এক অধিকার,
এক বিধি, একই বিচার ;
অনাদি অনন্ত এক ধারা জীবনের !'

সমগ্র বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার কথা বলেছেন তিনি সেখানে,

বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ,
ঘুরে যাক্ জীবনের ধারা,—
পারাবারে হ'ক আত্মহারা ;
বিশ্ব-মানবের গানে মিলাও এ গান।'

কবির বিশ্বাস, আপনাকে এমনি 'বিরাটের আত্মীয়' বলে জানলে 'নিজসাধ্য', 'নিজবল' চিনে নেওয়া সহজ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ যে সর্বদাই বিশ্ব-মানবকে আপন আত্মীয় জেনে সকলের সুখ দুঃখকে সমানভাবে অনুভব করতে পারতেন, তার বহুল পরিচয় তাঁর কাব্যে রয়েছে। এদেশের 'তিলকে'র মৃত্যু যেমন তাঁকে দুঃখ দিয়েছে, তেমনি দুঃখ দিয়েছে প্রতীচ্যের 'উইলিয়ম ষ্টেড্' (কুহু ও কেকা, 'বিশ্ববন্ধু')র মৃত্যু। এদেশের মহাত্মারা যেমন তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন সেদেশের মহাত্মারাও। সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধানম্র চিত্তে 'ঋষি টলষ্টয়' (কুহু ও কেকা), 'নিবেদিতা' (কুহু ও কেকা), 'ডেভিড হেয়ার' (কুহু ও কেকা), 'যীশুখৃষ্ট' ('বড়দিনে', বিদায়-আরতি) প্রভৃতিকে বন্দনা করেছেন। এই সব মহাপুরুষের সঙ্গে

কণ্ঠ মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথও বলেছিলেন,

'আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেইদিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।'

(অভ্র-আবীর, 'জাতির পাঁতি')

এ থেকে বোঝা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের মানবপ্রেম এক দেশের মানুষেই আবদ্ধ ছিলনা, তাঁর উদার প্রাণে 'বিশ্ব-মানব'ও 'জলসা' করেছিল। তবে হতভাগ্য স্বদেশভূমির দুর্দশার কথা তাঁকে এত বেশী ভাবতে হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুখণ্ডিত জীবনে বিশ্বের কথা নিয়ে আরও বেশী ভাববার অবসর তিনি পাননি। যাঁরা মানবত্বের মহান্ আদর্শের ধারক, যাঁরা মানুষে মানুষে মিলন সাধনের চেষ্টায় জীবন অতিপাত করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়েছে মানবপ্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথের অন্তর। তাঁর বহু কবিতায় মানব-সেবী বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে। কারণ,

'গোত্রদেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি'

(অভ্র-আবীর, 'জাতির পাঁতি')

যীশুখৃষ্ট 'নিরীহজনের লাঞ্ছনা' দূর করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ব'লে তাঁর প্রতিও কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। খৃষ্টের উদ্দেশে লেখা 'বড়দিনে' (বিদায়-আরতি) কবিতা থেকে উদ্ধৃত করছি,

'গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হয়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহজন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে।'

(বিদায়-আরতি)

বন্দনা গাইতেও তিনি স্মরণ করেছেন,

'তোমার হিয়ার চিন্তামণি-ঘরে
বিশ্বমানব জলসা করে, ওঠে বিপুল পুলক-ভরা গীতি!'

(বিদায়-আরতি, 'মালাচন্দন')

এবং— 'বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়'

(অভ্র-আবীর, 'আভ্যুদয়িক')

রাজর্ষি রামমোহন, ঋষি টলষ্টয়, ভগিনী নিবেদিতা, বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল এঁদের মানব-প্রেমের মহত্ত্বের জন্য। 'চারিত্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ' অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাঙালী সমাজে নারী চির-অবহেলিত। একথা সর্বজনবিদিত সত্য, যে এদেশে,

'কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।'

(অভ্র-আবীর, 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর')

কন্যার বিবাহ দিতে হলে দরিদ্র পিতাকে যথাসর্বস্ব হারাতে হয়। কন্যার স্বকীয় মূল্য নেই, তার সঙ্গে অর্থপণও দিতে হবে পিতাকে।

'কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা! পয়সা দিয়ে ফেল্‌তে হয়।'

বরপক্ষের চক্ষুলজ্জাহীন শোষণকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—'সমাজ-মান্য গুণ্ডামি', বিবাহের এই বেচা-কেনার কাণ্ডকে বলেছেন—'কসাই-হাটের কাণ্ড'। 'সমাজ সাপে'র এই অগ্নি-নিঃশ্বাসে আমাদের মেয়েরা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, অথচ কাপুরুষ পুরুষজাতির চেতনা নেই; এই কবির দুঃখ। তীব্র ভাষায় তিনি বলেছেন,

'চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে।'

(ঐ)

আবার 'তরুণ সম্প্রদায়' সম্বন্ধে তাঁর আশাও বড় অল্প নয়। তিনি তাঁর এই তরুণ বন্ধুদের সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন,

'শাস্ত্র শাসন রইল মাথায় তর্কে মিছে নেইকো ফল
বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।'

কুসংস্কার-বিরোধী কবি জানতেন, এতখানি প্রাণশক্তি ওই তরুণদের মধ্যেই আছে। তিনি আরও জানতেন 'বিধির বিধান'ই এই যে,

'কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী'।

পুরাকালে নারীর প্রেমের জন্য পুরুষ কত অসাধ্য সাধন করেছে তা স্মরণ করে তিনি আমাদের দেশের তরুণদের মুখের দিকে চেয়ে তাই আবেদন করেছেন,

'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি ?
রোগের ঋণের শেষ রাখনা, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?'

(ঐ)

তাদের তিনি শিক্ষা দিয়েছেন,

'পিতার সত্য পালন-পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ-পাপ।'

এ দেশের বিধবাদের জন্য একাদশীর বিধানে যে নিষ্ঠুরতা রয়েছে তা সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণকে বেদনাহত করেছিল। বিধবা সারাদিন পূজার ঘরে তৃষ্ণায় অসাড় জিহ্বায় জপ করে কাটান। আর,

'ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল ঝরে'

সেদিকে মেলে থাকেন 'সতৃষ্ণ' দুই চোখ। অপরিসীম দৈহিক পীড়নে সংজ্ঞাহারা হন বিধবা। আর,

'অধোমুখে বিশ্ব দেখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে' পড়ে দিবস রাত।'

(বিদায় আরতি, 'দোরোখা একাদশী')

অন্যদিকে একাদশীর বিধান-দাতাদের কোনও বিকার নেই। এদেশের সমাজে নারীর প্রতি যে অবহেলা, তাকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন অর্ধজগতের প্রতি বিমুখ থাকার লক্ষণ। কবির চক্ষে,

'গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী।'

(হোমশিখা, 'সাম্য-সাম')

নারীর মনে স্নেহের পারাবার। 'স্নেহ বলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে'। স্নেহেই মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শেখে। কাজেই এই গুণেই নারী শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছে। তাকে অবহেলা করে, বিধি-বিধানে বেঁধে পুরুষের অধীন করে রাখবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। তাছাড়া,

'অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদিগো পায়,
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হতে কেন বঞ্চিবে তায় ?'

নারীও যে মানুষ, তারও যে পুরুষের মতই সুখদুঃখের অনুভূতি আছে, শক্তিমদমত্ত পুরুষকে এ কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে কবিকে।

সত্যেন্দ্রনাথ দেখেছেন, দরিদ্রের পরিশ্রমে পৃথিবীতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় আর সেই সুন্দর পরিবেশ শুধু ধনীর মনোরঞ্জন করে; অথচ দরিদ্র রয়ে যায় যে তিমিরে সেই তিমিরেই। 'মূল ও ফুলের সঙ্গে এ ব্যাপারের তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে সমভাব দেখা যাবে,

'মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;
* * *
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুলদল—বেঁচে আছে তাই।
ফুল সে রাজার মত থাকে
মূল সে চাষার মত পাঁকে !'

(বেণু ও বীণা, 'মূল ও ফুল')

কিন্তু ফুল পাঁকের মূলের সঙ্গে রেখেছে নিবিড় যোগ, তাই তার এত মনোলোভা শোভা। কিন্তু সমাজের উচ্চ আর নীচে এ যোগ নেই। শোভাও নেই তাই। উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন,

'সমাজেরে তুমি ভাগ তো করনি
করেছ ব্যবচ্ছেদ,
যোগের সূত্র কাটিয়া দিয়াছ
গড়িয়াছ জাতিভেদ।'

(তুলির লিখন, 'পরেয়া')

দরদী কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই সহায় সম্বলহীন উৎপীড়িতদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই

মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আমাদের অর্জন, সে সকল বাহ্য। তার অন্তরে আছে চিরন্তন মানুষ,

‘কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে।’
(হোমশিখা, ‘সাম্য-সাম’)

অতএব তাদের অন্তরে যে ভাষা গুমরে মরছে তা শুনতে হবে আমাদের কান পেতে। তারা তো তুচ্ছ নয়। ‘সাম্য-সাম’ (হোমশিখা)কবিতায় তিনি বলেছেন,

‘খনির তিমিরে কা’রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি’ কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি’ আছে যা’রা শোন তাহাদের গান।’

দেশের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে তাঁর ভাষা অগ্নিময়ী হয়ে উঠেছে,

‘জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।
হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—! ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী !’

মানব-সমাজের এক শ্রেণীতে দেখা দিয়েছে,

‘লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা’
(হোমশিখা, ‘সাম্য-সাম’)

তাদের এই ধন লোভ আর শক্তিলোভ মানুষের মনকে তিলে তিলে মেরে ফেলেছে। চারদিকে কেবল ‘লোভের হানার বান ডেকে’ যাচ্ছে। তাদের আছে যশলোভ, তারা আপন আপন কীর্তির ধ্বজা তুলছে ‘নিরীহ জনে’র রক্তে রাঙা করে। এদের কাছে মৃত্তিকার মাতৃরূপ অন্তর্হিত, তার দাম শুধু স্বর্ণপ্রসবিনী হিসেবে। কিন্তু সমাজের এমনই বিধান, সেখানে এই লোভাতুররাই ‘জ্ঞানী’, ‘মানী’ এরাই ‘ভূস্বামী’।

‘ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু !
যারা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল’
(ঐ)

মাটি মায়ের সেবক যারা, তারাই কথায় কথায় হয় 'যোত্রহীন,' সমস্ত সেবা দিয়েও তাদের ঋণ পরিশোধ হয় না। তাদের চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুর করাল বিভীষিকা। এই বিশ্বজোড়া হাহাকার থেকে পলায়নের পথ নেই তাদের। বলদর্পী লুণ্ঠনকারীরা 'বিকটহাস্তে বিশ্বভুবন' মন্থন করে 'সুনামের হার' গলায় দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে।

'নিরহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারী,
বালক বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বধিয়া চলিছে নারী।'

তাদের ক্রূর হিংসার অসীম কলঙ্ক সহজে মোচন হয় না। কবির অভিযোগ,

'ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী।'

কিন্তু তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দরিদ্রেরও বাঁচবার দাবী রয়েছে এবং তা কারও দাবীর চাইতেই কম নয়!

'ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযুষ-সুধা,
বলী দুর্ব্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবেনা ক্ষুধা।'

'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা'র 'নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী', 'বেলাশেষের গানে'র 'চরকার আরতি' ইত্যাদি আরও অনেক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দরিদ্র-নারায়ণের দুঃখকে জগৎ সমক্ষে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এত আক্ষেপেও কবির মানবত্ববোধে পক্ষপাত দোষ দেখা দেয়নি। নিপীড়িতের দুঃখে কাতর সত্যেন্দ্রনাথ একথাও স্মরণ রেখেছেন—অপরাধী যারা তারাও মানুষ। পাপীদের শাস্তি কোন পথে হবে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

'ধনের চাপে যে পাপের জনম একথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি,
দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দুষি'না ভাই।'

মানুষ মাত্রের প্রতিই তাঁর সমান সহানুভূতি, সকলের দোষ ত্রুটি তিনি সমান চক্ষে দেখেছেন, সকলের বিচার সমানভাবে করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে—'মানুষ দোষে গুণেই মানুষ'। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চুণীলাল মিত্র 'উদ্বোধন' (৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৪৫) পত্রিকায় লিখেছেন,

কবি মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধকে ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখেন নাই। কেবল তিরস্কার করা তাঁহার ধর্ম্ম নহে। মানব-জীবনের দোষ-অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াই তিনি আমাদিগকে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন মহৎ হইবার জন্য। তিনি পঙ্কোদ্ধারের পক্ষপাতী। তাঁহার "নষ্টোদ্ধারে" শুনি,

"করতে হবে নূতন বোধন জাগিয়ে তারে তুলতে
মানুষ দোষে গুণেই মানুষ পারবনা সে ভুলতে।"

সত্যেন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি। মানুষের মনের উপরে তাঁর বিশ্বাস অটুট,

"মোহর ভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোণা জল ঢুকে যায়—
সোনা তবু সোনাই থাকে
পারিনে সে ভুল্‌তে।"

তাই কবি বলছেন,

'পঙ্কে আছি নাব্‌তে রাজী
মনের চাবী খুল্‌তে!
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পার্‌বনা তা' ভুল্‌তে।'

(কুহু ও কেকা, 'নষ্টোদ্ধার')

এ প্রসঙ্গে রবার্ট বার্ণ্‌স্‌ এর 'A Man's a Man for a 'that' * পংক্তিটি মনে পড়ে। (সত্যেন্দ্রনাথ, 'নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র' [তীর্থসলিল] নামে ঐ প্রসিদ্ধ কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন।)

এই সব আলোচনা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবোধের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।—ধর্ম্মাচরণ বলতে আমরা সাধারণতঃ কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান পালনই বুঝি। কিন্তু তার মধ্যেই ধর্ম্মের সকল মহিমা নিহিত নয়। শুষ্ক আচার অনুসারী ধার্মিকবেশী পাপাত্মার দৃষ্টান্ত

* 'Selections From Burns'—By J. Logie Robertson, M. A.

আমাদের সমাজে অল্প নয়। 'হসন্তিকা' গ্রন্থের 'টিকিমঙ্গল' কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ তাদের পরিচয় উদ্ধার করেছেন। হয়তো এসব দৃষ্টান্ত দেখেই তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবি-জীবনের প্রথম থেকেই এ জিজ্ঞাসা তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি শুষ্ক আচারানুষ্ঠানের অসারতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই বোধের জন্ম মানব-প্রেম থেকে। মানুষকে ভালবাসতেন তিনি, আরও ভালবাসতেন স্বদেশের মানুষকে। তাই তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্ম কি থেকে, এ ছিল তাঁর সন্ধানের বিষয়। তিনি দেখতে পেলেন আরও নানা কারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালীর, ধর্মান্ধতা তাদের দুঃখ কষ্টের এক কারণ। তারা আচারকেই জানে ধর্ম বলে। আর সেই আচারের মোহে সকল স্বাধীন চিন্তা এবং মনুষ্যত্ববোধ বিনা দ্বিধায় দেয় বিসর্জন। অন্ধমোহে বুঝতেও পারেনা মানবাত্মার পীড়নের পাপ তাদের কোন নরকে টেনে নিয়ে চলেছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই আচার-সর্ব্বস্ব হতভাগ্যদের তাদের পাপ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করলেন। একাদশীর নিষ্ঠুরতা ঘরে ঘরে দেখা যায়। নিজের চোখের উপর মাতা, ভগ্নী, কন্যা কষ্ট পাচ্ছে—তবুও বাঙ্গালী এর প্রতিবাদ করবে না, প্রতিবিধানের চেষ্টা করবে না—'ধর্ম্ম খসে যায় পাছে'। সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে এই দুঃখে, ভাষা হয়ে উঠেছে জ্বালাময়ী,

'এও মানুষে ধর্ম্ম ভাবে! হায়রে দেশের অধর্ম্ম!
হায় মূঢ়তা! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম।
* * *
বিনা পাপে শাস্তি এযে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী,
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী।'
(অভ্রআবীর, 'নির্জ্জলা একাদশী')

এই অন্যায় বিধির প্রবর্ত্তক স্মার্ত রঘুকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

'তোমার পাপের ভাগী হতে ডাকৃছ জরদগব সবে,
একাদশীর একলা দোষী—বাড়াচ্ছ দল রৌরবে।

শাস্ত্র গড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার জন্ম, হায়,
পরের উঞ্ছে পেট ভরেছ পরের অন্নে পুষ্ট কায় ;
কার ঘাড়ে কার জুড়লে মাথা ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু,
নির্জ্জলা এই দুঃখ বিধান গড়ল তোমার মন নীচু।'

লোকমান্য স্মার্ত বলে এই মনুষ্যত্ব-বোধশূন্য ব্যক্তিকে তিনি রেহাই দেননি। তাঁর রচিত বিধানের 'স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী' একথা বলেছেন সংস্কারবিহীন চিত্তে। তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'পুণ্যবেশী মূর্ত্ত পাপ' বলে। এইখানেই সত্যেন্দ্রনাথের ধর্ম-বোধের বিশিষ্টতা। মানবত্বের অবমাননা যেখানে, সেখানে তিনি ধর্মলেশ দেখতে পান না। ধর্মবোধ তাঁর আছে, নেই ধর্মের সংস্কার। মুক্ত বিচার-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সত্যধর্মের স্বীকৃতি তাঁর কাছে। তাই তিনি মনুর বিধানের কঠোর সমালোচনা করতে পেরেছেন,

'শূদ্র-দ্বিজের পৃথক্ আইন—
আছে মনুর কুকীর্ত্তি'

(বেলা শেষের গান, 'অর্ঘ্যপঞ্চক')

শুধু মনুর নয়—'স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য' তাই তিনি 'বহ্নিকুণ্ডে' 'আহুতি' দেবার পক্ষপাতী।

'পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই করে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে ;
মেকীর উকিল মেকলে আর ভারতমনু্য মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।'

(বেলা শেষের গান, 'আখেরী')

ধর্ম যেখানে বলীর বল-সংগ্রহের উপায়-স্বরূপ আচার মাত্র, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মের পক্ষে নন। স্বার্থের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক তাঁর কাছে দুঃসহ। ধর্মভেকধারী স্বার্থান্বেষীদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও তিরস্কার বাক্য তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ধর্মবোধে নিষ্ঠুরতার স্থান নাই, নেই কোনরকম হিংসার স্থান। জীব-প্রেমই তাঁর

ধর্ম। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি গৌতম বুদ্ধের অনুসারী। প্রেমের শিক্ষা তাঁর কাছে শাস্ত্র শিক্ষার চাইতে বড়,

'গঙ্গাজলে অঙ্গ শুচি—শাস্তরে বলে,
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা জলে ;
রাখাল ছেলের মুখের মিঠে
মানুষ করে শাস্ত্র কীটে'

(অভ্র-আবীর, 'যমুনার জল')

মানব-কল্যাণকামী সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন কোন কোন ধর্মানুশাসন মানুষে মানুষে যে ভেদ সৃষ্টি করেছে, তার থেকে বহু দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি। এই জন্য তিনি সাম্যের গান গেয়ে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বলেছেন,

'মানিনা গির্জ্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর'

(হোমশিখা, 'সাম্য-সাম')

এমন কথা বলতে পারবার জন্যে যে মুক্ত দৃষ্টি থাকা দরকার, তা তাঁর ছিল। আর ছিল সত্যনিষ্ঠা, সত্যধর্মের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততা। তাই যা অনুভব করেছেন অন্তরে, তা প্রকাশ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথ ধর্ম শাস্ত্রের অনেক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শাস্ত্র যে সর্ব্বদাই নিন্দনীয় এ কথা তিনি বলেন নি। সংস্কারমুক্ত জ্ঞান-পিপাসা থেকে তিনি জেনেছিলেন যে শাস্ত্র হচ্ছে 'মণির খনি'। দুর্ভাগা যারা—তারাই 'মণির খনি খুঁড়ে' 'কেবলি কাঁচ' কুড়িয়ে বেড়ায়। সত্যিকার ধর্মবোধ থাকে যাঁদের প্রাণে তাঁদের ঈশ্বর বন্দনায় সর্ব্বদাই অন্তরের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সাধনা, বিশ্বের পাপ দূরীকরণের ও অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের প্রকাশ-চিন্তার আনন্দ এবং সাম্যের ও তারুণ্যের জয়গান ধ্বনিত হতে শোনা যায়। 'বর্ষবোধন' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাধিপতির বন্দনা গাইতে গিয়ে বলেছেন,

'ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !
প্রণবগানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি' ।'
(বিদায় আরতি)

'সিংহবাহিনীর' আরাধনা করতে গিয়ে স্মরণ করেছেন,

'নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে'
(বিদায় আরতি)

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গে তাঁর বেশী করে মনে জেগেছে,

'প্রাচীরের হেরফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ করে ?'

শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেছেন,

'রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ
এস তুমি দর্পহারী ! এস প্রেমী ! এস সর্ব্বজয় !
* * *
এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী ! নব বেদ কর উচ্চারণ !
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় ;
ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু ! এস জনার্দ্দন !
এস পাঞ্চজন্য-ধারী কংসের বংশের চিরভয় ।'
(অভ্র-আবীর, 'জন্মাষ্টমী')

'মহাসরস্বতী'র কাছে তাঁর প্রার্থনা,

'পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছন্নমতি'
(অভ্র-আবীর)

'কালতামামী'তে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বলেছেন,

'জাগো তুমি সত্য-সূর্য্য ! জগৎ-ভরা সংশয়ে দাও হানা ।
বিশ্বে জাগো বিশ্বহিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক পরিচয় হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে ।'
(বেলা শেষের গান)

সত্যেন্দ্রনাথের মানবত্ব, ধর্মবোধ এবং সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসধর্মের মিল আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ চিরকাল মানব-প্রেমের মধ্য দিয়ে ভগবানকে স্মরণ করেছেন। আচার-বিচার করে তাঁর পূজার অভিনয় করেননি। শেষজীবনে ব্যক্তিগত দুঃখে তিনি ভগবানের সান্ত্বনার 'পরশ' লাভ করে বলেছেন,

'এতদিন যারে
করেছি অস্বীকার!—
আত্মীয় আত্মার!
এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে?'

(অভ্র-আবীর)

এই ধরণের কবিতাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস ও তার আন্তরিকতা ফুটেছে। তাঁর সারা জীবনের ধর্মোপাসনার সঙ্গে এই উপলব্ধির প্রভেদ আছে। পূর্ববর্তী সাধনায় বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল, আর এ উপলব্ধি একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত।

(গ) সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম

সত্যেন্দ্রনাথ মানুষের পীড়ন দেখলে অত্যন্ত কাতর হতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি মানব-প্রেমিক। অতি অল্প বয়স থেকেই মানুষের দুঃখ দূর করবার উপায় সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করতেন। নিজের দেশের মানুষের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ছিল আরও বেশী। ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করে তাঁর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হত। পরাধীনতাকে তিনি দেশবাসীর দুঃখকষ্টের অন্যতম কারণ বলে জানতেন। মাত্র তের বছর বয়সেই তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (বেণু ও বীণা) কবিতায় দুঃখ করেছেন, উর্বরতার জন্যই বঙ্গভূমির এই দুর্দশা। ঐ কবিতায় তাঁর স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। ১৩০৫ সালে লেখা 'সবিতা' কাব্যে তিনি পূর্বগৌরবহারা স্বদেশের জন্য দুঃখ করেছেন। জ্ঞানের অভাবে ভারতবাসী নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞ—তাদের সকল চেতনা এমনভাবে লুপ্ত হয়েছে যে তারা পূর্ব গৌরব ভুলেছে, জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। কবি একবার ভারতমাতার কাছে, আর একবার 'ভারতের ভাগ্য-দেবে'র কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করেছেন,

'আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম ?
হারায়েছে সে পূর্ব সম্মান।
* * *
কোন্ ভুলে হতমান্ ভারত-সন্তান'?

(হোমশিখা, 'সবিতা')

'বেণু ও বীণা'র 'দুর্যোগ' কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে পরাধীনতার দুঃসহ বেদনার প্রকাশ আছে। কবির প্রাণে প্রশ্ন জেগেছে,

'তাপহীন দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ;—
বঙ্গের এ দুর্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে নারে, এ আঁখি শুখাবে নারে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।'

পূর্ব গৌরবের আলোচনাতেও তাঁর মন শান্ত হয়নি,

'আগুনের গুণ কিগো ভস্মে কভু মেলে ?'

কিন্তু এই দুঃখের ঘনঘটার মধ্যেই বজ্রের আগুন জ্বলে ওঠে। দুঃখবোধের ঘনীভূত মেঘেই অশান্ত বিদ্রোহের বজ্রালোক জ্বলে উঠবে। তাই কবির প্রার্থনা,

'অন্তহীন অবসাদ, দিক্ প্রাণে নব সাধ,—
যেতে জগতের কাছে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা, আয়গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে জ্বেলে দে আগুন !'

'বঙ্গজননী'র 'ক্ষেতের ধান্যরাশি' 'জাহাজভরে' বিদেশে যায়। আর 'অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হয়ে সর্ব্বনেশে !' অন্ন, বস্ত্র কিছুরই সংস্থান নেই বঙ্গ-সন্তানের। কবির প্রশ্ন—আমাদের 'এ ঘুম ভাঙ্‌বে না কি ?' দেশের স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি অভিলাষী কবি 'বঙ্গজননী'কে সকল শক্তি নিয়ে জেগে উঠবার আবেদন জানাচ্ছেন।—

'ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয়ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি !
চরণ তলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দেগো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাওগো তুমি,
গৌরবিনী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !'

এ যেন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শক্তি ও সহায়ের প্রার্থনা। স্বাধীনতাহীনতার জন্যই দারিদ্র্য আর নানাবিধ জটিল সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই ধারণা ছিল কবির। পরাধীনতার অপমান তাঁকে সারাজীবন দগ্ধ করেছে। তাই নানা প্রসঙ্গে বারবার এই দুঃখ তাঁর মনে জেগেছে। কবি, যীশুখৃষ্টের জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন,

'মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্ হ'য়ে,
অশেষপ্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারা জীবন স'য়ে।

রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !'
(বিদায়-আরতি, 'বড়দিনে')

তাঁর কাহিনী কাব্যেও পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনা গুমরে উঠেছে। অন্য জাতিকে পদানত করে রাখবার বিষম অন্যায়ের প্রতিবাদে অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে কবি-কণ্ঠে। বিদায়-আরতির 'গিরি-রাণী' কবিতায় রাজার আসন অধিকারী অন্যায়-পরায়ণ ইন্দ্রের প্রতি ন্যায়ধর্মের পক্ষপাতী স্বাধীন-চেতা মৈনাকের-মাতৃকণ্ঠে যে তীব্র জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে, সে ভাষার পিছনে কবির এবং সমগ্রজাতির অন্তর্জ্বালাই বাণী-মূর্তি ধারণ করেছে।

'ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, ঘ্যায় যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জ্বল্‌তে হবে জ্বল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টল্‌তে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবেনা ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে।'
(বিদায়-আরতি)

'ভীম-জননীর' (বেলা শেষের গান) মুখেও অন্যায়রাজের বিরুদ্ধে কঠোর-বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। এ কবিতায় আরও বর্ণিত হয়েছে অন্যায় প্রতিরোধের জন্য কিভাবে মাতা প্রিয়পুত্রকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তুলির লিখনে 'সূর্য-সারথি বলেছে,

'মাতার দাস্যে পুত্রের কবে
উজ্জ্বল হয় মুখ ?

* * *

ওগো আতুরের আর্তিহরণ !
জাগ রবি ! প্রাচীমূলে,

এস ভাস্বর ! এস ভাস্কর !
আঁধার বিঁধিয়া শূলে'

('সূর্য্য-সারথি')

সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে চেতনাহীন স্বজাতিকে কখনও তিরস্কার করে, কখনও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে উত্তেজিত করবার চেষ্টায় সত্যেন্দ্রনাথ অবিশ্রান্ত কবিতা লিখেছেন। তাঁর সে সব কবিতা আজও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন পাঠকদের উত্তেজিত করে তোলে। বিদেশীয় শাসকবর্গের সঙ্গে চরম সংঘাতে দেশ যখনি বিষম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, পরাধীন জাতির মধ্যে চেতনা দেখা দিয়েছে, তখনি কবি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ফলে দেশব্যাপী যে জাগরণের সাড়া পড়েছিল এবং সমস্ত জাতি এই বিধানের প্রতিবাদে যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল, তা সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণে আনন্দোৎসাহের সঞ্চার করেছিল। নানা ভাগে বিভক্ত আমাদের এই জাতির পক্ষে প্রবল শক্তির বিরোধিতা করা অসম্ভব। তাই বাইরের আঘাতে এই অমঙ্গলজনক ভেদের অবলুপ্তির সম্ভাবনা কবিকে মহান্ ফললাভের আশায় উল্লসিত করেছিল।

'এতদিনে ! এতদিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ !
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও ক'রে নেব স্থান।
যে খুসী টিটকারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !'

(বেণু ও বীণা, 'সন্ধিক্ষণ')

লোক-বিশ্রুত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও এই মতের পরিপোষক ছিলেন। *

১৯০৫ সালে বাঙালী স্বদেশের 'পণ্য' মাথায় তুলে নিয়ে বিদেশীয় দ্রব্যের মোহ ত্যাগ করেছিল। 'শ্রমে'র মর্যাদা তাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন'—এই পণ করেছিল তারা। বাঙালী আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান হয়ে তারা একথাও উপলব্ধি করেছিল—

'স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব নত।

* * *

দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

(বেণু ও বীণা, 'সন্ধিক্ষণ')

সেদিনকার ছাত্রছাত্রীরাও সাগ্রহে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। শিক্ষক, ধনী মহাজন, জমিদার—সকলেই দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাপক জাগরণে কবি উৎসাহ বোধ করেছিলেন। তাঁর আনন্দের আর অন্ত ছিল না—

'বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার!'

(ঐ)

দেশের এই নব চেতনায় 'বঙ্গইতিহাসে' 'স্বর্ণযুগ' সৃষ্টি হবে বলে দেশবাসীর প্রাণে উদ্দীপনা জাগাতে চেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ।

আফ্রিকার ভারতীয় প্রজারা কুলির কাজ ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করায় প্রতিযোগী 'বোয়ার'রা ক্ষেপে উঠেছিল এবং সরকারও ভারতীয়দের ক্ষমতা সঙ্কোচের জন্য অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

* Speeches : Surendranath Banerjee (1908) Vol. VI ; PP 397-8.

ভারতের অর্থে যেখানে সাম্রাজ্যের পুষ্টি, ভারতীয়ের রক্তে যেখানে 'ব্রিটিশ প্রতাপ বর্দ্ধমান' সেখানে স্বার্থান্ধ অকৃতজ্ঞ ইংরেজের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধ আন্দোলনে ভারতবাসীদের আন্তরিক সমর্থন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের 'ইজ্জতের জন্য' (অভ্র-আবীর) কবিতায় তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কবি বলেছেন,

'রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিঙ্করে'

তাই ভুল ঘটে ওদের অত। কিন্তু এ ভুল মেনে নেওয়া চলবে না, এতে যে চূড়ান্ত অপমান.

'রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে!
ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাভে···মূলে।
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
'জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে,
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আন্‌তে মানা!'

এই অসম্মান দূর করাই ওই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রবাসী ভারতীয়ের সাহায্যের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলে কবিও এই আন্দোলনের সহায়তা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই সব কবিতায় সেকালের সকল প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 'ফরিয়াদ' কবিতাটি লিখেছিলেন। সমগ্র কবিতাটির সুর বেদনায় ভারাক্রান্ত। এর শেষ দিকের ভাষায় অপরাধীর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে যখন খুব নরম সুরে হোমরুলের দাবী উঠেছিল, সে সময়ে সত্যেন্দ্রনাথও একখানা 'দাবীর চিঠি' (বিদায় আরতি) লিখেছিলেন। ইংরেজের বিশাল সাম্রাজ্যের পিছনে ভারতীয়ের সাহায্য কতখানি, সবিস্তারে তার আলোচনা করে কবি বলেছেন,

'কালার গোরার সমান দাবী—মহারাণীর ভাষায় কহি,
রাজার উক্তি উড়িয়ে দেবে?—তোমরা হবে রাজদ্রোহী!'

'বিবেক-বুদ্ধি' সম্পন্ন এ্যানি বেস্যাণ্ট ভারতবাসীকে হোমরুল দেবার পক্ষে ছিলেন সে কথা বলা হয়েছে কবিতায়। কবিতাটি দাবীর চিঠি হওয়া সত্ত্বেও সেই সময়ের পরিবেশ অনুযায়ী নরমসুরে লেখা। তাই মাঝে মাঝে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তেজস্বী ভাব গোপন থাকেনি,

'হক দাবী যার তার কি ক্ষতি? পাওনা আদায় হবেই হবে।
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের বিধান নিত্যকালে—
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখেনা তার কপালে।'

রাজনীতিক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের মতভেদ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন। নরমপন্থীদের ধারণা, বিলেত থেকে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বন্দোবস্ত হবে। নরমপন্থীদের প্রতি তাদের প্রশ্ন—'দেশোয়ালি ঘোড়া' আমাদের আকাঙ্ক্ষার ফল-স্বরূপ,

'ডিম্ব পাড়িবে
এই কি তোদের ড্রিম্?'

আবার এ পক্ষ সম্বন্ধে চরমপন্থীদের ধারণা,

'……নিরেট মডারেট তারা
খালি পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা,
আচাভুয়া—মোয়া লোভে উদ্বাহু
খায় যারা হিম্‌শিম্!'
(বিদায়-আরতি, 'নরম-গরম-সংবাদ')

সত্যেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল চরমপন্থীদের প্রতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সহায়তা করলে স্বাধীনতা দেওয়া হবে—এই বলে ভারতবাসীকে প্রলুব্ধ করেছিল এদেশের শাসকবর্গ। সেই আশায় বাঙালীদের যুদ্ধ যাত্রার উৎসাহের প্রতিধ্বনি রয়েছে 'বাঙালীপল্টনের গানে' (বেলা শেষের গান)। 'সাল্ তামামী'তে ইংরেজদের ঐ সর্তভঙ্গের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এদুটি কবিতায় স্বাধীনতা অর্জনের আশার আনন্দ এবং নৈরাশ্যের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। 'নব জীবনের গানে' (বিদায়-আরতি) জাতীয়তার উদ্বোধনের

আনন্দোচ্ছ্বাস স্ফুর্তি পেয়েছে। ‘চর্‌কার গান’ (বিদায় আরতি), ‘চর্‌কার আরতি’ (বেলা শেষের গান) ইত্যাদিতে ভারতের জনগণের প্রতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার আহ্বান আছে। আর‌ও আছে চর্‌কার সম্মান উপলব্ধিতে দেশবাসীর আত্মবোধ হওয়ায় কবির উল্লাস।

‘চর্‌কার চর্য্যায় সন্তোষ মন্‌টায়,
রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়!
চর্‌কার ঘর্ঘর বস্তির ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর মঙ্গল আপনায় নির্ভর।
বন্দর-পত্তন গঞ্জে সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

* * *

চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর।
ঘর-ঘর সম্পদ-আপনায় নির্ভর!
স্বপ্নের রাজ্যে দৈবের সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

* * *

ঘর-ঘর হিকৃমৎ,—আপনায় নির্ভর’!

* * *

ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর!

(বিদায় আরতি, ‘চর্‌কার গান’)

স্বদেশ মাতৃকার রূপ সত্যেন্দ্রনাথের চোখে ছিল অপরূপ। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর গর্বের বিষয় ছিল।

‘কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?

কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই—
দ'লতে হয়রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটেরে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !'

(বেণু ও বীণা, 'কোন্ দেশে')

বাংলাদেশের ভাষা, বাংলাদেশের গান,—সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণের সম্পদ। এদেশের গৌরবে তাঁর বক্ষস্ফীত হয়—আর দারিদ্র্যের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাঁর কাছে 'মধুর চেয়েও' যা 'মধুর'—সে হচ্ছে তাঁর 'দেশের মাটি'। এই দেশের মাটিতে তাঁর সকল ক্লান্তি হরণ হয়—এদেশের জল, হাওয়া তাঁর কাছে,

'মুক্তি সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।'

তাঁর গর্ব এই যে,

'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে'

(কুহু ও কেকা, 'আমরা')

বাংলার বীরত্বের ইতিহাস, জ্ঞান সাধনার ইতিহাস, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতের উৎকর্ষের স্মৃতি গৌরবের বিষয়। আরও স্মরণীয় ঘটনা এই যে, আমাদেরই 'ঘরের ছেলের চক্ষে' 'বিশ্বভূপের ছায়া' দেখা গেছে—'বাঙালীর হিয়া অমিয়' মন্থন করেই 'নিমাই' কায়া ধরেছিলেন। তার উপর আমাদের সকল গৌরবের বড় গৌরব,

'বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান।'

তাই বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মুখেই সাজে,

'মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে—
মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

(ঐ)

স্বদেশের শক্তি সামর্থ্যের উপর কবির এতখানি বিশ্বাস। 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র রূপ কবি ধ্যানেও দেখতে পান। তাঁর 'রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তি' কবির প্রাণে জেগে ওঠে। আমাদের বঙ্গভূমির এমনি মহিমা যে তিনি 'বৈরী'কেও 'অন্ন দিতে পিছ্‌পা' নন। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে কবি বাংলার বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন,

'গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকৃড়েছিস।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী'

(অভ্র-আবীর, 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি')

এই সঙ্গে অতীত সমৃদ্ধি স্মরণ করে পরাধীন বাংলার কবি বলেছেন,

'ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।'

(ঐ)

কবির আশা,

'উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
গরুড় ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !'

(ঐ)

প্রিয় বাংলা এবং ভারতের মহিমা গানে তাঁর কণ্ঠ ছিল মুখর। 'কোন্ দেশে' (বেণু ও বীণা), 'মধুর চেয়েও আছে মধুর' ইত্যাদি গানে সোনার বাংলার প্রতি তাঁর ভালবাসা উৎসারিত হতে দেখা গেছে।

যে সব নেতার প্রেরণায় ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল, যাঁদের সাধনা স্বাধীনতার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবার পথে এগিয়ে দিচ্ছিল—তঁদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। আবার যাঁদের নীতি তাঁর কাছে অনমুসরণীয়

বলে মনে হয়েছে—তাঁদের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাবও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করেছেন ('কোনো নেতার প্রতি', বিদায়-আরতি)। হেমচন্দ্র (বেণু ও বীণা), তিলক (বিদায়-আরতি), গান্ধিজী (বেলা শেষের গান) এঁদেরকে তিনি 'জাতীয়তার নান্দী'-পাঠক হিসেবে বন্দনা করেছেন। হেমচন্দ্র হচ্ছেন জাতীয়তার উন্মেষ যুগের প্রভাত-পাখী। সে যুগে সরাসরি পরাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই 'ভারত ভিক্ষা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সে সব কথা কিছু কিছু লেখা সম্ভব হলেও সেকালের অন্যান্য কবির মত তাঁকেও পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের এই দুঃখকে প্রকাশ করতে হয়েছিল। 'বৃত্র-সংহার' কাহিনীর অন্তরাল থেকে তিনি ভারত-মাতার বন্দীদশার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। সে কাহিনীতে ঘটনার ঘনঘটার মধ্যেও স্বদেশের দুঃখ তাঁর মন থেকে দূর হয়নি। তাঁর এই অকৃত্রিম দেশপ্রীতির জন্য তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বন্দনীয় হয়েছেন। 'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ প্রীতি ধ্রুব' সেই 'লোকমান্য' তিলকের মৃত্যুতে সত্যেন্দ্রনাথ আদর্শ নেতা হিসেবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। শত নির্যাতনেও এই স্পষ্টবাদী নেতার মর্যাদার অবমাননা হতে পারত না, তাঁর চরিত্রবল ছিল এমনি। এই ত্যাগী কর্মীর দেহপাতে তাঁর অমরত্বের এতটুকুও হানি হবে না। কারণ তাঁর মধ্যে যে আদর্শের প্রকাশ—সেই 'ভারত প্রীতি' 'ভবিষ্যতের অন্ধকারে' 'জাগবে যেমন বাতি-ঘরের বাতি'। সত্যেন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থীদের সমর্থক হলেও অহিংস পথকেই মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন। এ পথের দিশারি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। যে কাজের সঙ্গে ন্যায় ধর্মের যোগ নেই, নেই মহান্ প্রেমের সম্পর্ক, তা তাঁর সমর্থন লাভ করত না। আফ্রিকার বর্ণ-বিরোধী আন্দোলনের ধারা দেখে গান্ধিজী সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সে রকম স্পষ্টভাবে এ সম্বন্ধে সেকালে আর কেউ বলেননি। এই নেতার সঠিক পরিচয় জানতে সত্যেন্দ্রনাথের বিলম্ব হয়নি। গান্ধিজীর মতের উপর আস্থা, তাঁর

প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং তাঁর মহত্ত্বের উপলব্ধি সত্যেন্দ্রনাথের সেই যুগের লেখাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।—

'নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ, দৃঢ়, দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন। বিজয় তাঁহার সুনিশ্চিত!'

* * *

'শুরু হল নূতন নাট্য সূত্রধারের নূতন নাট,
সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ।'

(অভ্র-আবীর, 'ইজ্জতের জন্য')

পরবর্তীকালে যখন 'নগরের পথে' 'গান্ধিজী' 'গান্ধিজী' রোল উঠেছে তখনও গান্ধিজীর সকল মতকে সমর্থন করতে না পেরে কেউ কেউ তাঁর মহত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'গান্ধিজী' (বেলা শেষের গান) কবিতায় এই আদর্শ নেতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বিরুদ্ধবাদীদের দুর্ব্যবহারের নিন্দা করেছেন।

বিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উত্তেজনাবহুল পরিবেশে বাস করে যে কোন অনুভূতিশীল ব্যক্তির পক্ষেই সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ছিল অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ কবি-প্রাণে তাই দেশের এই ঘটনাগুলি বিপুল সাড়া জাগাত। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার, সত্যেন্দ্রনাথ পরাধীনতার জন্য দুঃখ করেছেন, দেশবাসীর জাগরণের লক্ষণ দেখলে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনাতে উত্তেজিত হয়ে কবিতা লিখেছেন সত্য,—কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে কখনও অবতরণ করেননি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনচিত্তে যেটুকু সাড়া জাগানো সম্ভব, কেবল সেটুকুই করেছেন। অর্থাৎ তাঁর দেশ-সেবা ছিল পরোক্ষ। তাঁর এই চারণ-ব্রতের দায়িত্ব বড় লঘু ছিল না। তাঁর বাণীতে দেশবাসী প্রাণ পেয়েছিল, নব-বলে বলীয়ান্ হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিল।

(ঘ) চারিত্রপূজারী সত্যেন্দ্রনাথ

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি থেকে বোঝা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্ঞানের সাধক,—সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, ভেদজ্ঞান, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাঁর হৃদয় ছিল প্রেমে পরিপূর্ণ—সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল। জ্ঞানের আলোকে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। জীবনে তিনি জ্ঞান ও প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও সাধনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে অফুরন্ত উৎসাহ এবং আশাতে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর 'হোমশিখা' কাব্য পাঠে আমরা দেখতে পাই পূর্ণমানবের আদর্শ তাঁর কাছে এইরকমই ছিল। তাঁর সমগ্র কাব্যসাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে চোখে পড়ে, উপরোক্ত গুণগুলি যেখানে দেখা গেছে সেখানেই তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে।

জ্ঞান-সাধনায় বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞান পিপাসার আদর্শ তাঁর চিত্তকে 'উদ্বোধিত' করেছিল। এই জ্ঞানযোগীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন,

'জ্ঞানাঞ্জনে নেত্রমাজি' বিশ্বদৃশ্য দেখিলে মহান্!
বিজ্ঞানের তূর্য্যনাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা

* * *

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে
এনে দিলে জ্ঞানামৃত; হ'লে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে।'

(কুহু ও কেকা, '১৪ই জ্যৈষ্ঠ')

অক্ষয়কুমার এই সাধনার পথে কোনও বাধা গ্রাহ্য করেননি। তাঁর এই একাগ্রসাধনা সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করেছিল। 'শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে'কে দেখে তাঁর সবচাইতে বেশী দুঃখ এইজন্যে যে, তাঁর তিরোধানে যেন 'সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা'র মত জ্ঞানের খনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 'বর্ত্তমানের বাবিল-চূড়া'র 'দানেশমন্দী তাজ' পড়ছে ভেঙে—'একটি চিতায়' আচার্য, লামা, প্রোফেসার, ফুঙি, ভট্ট, শমস্-

উল্-উলামা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ত্রিশটি ভাষার আধার এককালে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর 'অন্ত্যজন'দের 'বিদ্যা দিয়ে' অদৃষ্টকে ব্যর্থ করেছিলেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

মহাজ্ঞানী রমেশচন্দ্র দত্তকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, এই জ্ঞানীকে সম্মান দেখাবার জন্য যেন 'বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা'।

গৌতম বুদ্ধের 'জ্ঞানে' ভুবন ভরেছিল, সে কথা স্মরণ করে কবি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছেন।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান-ভুবনের জ্যোতিষ্কে'রা আরতির দীপ জ্বেলে তাঁর ললাটে জ্ঞান-নেত্রের প্রতীকস্বরূপ জয়-টীকা পরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, জগদীশচন্দ্র তাঁর জ্ঞানের অগস্ত্য-পিপাসা চরিতার্থ করতে গিয়ে জ্ঞান-সিন্ধুর সকল মোহানাকে একত্র সম্মিলিত করেছেন। তাঁর রচিত জ্ঞানের সোপান জগৎবাসীকে আনন্দের স্বর্গে উপনীত করতে পারে। এই 'জ্ঞেয়ান-রথের চালক'কে সত্যেন্দ্রনাথ আরও এক কারণে নমস্কার জানিয়েছেন। কবির ভাষায়,

'অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের'

(অভ্র-আবীর, 'মনীষী-মঙ্গল')

মনীষী 'ডেভিড হেয়ার' ছিলেন 'বিদ্যাদানে' 'অতন্দ্র'। 'শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ' করবার জন্য তাঁর এই নিঃস্বার্থ সাধনা কবির শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

অক্লান্ত জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের সাধনা সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। 'চির-কৌতূহলী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জিজ্ঞাসা প্রাচ্যের 'ত্রয়ীবেদ' আয়ত্ত করেও তৃপ্ত হয়নি, 'প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ নব্য জ্ঞান-ধাম' আয়ত্ত করে 'বিজ্ঞানের মহা যজু' এবং 'প্রজ্ঞানের সাম' কণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলে 'জিজ্ঞাসা-মশাল' জ্বেলে

অবিরাম পথ চলেছেন তিনি। 'বাণী-পূজা'র এই একাগ্রতায় তিনি বরেণ্য।

'শিক্ষা-সামের-উদ্গাতা' গোখ্‌লের চরিত্র-মাহাত্ম্য সত্যেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। গোখ্‌লের 'তিমির-হরণ দীক্ষা' যে সময়ে দেশবাসীকে বাঁচিয়ে তুলছিল, সেই সময়েই এই কর্মীর তিরোধান মর্মান্তিক। জ্ঞানী গোখ্‌লে 'ইল্‌ম্‌'এর মর্যাদা রাখতে জানতেন, তাই তিনি 'পয়সা-গেলাকলে'র মোহে পড়েননি। আপন জ্ঞানকে অপরের চক্ষু ফোটানোর কাজে প্রয়োগ করেছিলেন, জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়ে যেতে পেরেছিলেন পরাধীনতা-পীড়িত স্বজাতির প্রাণে।

জ্ঞানপথের পথিক মাত্রের চরণেই তিনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করেছেন। 'বাণীর পূজারী' হিসেবে কৃত্তিবাস ছিলেন তাঁর কাছে বন্দনীয়।

পৃথিবীর যেস্থানে যে মহাত্মা মানবাত্মার অবমাননার প্রতিবাদ করে মানবত্বের মহান্ বাণী প্রচার করেছেন, তিনিই সত্যেন্দ্রনাথের পূজ্যপাদ হয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথও সকল মানুষের মধ্যে প্রেম-বন্ধন স্থাপনের কথা বলেছেন,—স্বার্থপরতার সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করবার আবেদন জানিয়েছেন। আরও বলেছেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করলেই সত্যধর্ম পালন করা হয়।

'ঋষি টলষ্টয়ে'র চরিত আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মনে বুদ্ধদেবের স্মৃতি জেগেছে! কারণ এঁরা উভয়েই 'মহাবৈষম্যের মাঝে' 'সাম্যের বারতা' প্রচার করেছিলেন,—'বিশ্বপ্রেমের বাণী' উচ্চারণ করেছিলেন। টল্‌ষ্টয়কে সম্বোধন করে কবি বলেছেন,

'সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন'

(কুহু ও কেকা, 'ঋষি টল্‌ষ্টয়')

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—ত্রিতাপ নির্ব্বাণ'—বুদ্ধদেবের এই মহাবাণী সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণে গভীর রেখাপাত করেছিল। গৌতম বুদ্ধ তাই ছিলেন কবির পরম আরাধ্য। সত্যেন্দ্রনাথ সারাজীবন সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠের সন্ধান করে ফিরেছেন,

'সুবিশাল হৃদয় যাহার
কেঁদেছিল মানবের দুখে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেলসম বিঁধিল যে বুকে,
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে,
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে,
জগতে গাহিল শান্তিগান'

(হোমশিখা, 'সবিতা')

'বুদ্ধকল্প' বিশ্বপ্রেমিকের সন্ধানে তাঁর তৃষিত আত্মা ছুটে বেড়িয়েছে। 'বুদ্ধপূর্ণিমা' (বেলা শেষের গান) কবিতায় একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'তে 'মৈত্র-করুণার মন্ত্র' দান করবার জন্য সেই মহাপুরুষকে আবির্ভূত হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

'বড়দিনে' তিনি মানব-দরদী যীশুখৃষ্টের প্রশস্তি গেয়েছেন। মানুষের প্রতি অবিচার অসম্মানের প্রতিবাদ খৃষ্টের সমস্ত অন্তর থেকে ধ্বনিত হত। 'নিরীহজন' যে 'লাঞ্ছনা সয়', 'সে লাঞ্ছনা' বাজত তাঁর বুকে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন, এমনি করেই,

'পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে'

(বিদায় আরতি, 'বড়দিনে')

কবি এই মানব-প্রেমিককে 'বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশ' ভারতের 'ভক্তমালে'র 'নূতন মণি' হিসেবে গ্রহণ করে বন্দনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে তিনি মানবত্বের অবমাননাকারী 'কংসের বংশের' 'চিরভয়' হিসেবে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তন করেছেন।

বুদ্ধ, খৃষ্ট, কৃষ্ণ এঁদেরই পদানুসরণ করে ভারতবর্ষে অপর এক মহামানব জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন জন-সেবক মহাত্মা গান্ধী। 'বিশ্বধাতার সেই পতাকা তিনি বহন করতেন—"সত্য যাহার

একপিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম"'। এই প্রেমিক পুরুষ, মানুষের মনে মনুষ্যত্বের প্রতি সম্ভ্রম-বোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টায় অশেষ দুঃখ বরণ করেছেন। ভৃত্যের সেবা নিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন তিনি তাতে মানুষকে ছোট করা হয় বলে। মেথরের মেয়ে পোষ্য নিতে দ্বিধা হয়নি তাঁর। ক্ষুদ্রে-মহতে তিনি 'আত্মার চির জ্যোতি' দেখেছেন। এর পরিচয় দিতে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে
(বেলা শেষের গান, 'গান্ধিজী')

নিপীড়িত মানবত্মার উদ্ধার কল্পে অহিংসা-কঠোর ব্রতী মহৎপ্রাণ 'গান্ধিজী'র প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই নেতার উদার আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল। 'মহম্মদের ধর্ম্ম-শৌর্য্য' এবং 'বুদ্ধদেবের মৈত্রী'তে মিলন-সাধন করে 'সত্য'-বোধ পালন করতে গিয়ে 'সারাটা-জীবন' তিনি 'খৃষ্টদেবের ক্রুশ' কাঁধে বহন করেছেন। কাজেই তাঁর চরিত-কথা 'অমৃত-সমান'।

মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদকারী, স্বদেশীর লুপ্তমর্যাদার পুনরুদ্ধারাকাঙ্খী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেও সত্যেন্দ্রনাথ ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'হিয়ার চিন্তামণি ঘরে' 'বিশ্বমানবের 'জলসা' তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্রবিশ্বকেই বক্ষে ধরতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁর মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিলনা।

'বিদেশিনী নিবেদিতা' এদেশের মানুষের সেবা করতে এসেছিলেন নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে। দুঃস্থ মানুষের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। 'নিবেদিতা' (কুহু ও কেকা) 'কবিতায় কবি দেবতার দেওয়া' এই ভগিনীর চরিত-আলোচনা করেছেন।

'বিশ্ববন্ধু' উইলিয়ম ষ্টেড 'নিঃস্বনির্জ্জিতে'র সেবায় মধ্য দিয়ে ন্যায়-ধর্ম পালনের কথা বারংবার ঘোষণা করেছেন। মানব-কল্যাণ-

ব্রত পালন করতে করতেই তাঁর দেহান্তর ঘটে। জীবসেবায় তাঁর এই আত্ম-বিসর্জন সত্যিই 'কীর্তনীয়'।

পাশ্চাত্যের অপর এক মনীষীও ছিলেন এমনি 'মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত'। নাস্তিকের ছদ্মবেশে তিনি ছিলেন 'আস্তিকের গুরু'। কারণ তিনি যে 'নর-সেবা-ব্রত' গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেই সত্যধর্মের অধিষ্ঠান। এই আর্তের বন্ধু, 'ছাত্রের দেবতা' ডেভিড হেয়ার সত্যেন্দ্র-নাথের চক্ষে দেবোপম মহিমার অধিকারী ছিলেন।

'বিশ্বমৈত্রী'র প্রচার নানাজন নানাভাবে করেন। কেউ ধৈর্য্যপূর্ণ শান্ত প্রতিবাদ দ্বারা, কেউবা কর্মের মাধ্যমে। 'রাজর্ষি রামমোহন' মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন—'উচ্চে ধরি' তর্ক-তরবার'। হিন্দু সমাজের 'অর্থহীন নারীহত্যা-পাতক' নিবারণের প্রধান নেতা হিসাবে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে বলেছেন,

'কীর্ত্তি তব কীর্ত্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত!
বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত,
যুগ যুগন্ধর রাজা! রাজ-পূজা প্রাপ্য সে তোমার ;—
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত বাঙালার।

(অভ্র-আবীর, 'রাজর্ষি রামমোহন')

'বিপন্ন মানবের আর্তস্বরে কাতর হয়ে অস্পৃশ্য মেথরের প্রাণ-রক্ষার জন্য 'নফর-কুণ্ডু'র আত্মত্যাগ সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল।

কবি কৃত্তিবাস 'পৈতা-ছেঁড়ার' বিন্দুমাত্র আশঙ্কা না করে ন্যায়-বিচারের পরিপোষক শ্লোক রচনা করেছিলেন। উৎপীড়িতের কষ্টে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে, সাম্যের 'মহাসাম' ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। 'বিধান-দাতা' হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ তাই এই 'সাম্য-সামের আদি' গায়ককে বরণ-মালা দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহ অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে 'সর্ব্বসঙ্কীর্ণতা' বর্জিত 'বিশ্বজনীনতা'র আদর্শ লাভ করেছিলেন। এই কারণেও সত্যসন্ধ অক্ষয়কুমার ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের পরম আরাধ্য।

সমাজের অন্যায় বিধি-বিধান সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তি যে কত তীব্র ছিল, সে কথা তাঁর 'মানবিকতার আলোচনাতে * বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। সমাজের এই ত্রুটি দূর করবার পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সকলেরই চরিত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন। এই সূত্রে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাসের কথা স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জন্য অর্ঘ্য রচনা করতে গিয়ে বারবার এই কথাটিই বলেছেন যে,

'শূদ্র দ্বিজের পৃথক্ আইন—
আছে মনুর কুকীর্ত্তি,
ঠাকুর কুকুর একসা করে
নাড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি।'

(বেলা শেষের গান, 'বিধান-দাতা')

বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধার উৎস তারও অন্যতম কারণ এই যে,

'শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর—'

তাদের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রহরণ ছিল সদা উদ্যত। "বিধবাদের দুঃখ-মোচনের পণ গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর 'সব্যসাচীর মত রণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই 'আনন্দহীন বঙ্গভূমিতে ঐ আদর্শ মহত্ত্বের পুনরাবির্ভাবের জন্য কবির চির-প্রতীক্ষা ছিল। 'সাগর-তর্পণ' কবিতায় তিনি বলেছেন,

'প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।'

(কুহু ও কেকা)

এ থেকে বোঝা যায় সত্যেন্দ্রনাথের চারিত্রপূজার পিছনে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার, মহত্ত্বের আদর্শ অনুসরণের নির্দ্দেশ আছে।

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ধর্মের ভেকধারীরাই সমাজের যত দুরবস্থার কারণ। কালী-প্রসন্ন সিংহ এঁদের অন্যতম ছদ্মবেশ 'টিকি'র মূল্য কি, তা জগৎসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তাঁর 'টিকিমেধ যজ্ঞে' সেই ধার্মিকেরা কেউ মোহর, কেউ টাকাটি, সিকিটির বদলে টিকি বিসর্জন দিয়ে গিয়েছিলেন। এই 'মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে—নরকের গন্ধময়' ধর্মপ্রাণদের স্বরূপ-প্রকাশক রসিক কালীপ্রসন্ন সিংহকে 'পুণ্যশ্লোক' হিসেবে সম্মান দিয়েছেন কবি। দ্বিধাহীন চিত্তে কঠোর সত্য বলবার সাহস ছিল এই সমাজসেবা ব্রতীর। কবি এই সত্যনিষ্ঠারও পূজা করেছেন, এবং বঙ্গে আবার এমনি সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম কামনা করেছেন।

স্বদেশ-হিতৈষীদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। এঁদের আত্মত্যাগ, অপরিসীম ধৈর্য ও সাহস, এবং আত্ম-বিশ্বাসপূর্ণ কর্মধারা সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভক্তিভাব উদ্রেক করত। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য মহাত্মা গান্ধীর কঠিন তপস্যা সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়কে অভিভূত করেছিল। 'গান্ধিজী' কবিতায় কবি এই নেতার দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধন এবং কীর্তির কথা বর্ণনা করে তাঁর মহত্ত্বকীর্তন করেছেন। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্যই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। 'ছোটখাট ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্য মহতের মহত্ত্ব খর্ব হয় না, এই ছিল তাঁর মত।

'দূরবীণ কসে বিজ্ঞেরা ঘোষে, 'সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসীলেখা!' আলোর তাহে কি কমি হয় এক ছিটে?
সেই মসী নিয়ে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
রশ্মির ঋণ বাড়ায়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।'

(বেলা শেষের গান, 'গান্ধিজী')

কাজেই নিন্দুকদের প্রতি তাঁর নিবেদন,

'হেসনা হেসনা হ্রস্বদৃষ্টি, হেসনা বিজ্ঞহাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী'

(ঐ)

তিনি নিজে এই অহিংসাব্রতী প্রেমনিষ্ঠ কর্মী,

'আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম'

(ঐ)

নিঃসংশয় চিত্তে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন।

'স্বদেশ প্রেমের সজীব মন্ত্র' দাতা, স্পষ্টভাষী, 'সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা', 'তিলকে'র স্বরাজের স্বপ্ন এবং 'ধ্রুব' 'স্বদেশ-প্রীতি' সমস্ত 'বাংলামুলুকে'র হৃদয় অধিকার করেছিল। এঁকে কবি 'জাতীয়তার তিলক' বলে অভিনন্দিত করেছেন।

'রাজর্ষি রামমোহনে'র প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ, এই তেজস্বীপুরুষ 'সুপ্ত মাতৃভূমি'কে উদ্বোধিত করে 'নবযুগে'র প্রবর্তন করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের চারিত্রপূজা বিষয়ক কবিতাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার এক বৃহৎ অংশ লিখিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে। এই অন্তহীন শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ কবিগুরুর স্বদেশপ্রেম। ভারতের বিদেশী শাসকদের অন্যায় কার্যের প্রতিবাদে কবি তাদের দেওয়া উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এই কাজ 'শঙ্কামূঢ়' স্বদেশবাসীকে শক্তি ও সাহস দিয়েছিল। এই 'আত্মবোধের ঋষি'র চরণে সত্যেন্দ্রনাথ 'প্রাণের অর্ঘ্য, সমর্পণ করেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ম্যাক্সুইনির 'ইচ্ছা-মৃত্যু' বরণ সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। 'ইচ্ছামুক্তি' কবিতায় তাঁর সম্বন্ধে স্বাধীনতাকাঙ্খী মানব-দরদী সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'মানুষ তারে করবে পূজা, ঠাট্টা তারে করবে অমানুষে,
জাতীয়তার খৃষ্ট সে, তার শরীর পতন স্বাধীনতার ক্রুশে।'

(বেলা শেষের গান)

'বঙ্গের দুঃখের কথা, সদা করি গান' যাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল, সেই হেমচন্দ্রের উদ্দেশে সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা পুষ্পাঞ্জলি উৎসর্গ করেছেন।

ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকদের সত্যেন্দ্রনাথ আদর্শ চরিত্র বলে গণ্য করতেন। অন্যায়ের অরি মাত্রের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা স্বতঃ-উৎসারিত হয়েছে। 'গান্ধিজী', রামমোহন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির দৃষ্টান্ত তাঁর প্রাণে ন্যায়-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সঞ্জীবিত করত। পুরাণ ইতিহাসের যেসব চরিত্র ন্যায়নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—যাঁদের নাম 'ন্যায়ধরমের স্বর্গে তাজা' হয়ে রয়েছে—সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের বন্দনা গানেও মুখর হয়েছেন। তাঁর 'সর্ব্বদমন' (বিদায় আরতি), 'ইন্সাফ' (বিদায় আরতি), 'স্কন্দধাত্রী' (বিদায় আরতি) ইত্যাদি কাহিনী-কাব্যে তা লক্ষ্য করা যায়। পুরাণ-ইতিহাসের ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, পরাশর, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, বাল্মীকি, কালিদাস, দ্বৈপায়ন, ভীষ্ম, ভরত, 'অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজয়সিংহ' (কুহু ও কেকা, 'চৌদ্দ প্রদীপ'), 'মৌর্য্যমণি চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি অনেককেই তিনি বন্দনা করেছেন।

সর্বশেষে সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারীদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অর্ঘ্য নিবেদনের কথা আলোচনা করা যাক। এ প্রসঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রপূজার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এই মহাকবির উদ্দেশে লেখা তাঁর দশখানি কবিতা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।* তাছাড়া ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের 'ভারতী'তে (পৃ-১১১৫) কবিগুরুর উদ্দেশে লেখা একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে তাঁর 'সহরে ফাল্গুনী (সচিত্র), প্রবন্ধের শেষেও একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রীতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাগুলির অধিকাংশেই সাহিত্যিক প্রতিভার বন্দনা করা হয়েছে।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীন নিয়ম-শৃঙ্খল ভেঙে বাংলা ভাষার 'ভাস্বর-মূর্ত্তি' প্রকাশ করে 'সাহিত্য-সগর খাতে' 'ভাগীরথী-ধার' স্বরূপ নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন 'প্রবল জীবন-বেগ' সম্পন্ন কবি মাইকেল মধুসূদন। সত্যেন্দ্রনাথ এই কবির উদ্দেশে বলেছেন,

---

* 'কবি-প্রশস্তি' ও 'অর্ঘ্য' (কুহু ও কেকা), 'দিগ্বিজয়ী' ও 'আভ্যুদায়িক' (অভ্র-আবীর), 'কবি-জুবিলি' ও 'নমস্কার' (বেলা শেষের গান) 'মালাচন্দন', 'পরমান্ন', 'কবি-পূজা' ও 'নীরব নিবেদন' (বিদায়-আরতি)।

'দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্ব্বতে,
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।'

(অভ্র-আবীর, 'মহাকবি মধুসূদন')

বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করেছেন—তা,

'হয়েছে নূতন,
হয়েছে যে বাঙালীর একান্ত আপন'

(বেলা শেষের গান, 'অর্ঘ্যপঞ্চক')

সত্যেন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসকে সম্বোধন করে আরও বলেছেন,

'দেবভাষা দেবলোকে যে ছিল গো,
তব তপে সে যে এল কানাচে

*　　*　　*

তোমার গানের রেশ লাগি কানে
কত প্রাণে গান উঠিল জেগে'

(ঐ)

আর,

তুমি　'জাগিয়ে যখন দিলে জাগ্‌ল সবাই,
আজি　লক্ষ পাখীর গানে বিশ্রামই নাই।'

(ঐ)

কৃত্তিবাসের আর এক মহত্ত্ব, সম্মান আর 'শ্রোতার মন্‌-কমল' ছাড়া রাজসভায় গিয়েও তিনি আর কোন দান গ্রহণ করতেন না। বঙ্গ-কবির আদর্শ হওয়া উচিত এইরকম। সত্যেন্দ্রনাথ 'শ্রদ্ধা-হোমে' যজ্ঞ-হবি প্রদানের পূর্বে বলছেন,

আজি　'বিশ্বে যে পায় পূজা বঙ্গবাণী
তারি　গড়্‌লে প্রথম তুমি আদ্‌রাখানি,
তারে　পূজ্‌বে যে পূজ্‌বে তোমায় সে, কবি!
জ্ঞানে　অজ্ঞানে অর্পিবে যজ্ঞ-হবি।'

(ঐ)

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস 'এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে' 'সাপের ডেরায় কাঁটার মালাগলে' 'কেয়াফুল'টির মত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাব্যসৌরভ বিতরণ করে গেছেন। মানসচক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসকে 'সরস্বতীর পায়ের ছায়ে' 'ত্রিকাল ধ'রে' ফোটা পদ্মটির 'পরাগ হয়ে' থাকতে দেখেছেন।

গোলাপ অশোকের ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে 'গানের উছাস-ভরা' প্রাণটির অভাব অনুভব করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর দুঃখ হয়েছে,

'যম নিয়মের তপ্ত মরুস্থানে
হারিয়ে গেল সরস্বতীর ধারা।'

(বিদায়-আরতি, 'কবি দেবেন্দ্র')

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় করুণ-রসপ্রধান বাঙালীর মধ্যে জন্মেছিলেন 'মূর্ত্তহাস্যের অবতার' রূপে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে আবার মন্দ্ররবও ধ্বনিত হত। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'ফেনিল হাস্য
সাগরের মত তার;
বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলে মিশে একাকার!' *

(অভ্র-আবীর, 'তান্‌কা-সপ্তক')

'তান্‌কা-সপ্তকে' এই প্রতিভাশালী কবির জন্য সত্যেন্দ্রনাথের শোকের গভীরতা অনুভব করা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখাতেই প্রথম বাংলা গদ্য-সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন 'সহজ

* রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্য সম্বন্ধে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'মন্দ্র' প্রবন্ধে এই ধরণের কথাই বলেছেন—
কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন।

ভাবার প্রেমে' 'সহজিয়া'। সংস্কৃত অলঙ্কারের পরিবর্তে দেশী অলঙ্কারে তিনি 'স্বদেশের সরস্বতী'কে সাজিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন,

'যে বলে গো বাঙ্‌লা বুলি বোঝে সে তোমারে,
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা
বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে
বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ডা তুমি পাকা।'

(অভ্র-আবীর, 'শতবার্ষিকী')

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে কবি 'অন্যায়ের বৈরী', সত্যের সৈনিক 'সমাজ-শোধন' ব্রতী হিসেবে 'বরেণ্য' বলেছেন। দীনবন্ধুর রসিকতা 'বীভৎস-কুৎসিত' নয়, তিনি দর্শক সমাজের রুচি বা চাহিদা অনুযায়ী নাট্যরচনা করেননি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন,

'বাস্থিকের ভিত্তি গড়ি' নিমচাঁদ করি' আবিষ্কার
হাসি দিয়া নাশি রোগ করেছে হে সুপথ্যে পোষণ।'

(অভ্র-আবীর, '৺দীনবন্ধু মিত্র')

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক পরে 'বিচিত্রা' (১৩৩৭) পত্রিকায় তাঁর যেসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি কবিতায় ('নট-কবি গিরিশচন্দ্র') তিনি নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কীর্তি বর্ণনা করে তাঁর মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন,

'নটের আদর্শ সেই, নাট্যের সে প্রথম আলোক,
বঙ্গ-রঙ্গ-ভুবনের গিরিশ, গিরীশ-লোকালোক,—
শীর্ষ তার ঘিরি' নিত্য আলো আর আঁধারের খেলা,
জীবনের মহারঙ্গ—হাসি ও অশ্রুর মহামেলা।'

(বিচিত্রা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ-৭১৮)

সত্যেন্দ্রনাথের চারিত্রপূজা কেবল কয়েকটি মহৎ চরিত্রের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনেই পর্যবসিত ছিল না। তিনি জানতেন 'কীর্তি-কথা স্মরণ কীর্তনে'র মধ্য দিয়ে 'অন্তরের শ্রদ্ধা' নিবেদন করা যায় বটে, কিন্তু পূজার সার্থকতা সেই মহত্ত্বের অনুসরণে। জ্ঞানযোগী অক্ষয়-

কুমারের শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই দুটি কথায়,

'হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায় ।'

(কুহু ও কেকা, '১৪ই জ্যৈষ্ঠ')

তিনি নিজেকে সতর্ক করেছেন এই বলে,

'তব প্রিয় কর্ম্ম ত্যজি' যেন তব তর্পণে না বসি'
বিদ্যা তব বিবর্জ্জিয়া শুধু যেন কৌলীন্য না ঘোষি' ।'

(ঐ)

চারিত্রপূজার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যাতে পূজনীয় জনের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। কর্মের মধ্য দিয়েই যেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটে ।

'সত্য দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,—
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই'

(ঐ)

(ঙ) সত্যেন্দ্র-কাব্যে মানবীয় প্রেম

বাংলা দেশের কবিরা ভগবান ও ভক্তের মধ্যেকার সম্পর্কটির স্বরূপ নির্ণয়ে যেমন নর-নারীর প্রেমলীলার রূপক অবলম্বন করেছিলেন, নর-নারীর প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাতেও তেমনি দেবলোকের আলোক এনে ফেলেছেন চিরদিন। বাংলাদেশের মাটির ঘরে তাই দেবতা-মানুষে মেশামেশি হয়ে গেছে। সত্যেন্দ্র-কাব্যেও এই জিনিসটি পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রেমকে বন্দনা করেছেন তার মধ্যে দেহগত রূপের অস্বীকৃতি নেই। কিন্তু রূপের মধ্যেই প্রেম চির আবদ্ধ, এ কথারও স্বীকৃতি নেই তাতে। দেহসৌন্দর্যের যে আকর্ষণ—তাতে মোহ আছে, আছে মাদকতা—তার তুলনা 'আফিমের ফুলের' সঙ্গে। আর রূপকে অবলম্বন করে যে রূপাতীত প্রেম—তার উপমা 'চামেলি-মুকুলে'। 'মরণের ঘায়ে' 'রূপের বাসা' টুটে যায়—'আফিমের ফুল' ঝরে—কিন্তু 'বাঁচে তবু চামেলি অতুল', প্রেম—সে অমর। আর,

'নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।'

(অভ্র-আবীর, 'তাজ')

দেহ প্রেমের আধার। তাই মানবীয় প্রেমে দেহ সম্পূর্ণ অবহেলিত হতে পারে না। দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা মানুষের পক্ষে সুকঠিন। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ-সৌন্দর্যেরও বিশেষ স্থান রয়েছে। এইজন্যই আমাদের 'মদন-মহোৎসবে' 'অশোকফুলের' মত রূপের কামনা ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও প্রেমে রূপের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। তাঁর বিস্ময় ছিল,

'কেন হৃদয়, ভিখারী হয়
রূপের সমুখে ?

('মানসী', 'গুপ্তপ্রেম')

এই 'রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচেনা সে পোদ্দারে' তাই রূপের মূল্য যে বোঝে, তার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ সহানুভূতিশীল।

'রূপের তরে' তার 'হানাহানি' কবির কাছে 'বদ্‌রীতি' বলে বোধ হয় না। রূপ প্রধান না হলেও রূপই প্রথম, একথা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে পাওয়া যায়,

'চোখের দাবী মিটলে পরে তখন খোঁজে মন,
তাইতো প্রভু! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।'

(কুহু ও কেকা, 'মদন-মহোৎসব')

কিন্তু 'মনের ক্ষুধা' মিটানোর শক্তি না থাকলে 'শুধু রূপের আদর' অক্ষয় হয় না। তাই কবি 'মনোহরণ বিদ্যা'ও ভিক্ষা করেছেন 'মদন-মহোৎসবে'। প্রেমের লীলার মধ্যে 'মনোহরণ বিদ্যা'র প্রকাশ। নারী সম্বন্ধে পুরুষের অভিযোগ,

'নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে স'রে থাক!
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন্ স্বপন আঁক!
পূজা চাও তুমি হৃদয় প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী!
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবেনা তোমায় সেবি'!

(কুহু ও কেকা, 'লীলার ছল')

আর নারী নিজেকে আবৃত করে, দূরে সরিয়ে, প্রেমাস্পদকে আরও গভীর ভাবে অনুভব করতে চায়। (কুহু ও কেকা, 'অবগুণ্ঠিতা') এই দ্বন্দ্ব-লীলার মধ্য দিয়ে তাদের আকর্ষণ হয় তীব্রতর। কিন্তু, এই মোহসৃষ্টিতেও চরম কথা নেই। এতে 'প্রেমের পরশ' চাই। তবেই 'মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও' তাতে 'প্রাণের পরিচয়' পাওয়া যাবে। আগে বলেছি সত্যেন্দ্রনাথ রূপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন,

'রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা'

(বেণু ও বীণা, 'রূপ ও প্রেম')।

'বেণু ও বীণার' 'রূপ ও প্রেম' কবিতায় তিনি বলেছেন,

'নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া।'

এই ভাবে তিনি প্রেম ও রূপের পারস্পরিক সম্বন্ধকে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মত এই কবিও বিশ্বাস করতেন যে, প্রেমের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। পুরাতন এই পৃথিবীতে যে নূতন লীলা দেখতে পাই আমরা, সে প্রণয় সত্যি সত্যি নূতন নয়। যুগযুগান্ত ধরে এই প্রণয়ের আয়োজন চলতে থাকে। প্রেম অনন্ত। জীবনধারার বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় একসময়ে আমরা 'গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম'।* পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ হয়নি তখন। জীবজগতের বিচিত্র বিকাশ ঘটেনি। সত্যেন্দ্রনাথ অনন্তপ্রেম এবং জীবনের বিবর্তনের ধারণা দুটিকে একত্র করে সেই সময়ের কথা কল্পনা করেছেন,

'তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে'

(কুহু ও কেকা, 'তুমি ও আমি')

তারপর বিচ্ছেদ হল। নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অধিকারী হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাবার সুযোগ পেল। পূর্ব ঐক্যের স্মৃতি উভয়ের মধ্যেই মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তুলল। নারী-পুরুষের মিলনে তাই 'হারিয়ে-পাওয়া'র গভীর সুখের স্বাদ রয়েছে। কবির ভাষায়,

'কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে
মূর্চ্ছিত কত স্মৃতি!'

(কুহু ও কেকা, 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ')

সত্যেন্দ্রনাথ 'সেই পরিণয়'কেই 'সুখের নিলয়' বলে জানতেন— 'প্রণয় যাহে দৃষ্টি রাখে'। (বেণু ও বীণা, 'প্রেম ও পরিণয়')। 'পরস্পরের প্রেম' বিবাহিত জীবনে পরস্পরের 'জীবন পথের যষ্টি'

* 'ছিন্নপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহ, ৯ই ডিসেম্বর।

স্বরূপ। এই 'যষ্টি'র সাহায্যেই সর্ব বিঘ্নবিপদ তুচ্ছ করে 'হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা' নবদম্পতি জীবনপথে যাত্রা শুরু করে। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রেমে 'মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত' ভাবটি কল্পনা করেননি। 'পিছল পথের পথিক' এই 'দীঘল পথের যাত্রীদের' মুখে তিনি এই ভাষাই আশা করেছেন,

'উড়াব উর্দ্ধে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।

*　　*　　*

মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি ॥'

('মহুয়া', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেমিক-প্রেমিকাও বলেছিল,

'হোক্ না বাতাস তুষার-স্পর্শ—উদ্‌ঘাতিনী পন্থা!
সঙ্কটেরে করব সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা।
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।'

(অভ্র-আবীর, 'দোসর')

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেম-রূপ চন্দ্রের আরাধনা করতে গিয়ে সেই প্রেমকেই আহ্বান করেছিলেন—যাতে,

'শক্তি লভে ভীরুচিত্ত জনে'

(হোমশিখা, 'সোম')

কবি বিবাহিত জীবনে রমণীর কল্যাণীরূপের কল্পনা করেছেন। এই সর্বকর্মরতা রমণীদের 'প্রিয়া' বা 'প্রাণেশ্বরী' বলে সম্বোধন করা যায় না। সকল কৃত্রিমতার ছায়াশূন্য সহজ সাধারণ 'ওগো' ডাকই এঁদের পক্ষে মানান সই।

(কুহু ও কেকা, 'ওগো')

প্রেম প্রতি মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। একে অস্বীকার করে চলতে গেলে জীবনের এক বড় সত্যকেই অস্বীকার করতে হয়।

আর জীবনে দেখা দেয় অসম্পূর্ণতা। সন্ন্যাসী যাঁরা, পৃথিবীর সহজ জীবন-পথকে অগ্রাহ্য করে যাঁরা ভিন্নপথ অবলম্বন করেন, তাঁদের পক্ষেও একথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সমস্ত যৌবন কালটা ধরে সব কিছু থেকে নিবৃত্তির সাধনা করে চললেও একসময়ে না একসময়ে সকল বন্ধন ছিঁড়ে 'শিথ্‌লে দিয়ে গেরুয়া আঁচল' 'চেলীর নিচোল' দেখা দেয়। 'অভ্র-আবীর' গ্রন্থের 'ঊর্দ্ধবাহুর প্রেম' কবিতায় এই রকমের প্রেমের কথা বলা হয়েছে। হৃদয়কে তৃষিত রেখে সাধনায় সিদ্ধিলাভের যে চেষ্টা, জীবনকে ফাঁকি দিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছনোর যে প্রয়াস, তা সফল হতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও বহু জায়গায় এইরকম কথা পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের 'শবাসীন' (তুলির লিখন) কবিতায় এমনি এক সন্ন্যাসীর আত্ম-বিলাপ আছে। প্রেম যতদিন অবহেলিত হয়েছে, ততদিন কোন সাধন পন্থাতেই প্রাণ সাড়া দেয়নি। আর যেই মুহূর্তে 'ব্রহ্মচারীর সকল গর্ব্ব ধ্বংস' করে প্রেম জয়ী হয়েছে, অমনি সব সাধনার কঠিন যে 'শবের সাধন' তাও হয়ে গেছে সোজা। সন্ন্যাসীর মনে হয়েছে 'চিতার বিভূতি ভস্ম সে নয়,—প্রেম তীর্থের ধূলি'। তাঁর নতুন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত সংসার 'প্রেমতীর্থ' হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, 'মরণের মাঝে'ও 'মাধুরী'র সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেমের মহত্ত্ব বুঝেছিলেন পুরোপুরি। প্রেমের জন্ম যেখানেই হোক তার মহত্ত্বের মর্যাদা তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতেন। তাঁর কাব্যে দেখি—প্রেমের আলোক সম্পাত করে কলুষ-পঙ্কিল জীবনকেও তিনি মহনীয় করে তুলেছেন। 'শোভিকা', 'বিষ-কন্যা' এদের প্রণয়ের মূল্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। পতিত জীবনের প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা তাঁর লেখনীর মুখে বেদনার নির্ঝর সৃষ্টি করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। 'তুলির লিখনে'র 'শবাসীন', 'শোভিকা', 'বিষকন্যা' ছাড়া 'বশ্‌মন্ত্র' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'ফুলের ফসলে'র 'মধু ও মদিরা', 'প্রেম-ভাগ্য' প্রভৃতি কবিতাতেও এই বেদনার প্রকাশ আছে।

প্রেম-কল্পনায় রাধা-কৃষ্ণ লীলার প্রভাব আমাদের কবিদের কাব্যে খুব বেশী দেখা যায়। সত্যেন্দ্র কাব্যেও তার পরিচয় আছে। বাঁশীর সুরে সত্যেন্দ্রনাথের নায়িকার 'পিঞ্জরাহত পরাণ-পাখী'র পাখা চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'সুদূর অতীতে' বাঁশরী বাজিয়ে কে যে তাঁকে উন্মাদ করে গেছে—সে বাঁশীর ধ্বনি আর কান থেকে যায়না, বাঁশীর সুর জলে স্থলে সর্বত্র সর্বদা ধ্বনিত হয়ে তাঁকে বাতায়নে আর দ্বারে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে আর মনে প্রশ্ন জাগে,

'একি বিষ! একি মধু!'

এ ছবি চির-পুরাতন রাধিকার। এই কবিতাটিতে আধ্যাত্মিক অর্থ আরোপ করলেও বৈষ্ণব কবিতা হিসেবে এর বিশেষ অর্থ পাওয়া যেতে পারে। আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে 'চিরসুদূর' (ফুলের ফসল) কবিতাটিতেও। চণ্ডীদাসের পদে আমরা মিলনেও অতৃপ্তির যে পরিচয় পেয়েছি, সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাটিতে তারই অনুরণন,

'এত কাছে থেকে হায় তবু এত দূর!
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর!
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর!'

এ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় প্রেমের ধারণাটিও জানা যায়। 'কুহু ও কেকা'র একটি কবিতায় এই ধারণা আরও স্পষ্ট,

'ফুলের ঘা' দিলে হ'বে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশগুল্ হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,

যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।'
ইত্যাদি
('সহজিয়া')

সত্যেন্দ্রকাব্যে 'প্রেমের প্রতিমা' কিশোরীর রূপ-কল্পনাতেও বৈষ্ণব কাব্যের ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

'অলপ বয়সী বালা
অসীম রূপের খনি
ভূলুণ্ঠিত যূথীমালা
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি'
('সোম', হোমশিখা)

এই পংক্তিগুলি বিদ্যাপতির,

'ধনী অলপ বয়সীবালা
জনি গাঁথনি পুহপ মালা'

ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেয়সীর রূপ অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। 'লব্ধ দুর্লভ' (কুহু ও কেকা) কবিতায় কবির প্রেয়সীর যে রূপ এবং সেই 'স্বপ্নসখী'র 'মূর্ত্তি ধরে' 'মর্ত্ত্যে' আসার আগে কবির কল্পনায় তার লীলার যে বর্ণনা তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'র ('সোনার তরী') সাদৃশ্য অনেক খানি। 'ফুলের ফসল' গ্রন্থে 'কিশোরী'র বর্ণনাতে তাঁর মৌলিক কল্পনা ধরা দিয়েছে। এই কিশোরীর রূপে সব কিছু বিহ্বল। তার 'জলচুড়িটি', 'আল্‌তা-পরা' চরণ, 'গঙ্গাজলী ডুরে' আর 'নীলাম্বরি,' 'সিঁথির সিঁদুর', সিঁদুর টিপ আর খয়ের টিপ, কানের দুল ইত্যাদি পৃথিবীতে সৌন্দর্যের লহর তুলেছে,

'তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে'
(ফুলের ফসল, 'কিশোরী')

এই কল্পনাতে কোন গভীর তত্ত্ব নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সেখানে।

সত্যেন্দ্র-কাব্যে রোম্যান্টিক প্রেম-কল্পনাও আছে। ভালবাসা প্রকাশিত হলে তার মূল্য পাছে কমে যায় তাই কবি তা গোপন রাখতে বলেছেন। 'নীরবতার নিবিড়তা'তে 'প্রাণের মধুর স্বপন্' থাকে বেঁচে, হৃদয়ে যে ছবি অঙ্কিত হয়ে যায়, তা থাকে অমলিন। (ফুলের ফসল, 'নীরবতার নিবিড়তা')

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেম বিষয়ক কবিতায় হাস্যরসের মিশ্রণও আছে। 'কুহু ও কেকা'র 'ওগো' কবিতাটি এই পর্যায়ে পড়বে। 'হসন্তিকা'র 'জবান-পাঁচিশী' কবিতায় নানাভাষায় প্রেয়সীর প্রতি নিবেদন রচিত হয়েছে। এরও মূল লক্ষ্য কৌতুক-উৎপাদন। 'আদর্শ বিয়ের কবিতা'তে প্রেম-লোলুপ একাধিক দার-পরিগ্রহ-কারী বাঙালীদের নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে।

প্রেমের দৃঢ়বন্ধন, প্রেম-ব্যাকুলতা, মান-অভিমান, বিরহ বেদনা, প্রেমের প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। এগুলির প্রায় সব কটিই ছোট ছোট গানের আকারে রচিত। কবিতাগুলির ভাবে কোন গভীরতা নেই, আছে 'মিহিন্-হাওয়ায়' 'মোহন সুরের সুষমা' বিস্তার।

(চ) সত্যেন্দ্র-কাব্যে বাৎসল্যরস

শিশুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে কল্পলোকের মাধুর্যের অবতারণা হয়। সন্তান মানুষের চির কামনার ধন। নন্দনবনের 'সন্তানকের শ্যামল বিতান' যেমন করে মানুষের বুক ভরে দেয়, কল্পতরুর শতপ্রসাদেও ঠিক তেমনটি হয় না। সন্তানলাভের স্বর্গীয় আনন্দের সঙ্গে অন্য কোন আনন্দেরই তুলনা চলে না।

'ছোট ছোট ছোট নন্দন যার ঘরে
নন্দন-বনে সেইতো বসতি করে'

(অভ্র-আবীর, 'সন্তানক')

পৃথিবীতে শিশু প্রকৃতির মহাবাণী বয়ে আনে। তার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই, নেই ভেদাভেদের জ্ঞান। তার সারল্যের সৌন্দর্য এই হিংসাবিক্ষুব্ধ জগতের অশান্তির মধ্যে শান্তিবারি সেচন করে। (হোমশিখা, 'সাম্য-সাম')। সত্যেন্দ্রনাথের চোখে এই সুন্দর সত্য ধরা পড়েছিল। মানবের ঘরে শিশুর আগমন ছদ্মবেশী দেবতার আগমনের মত। ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ শুরু হয় এই 'নূতন মানুষে'র অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে। ঐন্দ্রজালিক শিশুরাজার আগমনে 'মরণ-বাঁচন-মেলার মাঝে' 'শুভশঙ্খ' বেজে ওঠে। সন্তানসৌভাগ্য লাভের জন্য নারী কত না ব্রত পালন করে। এমন কি শরীরের মাংস কেটে দিতেও দ্বিধা করে না। শিশুর মমতায় তার বুকের রুধির পীযুষে পরিণত হয়। শিশুর মুখ চেয়ে নারী সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করতে পারে। (বেলা শেষের গান, 'সুশ্বেতা')। সাধনার দ্বারা সকল মোহ দূর করা যায়, কিন্তু 'মাতৃত্ব-তৃষ্ণা' চিরঅবিচল। এ স্নেহ দুর্ণিবার। নারীর মাতৃ-হিয়ার মমতা কিছুতেই দূর হয় না। আর এই মমতার পথেই স্নেহ-ময়ী নারীর মোক্ষলাভ হয়। (বিদায় আরতি, 'মল্লিকুমারী')। বাৎসল্যের এই ব্যাপক প্রভাব দেখে কবি সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ত অভিভূত হত। 'সাঁঝের বাতি'তে ঘরে ঘরে 'শিশুর সন্ধ্যারতি' দেখতে পেতেন তিনি। (কুহু ও কেকা, 'নূতন মানুষ')। 'নূতন

মানুষে'র নিতি নব লীলা স্নেহে ভরে তোলে ধরার মানুষের বক্ষ। কবির মনও সেই সঙ্গে ওঠে দুলে। শিশুর 'প্রথম হাসির ধ্বনি কবির কাছে বোধহয় যেন 'ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি'—যেন—'রূপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী'। শিশু তার 'অতুল সুখে'র হাসিতে মানিক ঝরিয়ে আকাশ ভরে তোলে আনন্দে। এই সব নতুন লীলার মধ্য দিয়ে 'হরষ-হাসি লোকে' যেন তার দ্বিতীয় জন্ম ঘটে। (কুহু ও কেকা, 'প্রথম হাসি')। শিশুর হাসিতে প্রবীণ ব্যক্তিরাও পরম আনন্দ লাভ করেন। পুরাতন সুখ স্মৃতির উদয় হয় মনে। শিশুর সকল খেলায় পুরানো দিনের সব খেলা মনে পড়ে যায়। (বেণু ও বীণা, 'হাসি-চেনা')। শিশুর লীলার আর অন্ত নেই। তাতে মৌলিকত্বও বড় কম নয়। দিদির উপর প্রথম অভিমানে অতি দুঃখে—সরল, কলহ-অনভিজ্ঞ শিশু গালি দেয়—'ডিডি! টুমি-টুই!' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'প্রথম গালি')। প্রথম অক্ষরপরিচয়ের সময়ের 'হস্‌স-ই' 'দীগ্‌ঘ-ই'র স্মৃতি বড়ই খারাপ। কিন্তু কেবল শিশুর পক্ষেই সম্ভব বিরাগভাজনের প্রতি ঐ নতুন কটু সম্ভাষণ প্রয়োগ করা। (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'মৌলিক গালি') সরল শিশুর পক্ষেই সম্ভব দাঁত থাকা সত্ত্বেও দংশনকারী কুকুরকে পিতা কেন প্রতিফল না দিয়ে ছেড়ে দিলেন—এই প্রশ্ন করা। শিশুর সরলতায় কবির স্নেহ-পারাবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। 'কচি ছেলের বায়না'তে 'লালপরী'র রক্তিম সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে কবির চোখে। ভালবাসায় রঙীন চোখে শিশুর সৌন্দর্যে কবি গোপন-সঞ্চারী 'লাল-পরী'র অতুল রূপের স্পর্শ দেখতে পেয়েছেন। (অভ্র-আবীর, 'লাল-পরী')

এই স্নেহপুত্তলি শিশুর অভাবে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যে শুধু 'বিফলতা' ভেসে বেড়ায়। শিশুর অভাবে গৃহ হয় বিজন, জীবনশূন্য। মনে হয়, শিশুহীন গৃহের প্রতি 'পুলক-দেবতা'ই বিমুখ। (বেণু ও বীণা, 'শিশুহীন-পুরী')। শিশুর মৃত্যুতে গৃহবাস দুঃসহ দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। তার প্রতিটি ছোট স্মৃতি প্রাণে হাহাকার জাগিয়ে তোলে। 'ছোট্ট যে জন' তারই অভাব দেয় 'সকল শূন্য করে'। শিশুর মৃত্যু বিষয়ে লেখা 'ছিন্ন-মুকুলে'র

প্রতিটি পংক্তিতে সত্যেন্দ্রনাথের সব-হারানোর কান্না বেজে উঠেছে। এই কান্না পাঠকহৃদয়কে বিমথিত করে। 'তুলির লিখনে'র 'অনার্যা' কবিতাতেও সন্তানশোকের অপরূপ প্রকাশ হয়েছে। সন্তান-হারা মাতার 'মা-বোল্' শুনবার সে কী বুভুক্ষা! পরের সন্তানের মধ্যে আপন হারানো-সন্তানকে খুঁজে বেড়িয়েছেন অনার্যা মাতা। নিজ সন্তানকে হারিয়ে 'পরের ছেলে' কোলে নিয়ে তিনি 'ঘরের পরের ভেদ' ভুলেছেন। এখন সকল সন্তানই তাঁর 'ছেলে'। তাদের মুখ থেকে শুধু 'মা-বোল্' শুনবার জন্য তিনি যে-কোন বিপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

শিশুলাভের আনন্দে মায়ের চোখের ঘুম যায় দূরে—'মানুষ-পুতুল' নিয়ে তাঁর নতুন খেলা জমে ওঠে। যে সময়ে 'ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়'—তখন মাতা 'প্রদীপ করে, পলকহারা' হয়ে চেয়ে থাকেন শিশুমুখে। (বেণু ও বীণা, 'শিশুর স্বপ্নাশ্রু')। সংসারের নানা কাজের শত ব্যস্ততায় স্নেহবুভুক্ষু শিশুকে তাড়না করলেও তখনি আবার সেই নিরপরাধ, অসহায় মানবককে বুকে টেনে নেন মাতা (বেণু ও বীণা, 'শিশুর আশ্রয়')। পুত্রের অমঙ্গল-সম্ভাবনায় শঙ্কিত জনকজননীর হৃদয় কেমন স্পন্দিত হয়, তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দৃষ্টান্ত আছে 'কয়াধু' (বিদায় আরতি), 'গিরিরাণী' (বিদায় আরতি), 'বাজশ্রবা' (তুলির লিখন), 'অরুন্ধতী' (বেলা শেষের গান), 'ভীমজননী' (বেলা শেষের গান) প্রভৃতি কবিতায়।

দারিদ্র্যের পীড়া এবং দুশ্চিন্তায় কাতর মাতা শিশুর দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়ে অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলেন তার প্রতি। দারিদ্র্য দুঃখ সন্তান-স্নেহকে আচ্ছন্ন করে দিতে চায়। মাতা সাধারণতঃ সন্তানের সুখের জন্য সর্বসুখ বিসর্জন দিতে পারেন, আপন সুখের কোন চিন্তা জাগেনা মায়ের মনে। কিন্তু 'নেই-ঘরের' মার দুঃখক্লেশ এমন করে সীমা ছাড়িয়ে যায়, যে তিনি বলতে পারেন,

'ঘুম কি চোখে নেইক তোমার? কোল গেছে মোর ভেয়ে'

(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী')

আবার নিজের কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের কষ্টও অনুভব করেন,

'কালিয়ে গেছিস্ ? পাঁজরাগুলো আমারো হিম যে রে,
ক্ষিদেয় কাঁদিস্ ? এক ফোঁটা দুধ নেই যে তোমায় দিতে'
(ঐ)

তারপর সন্তানকে মিনতি করে বলেন,

'ঘুমো মায়ের মুখ চেয়ে, ধন, ধুঁকছি ক্ষিদের শীতে !'
(ঐ)

আরও মর্মান্তিক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা শবরী-মাতার সদ্যোজাত শিশু ভক্ষণের চেষ্টা। প্রাণান্তিক ক্ষুধার জ্বালায় মাতার মাতৃত্ব বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষুধার উপশমে সেই মাতাও বোঝেন, 'মায়ের মমতা কলিজায় জ্বালে বাতি'। পুত্রকে পরের কাছে দিয়ে দেবার সময় বলেন—'লোভ করিব না, চলে' যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে।' (বেলা শেষের গান, 'সুশ্বেতা')। দারিদ্র্য ভয়াকুল মাতা 'শিশুর স্বপ্নাশ্রু' দেখে শিহরিত হয়ে ওঠেন, 'ঝিনুক বাটীর ঝন্‌ঝনা কি নিদ্রা-ঘোরে ও শোনে ?' (বেণু ও বীণা, 'শিশুর স্বপ্নাশ্রু')। 'নেই-ঘরের' মা 'ঘুমপাড়ানী' গাইতে গিয়ে দারিদ্র্যের কথা ভুলতে পারেন না। পুরানো সমৃদ্ধির কথা এবং তা থেকে বর্তমান দুর্দশার কথা বারবার তাঁর মনকে অধিকার করে। এই দুর্দশার কারণ যারা তাদের প্রতি আক্রোশ গুমরে ওঠে। মা তাঁর বাছাকে বাঁচিয়ে তুলতে, মানুষ করতে সব 'অপমান ক্লেশ' সহ্য করতে রাজী। কিন্তু ওই বাছার উপরেই নির্ভর,

'...যদি পালতে তোরে কলঙ্ক কিনি,—
পঙ্ক ছেনে মুখে এনে দিই ছানা চিনি,—
তবে বাছা ভুলিস্‌নে শোধ দিতে তা' সবায়,—
উপবাসের ঠোঁটে যারা রসের চুমো চায় ;—'
(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানী')

শেষ পর্যন্ত মা ছেলেকে ডেকে বলেছেন ঘুমপাড়ানি গাইবার 'ওক্ত' পার হয়ে গেছে। এবারে জাগতে হবে। খোকা ধার্মিক হোক,

কি 'জবরদস্ত' দারোগা হোক, কি 'মিন্‌মিনে' 'ভালোমানুষ' হোক—এ মায়ের কামনা নয়। মায়ের আশা,

'মানুষ হবি শক্ত পোক্ত সাহসে উল্লাস,'

(ঐ)

দুঃখের জ্বালায় মায়ের মুখে এই বাণী ফোটে,

'জোরের কাছে জুজু হয়ে জানাস্‌নে তুষ্টি।'

'ভালো হবি মানুষ হবি এই তো মনের সাধ,
ভালোমানুষ হস্‌নে শুধু এ মোর আশীর্বাদ।'

(ঐ)

এই শুধু কামনা সন্তান যেন ভবিষ্যতে নিপীড়িত হবার মত দুর্বল না হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবেশে বাৎসল্যরসের অবতারণা করে যে কবিতা কটি লিখেছেন, তাতে স্বর্গীয় সুখ ভোগে বাস্তবের বাধা অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বিবৃত হয়েছে। দুর্জয় সমস্যার দরুণ দরিদ্র-ঘরে 'ছোট ছোট নন্দনে'র জন্ম হতভাগ্য পিতামাতাকে 'নন্দন-বনে' বসতির অনাবিল আনন্দ দিতে পারে না।

শিশু ও কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ যেসব কবিতা লিখেছেন, তার কতকগুলি ছড়া জাতীয়, কতকগুলি প্রকৃতি বিষয়ক, কতকগুলি ইলিশমাছ, তাতারসি ইত্যাদি বালকদের লোভের বস্তু নিয়ে লেখা। এর মধ্যে অনেকগুলিতেই কবি বালকদের সঙ্গে বালক হয়ে মিশে গেছেন। রেলগাড়ীর গতির ছন্দে মিলানো 'রেলগাড়ীর গানে' যে টুক্‌রো দৃশ্যগুলি ধরে রাখা হয়েছে, তার বিস্ময় মিশানো ভাষা ছেলেমানুষদেরই মুখের ভাষা,

'একি! একি! একি দেখি! ঢেঁকি ঢেঁকি ভাই
ঘোড়া-চুলো গাছগুলো ছোটে বাঁই বাঁই

উঁকি মেরে ঝাৎ ক'রে
স'রে যায় সাঁৎ ক'রে
দেখি ঘাড় কাৎ ক'রে—নাই আর নাই'

(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)

'খেলোয়াড়ের দলে'র কথাগুলি তাদের জবানীতেই লেখা। তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারলেই এত স্বাভাবিক কথা তাদের মুখে বসানো সম্ভব,

'রোদে জলে নাই ছাতা, নাই কোন ঢাকনা,
মাঠে যাই আমি আর লেটো আর মাখনা,
কানেতে শাটল্ কক্
করে রাখা হয় ষ্টক্'

(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)

কিম্বা

'খালি খালি ছিঁড়ে যায় ধুতি জুতো কুর্ত্তি
তাই শুধু কষ্টুম্ পরেছি···কি ফুর্ত্তি !'
ক্যাচ্ অ্যাজ-ক্যাচ্-ক্যান্
কমপ্লিট্ স্পোর্টস্‌ম্যান।
রোদ-জল-রোগ-প্রুফ্ স্বাস্থ্যের মূর্ত্তি।'

(ঐ)

তাদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য এই প্রাণ-সমৃদ্ধ ভাষাতেই ধরা দিয়েছে। ক্লাবে এদের সম্মান 'ক্যাপটেন্' ডাকে। 'জজ-লাট' থেকে 'বিড়িওলা ইস্তক' চেনে তাদের। খবরের কাগজে তাদের নাম ছাপা হয়। ময়দানে তাদের 'কারদানী' দেখে দেখে লোকে এত মুগ্ধ, যে রাস্তায় হেঁটে যেতে তাদের পানে—'চেয়ে থাকে লাখো চোখ!'! 'মেডেল' তাদের 'গায়ের আঁশ'। 'কাপ' 'শীল্ড' সম্বন্ধে এই সর্দার খেলোয়াড়দের কোন দুর্বলতা নেই। তারা 'কাপে' খায় 'ঝাল্-ছোলা'—'চালভাজা শীল্ডে'। আর, তাদের নিজেদের ভাষায়,

'ইস্কুলে ছট্‌ফট্
ময়দানে ঝট্‌পট্
পথে চলি গট্‌মট্ স্পোর্টের পলটন্।'

(ঐ)

যেমন ভাব, তেমনি ভাষায় অনবদ্য এই কবিতা। এরকম খাঁটি শিশুকবিতার সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নয়। খেলোয়াড় বীররা এ কবিতায় নিজেদের মনের এমন নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করবে—সন্দেহ নেই।

'রংমশালের মশলা'র সন্ধানে সত্যেন্দ্রনাথকে বালকের মত কৌতুহলী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'ঠিক-দুপুরের আগুন হাওয়ায়' কবি তাঁর বালক বন্ধুদের সঙ্গে 'কঞ্চিহাতে' ছুটেছেন কিশোরজীবনের 'চাকভাঙা' মধুর সন্ধানে। কিশোরদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার অপর পরিচয় রয়েছে ধাঁধাঁ রচনার মধ্যে। এগুলির কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এসব কথা আলোচনা করলে বোঝা যায়—শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল কি গভীর।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ইলিশমাছ চঞ্চল হয়ে উঠে জালে ধরা পড়ে বেশী করে। তাই ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখে মৎসলোভীদের মন ওঠে 'উল্‌সে'। ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ইলিশমাছের ডিমের চেহারাটা তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই তাদের কাছে এই বৃষ্টির রূপ বড় মনোহর এবং বিচিত্র। কখনও তা 'পরীর কানের দুল'—কখনও 'ঝুরো কদমফুল',—'পরীর ঘুড়ি' কি 'ঘুম-বাগানের ফুল'। এই লোভের প্রকাশ এখানে এত সহজ আর সুন্দর—যে যে-কারো পক্ষেই এই ইলিশমাছ আর সেই ডিমের প্রলোভন-ভরা ইল্‌শেগুঁড়ির গানে মেতে ওঠা সম্ভব। এই মাতন কিশোরসুলভ আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। কবিতাটিতে ইলিশমাছ ছাড়াও আছে 'ধানের বনের চিংড়ি'র খবর। আরও আছে ছেলেভুলানো ছড়ার মত ভাবের আকস্মিক পরিবর্তনে কোথাও একটু প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন, আবার খাগের কলম দিয়ে তালপাতার উপর যারা লিখছে তাদের কথা, তাল-বড়া,

টাট্‌কাভাজা চাল, পাতার বাঁশী এসবের উল্লেখ। ছড়ার ভাবই শুধু নয়, ছড়ার সুরের ঝঙ্কারও সত্যেন্দ্রনাথের শিশুরঞ্জক কবিতাগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মাত্রাগণনায় এদের যত বৈচিত্র্যই থাকনা কেন, এগুলির প্রায় সবকটিতেই ছড়ার সুর ও ঝোঁক সুস্পষ্ট। ছড়ার চালে যেমন ধ্বনির নৃত্যময় গতি, ভাবের শিশুসুলভ চাপল্য এবং খণ্ডচিত্রের সমৃদ্ধি দেখা যায়,—সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কীর গান' (কুহু ও কেকা), 'দূরের পাল্লা' (বিদায়-আরতি) 'জৈষ্ঠী মধু' (বিদায়-আরতি), 'শিল্' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা), 'ঝড়ের ছড়া' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা) প্রভৃতিতেও উল্লিখিত কোন না কোন লক্ষণ দেখা যাবে। তরুণ মনের উপর দিয়ে কবিতাগুলি হাল্কা পাখায় ভর করে, চোখের উপর রঙীন্ স্বপ্নের ঝিলিক্ লাগিয়ে চলে যায়। 'পাল্কীর গান' ও 'দূরের পাল্লা'র চিত্র সৌন্দর্যের কথা বহু প্রসিদ্ধ। কবিতাগুলির ভাষায় অপূর্বতা এবং ভাবানুগতার বিশেষ আলোচনার অবকাশ হবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে। (রচনাশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ—ভাষাশিল্পী)।

বালকদলের আমোদ নিয়ে লেখা 'গলার তোয়াজে' কবি নাট্যভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। ছেলের দলের বারবার একই ধরণের প্রশ্নের উত্থাপন এবং গায়ক শ্রেষ্ঠের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে নিজ সাধনা ও তাতে সিদ্ধিলাভের নানা অবিশ্বাস্য কাহিনীর বর্ণনায় হাস্যরস জমে উঠেছে। এই কৌতুককর কাহিনী কিশোরদের চিত্তহারী।

সত্যেন্দ্রনাথ কতকগুলি শিশু-শিক্ষামূলক কবিতাও রচনা করেছেন। 'শীতের ফুল', 'বসন্তের ফুল', 'শরতের ফুলে'—(সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা) শিশুরা প্রকৃতির পাঠ পেয়েছে। তাদের উপযোগী ভাষা আর ছেলেমানুষী ভাব অনেকগুলি কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করেছে। শিশুর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলবার উপকরণ আছে 'তাতারসির গানে'। গৌড়েই প্রথম রসের ভিয়ান হয়েছিল,—তারই থেকে মিশর আর চীনে 'মিশ্রী' আর চিনির উদ্ভব। শেষ স্তবকে কবি বলেছেন,

'রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙ্গালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।'

রসের ভিয়ান্ হেথায় শুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,

* * *

আমরা আদিম সভ্যজাতি আমরা বাঙালী।'

(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)

এ কবিতায় তাতারসির প্রতি শিশুদের, কবির নিজের, এবং সমগ্র বাঙালী জাতির অনুরক্তিও প্রকাশিত হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের সবচাইতে ভালো দৃষ্টান্ত 'পেটুকের বর্ণ-পরিচয়'। এই কবিতার ভাষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ের 'ভাষাশিল্পী' অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। 'লাজের কাহিনী'র বালক নায়ক জনতার আদর্শ অনুসরণে রাজার নায়েবকে সম্মান দেখানোর জন্য যথা-সর্বস্ব ডালি দিতে গিয়ে যে অপমানের আঘাত পেল, তাতে তার চৈতন্য হয়েছে। সে বুঝেছে এই কাজে নিজেকে যেমন, মাতাকেও তেমনি ছোট করে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। এ শিক্ষা শিশুমনের উপযোগী।

সত্যেন্দ্রনাথ কিশোরদের বন্দনা গেয়েছেন। কারণ ওরাই আমাদের 'আশার খনি'। তারুণ্যের শক্তিতে ওরা সব অসাধ্য সাধন করতে পারে। এরা যেন 'আলাদিনের মায়া-প্রদীপ'। এদের মধ্যে যে সোনা আছে, তা 'নিখাদ'। তাই এরা 'পদ্মকোষের বজ্রমণি' এবং 'ধ্রুব সুমঙ্গল'। (সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা, 'ছেলের দল')।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার ডালিতে অনেকগুলি অতিচমৎকার বাৎসল্যরসের কবিতার অনুবাদ আছে। সে বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা গেল, আলোচনা স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত। (দ্রঃ 'অনুবাদক', তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

ছ—সত্যেন্দ্র-কাব্যে হাস্যরস

নবকুমার কবিরত্ন ওরফে সত্যেন্দ্রনাথ 'হসন্তিকা'র কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন,

'রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে'
(হসন্তিকা, 'হসন্তিকা')

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলি সম্বন্ধেও মোটামুটি ভাবে ঐ কথাই প্রযোজ্য। হাস্যরসের প্রধান প্রকারভেদই 'রঙ্গ' আর 'ব্যঙ্গ', 'আরাম' আর 'আঁচ'। সত্যেন্দ্রনাথের 'রঙ্গ' বা অনাবিল কৌতুকের কবিতায় কারও প্রতি কটাক্ষ নেই। 'আঁচ' নয় 'আরাম'ই এর প্রাণ। এই ধরণের কবিতার কতকগুলিতে দাম্পত্যজীবনের কথা অবলম্বিত হয়েছে। 'প্রিয়া', 'প্রাণেশ্বরী', 'ডিয়ার', 'পিয়ারা' ইত্যাদির চাইতে 'ওগো' ডাক যে বাঙালীর অনেক প্রিয়,—এ ডাক যে 'সব বয়সের সকল রসে ঘেরা' এবং 'স্নিগ্ধমধুর ডাকের সেরা' এই বিষয় নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 'ওগো' (কুহু ও কেকা) কবিতাটি লিখেছেন। এ ডাক 'ঈষৎ মাঠো' বলে প্রেয়সীকে মনগড়া সুন্দর নাম দিতে চাইলেও 'শেষবরাবর' 'ওগো' ডাকই আসে বাঙালীর মুখে। ইচ্ছার সঙ্গে কাজের এই অসঙ্গতির বর্ণনাতেই এর রস জমেছে। 'নাক-ডাকার-গানে' (হসন্তিকা) রয়েছে 'অবলা' নারীর মহা অসুবিধার কথা—তাঁর স্বামী,

'স্বামী নয়, ঘুমের শনি'

তার 'নাকের ডাকে' 'প্রাণকাঁপে'। এতবড় বিপদের কারণ এই যে,

'বাপ মা যখন পাত্র ছাখেন
ছাখেন-নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে!'

'জবানপঁচিশী'র (হসন্তিকা) বিষয়ও প্রেমঘটিত। বিভিন্ন ভাষায় নায়িকার প্রতি প্রেমনিবেদনের আকুলতায় এর রসসৃষ্টি হয়েছে।

'কাশ্মীরীভাষা' (হসন্তিকা) কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ সে ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার বিষম প্রভেদ অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণনা করেছেন।

'রাত্রি-বর্ণনা'র (হসন্তিকা),

'আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা !
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁক ডাক
নাক !'

ইত্যাদি পংক্তি কৌতুককর। আঁধারের রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও কবিত্ব না করে অত্যন্ত বাস্তব এবং হাস্যকর কতকগুলি চিত্রের সমাবেশ করে কবি তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম পংক্তিতে দ্বিতীয় পংক্তির ভাব সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মিয়ে দ্বিতীয় পংক্তিতে তুচ্ছ ভাবের অবতারণায় হতাশ করে দেবার শিল্প কৌশলে সার্থক হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। 'জলচর-ক্লাবে'র সভ্যদের নিয়ে কবি উপভোগ্য রঙ্গ করেছেন ('জলচর-ক্লাবের জলসা-রঙ্গ', বিদায়-আরতি। শিশুরঞ্জক কবিতা 'গলার তোয়াজে'র (সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা) কথা পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে—তার কৌতুকরসও আনন্দদায়ক। তীর্থ-স্থানের 'বিশ্রাম ঘাটে' (অভ্র-আবীর) জলের কচ্ছপ, স্থলের পাণ্ডাকুল এবং 'অন্তরীক্ষে'র 'পবন পুত্র'দের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য কবি পালন কর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন,

'বিশ্রাম-হারী গুণ্ডা মারিতে
এস হরি মথুরায়।'

এমন অদ্ভুত কাজের জন্য মথুরায় 'হরি'র পুনরাগমন কামনা তীর্থ-দর্শনের পুণ্যকামী ব্যক্তির মুখ থেকে ধ্বনিত হওয়ায় পাঠকের হাস্যোচ্ছ্বাস বাধা মানেনা। উল্লিখিত সব কটি কবিতা থেকে অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়।

ভোজন বিলাসের বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি সরস কবিতা লিখেছিলেন। * এ ধরণের কবিতা বহুদিন ধরেই আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত। ঈশ্বরগুপ্তের 'পাঁটা', 'আনারস', 'তপ্‌সে মাছ' এক্ষেত্রে

* শিশুকবিতাতে ঐজাতীয় রস-রচনার অন্যতম নিদর্শন 'পেটুকের বর্ণ-পরিচয়' (সত্যেন্দ্র-নাথের শিশুকবিতা)। এই বিষয়ের আরও শিশুকবিতা আছে।

বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তারও আগে মঙ্গলকাব্যে 'কালকেতুর ভোজন' ইত্যাদিতে এই রস সৃষ্ট হয়েছিল। এই কবিতাগুলি সাধারণতঃ কিছুটা স্থূলত্ব-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঈশ্বরগুপ্ত এই ধরণের কবিতায় উচ্চশ্রেণীর ভাব-রসের অবতারণায় বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এর রসকে উন্নীত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত এবং উচ্চশ্রেণীর গান বা কবিতার অনুকরণেও এই ধরণের কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাতে তাঁর রচনা আরও একটু সরস এবং রুচিশীল হয়েছে। মহৎভাবের কবিতার সঙ্গে হাস্যরসের কবিতার ভাবের তুচ্ছতা উপমিত হওয়ায় পাঠক হাস্যোদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। এর নিদর্শন 'শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি' এই গানের অনুকরণে 'রাম-পাখী' কবিতা (হসন্তিকা), রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার অনুকরণে 'সর্ব্বশী' (হসন্তিকা) ইত্যাদি।

মহৎভাবের কবিতার অনুকরণে হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ ভোজন-বিলাসের কবিতা ছাড়াও আছে। 'ধন-ধান্যে-পুষ্পেভরা'র সুরে 'জলচর-ক্লাবের জল্‌সা-রঙ্গ' (বিদায়-আরতি), 'উলু নয় রোদন ধ্বনি'র সুরে 'নাক-ডাকার গান', (হসন্তিকা) 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে'র সুরে 'কেরাণী-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত' (ঐ), 'মেবার পাহাড়ে'র সুরে 'গন্ধমাদন' (ঐ), 'I am a marvellous Eastern king' এর সুরে 'রাজা ভড়ং' (ঐ), 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে'র সুরে 'আদর্শ বিয়ের কবিতা—তৃতীয়-পক্ষে' (ঐ) ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ হাল্কাভাবের সঙ্গে ছন্দ-গাম্ভীর্য যোগ করেও রস সৃষ্টি করেছেন। এর উদাহরণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'অম্বল-সম্বরা কাব্য'। (হসন্তিকা) কবিতাটির ভাষাতেও মাইকেল মধুসূদনের ভাষার গাম্ভীর্য আছে। 'জয়দেবের ছন্দে' লেখা 'দশা-বেতর স্তোত্র' (হসন্তিকা) ও এই রকমের কবিতা।

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনাগুলি অল্পবিস্তর সমালোচনাত্মক এবং সেই কারণে তাতে আঁচ রয়েছে; তাতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজে এই কবিতাগুলি

সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,

'আঁচ লাগে গায়—আরাম তবু—ছেলের বুড়োর রয় ঘিরি'

কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সবগুলির 'আঁচ' আরামপ্রদ হয়নি। কতকগুলি বিদ্রূপ পাঠককে রীতিমত বিব্রত করে তুলবার মত। কলেজ স্ট্রীটের ঝাঁকামুটে' এবং 'কুক্কুটপাদ মিশ্র' (হসন্তিকা) বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পণ্ডিত অধ্যাপকের প্রতি তিনি যেসব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে জ্বালার ভাগ এত বেশী যে আরাম অনুভবের অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। অধ্যাপকের 'চেলা' 'খইরু পাঁচু' বা 'খইরু বেচু'দের প্রতি কটাক্ষে আঁচটা অপেক্ষাকৃত কম। বিদায়-আরতির 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ'তে যে বিদ্রূপ, সে আরও তীক্ষ্ণ। রীতিমত গালি গালাজ করা হয়েছে তাতে,

'চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে
এক মুখে কি বলব আমি বলদ ধুরন্ধরকে!'

বেলা শেষের গানের 'কাগজের হাতী' এবং 'নাপ্পি-পীরিতি-কথা'র উপহাস বাণও তীক্ষ্ণাগ্র। 'কাগজের হাতী'র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয়েছে 'চ্যাচাড়ি-চেরাই-দত্ত'। 'নাপ্পি-পীরিতি-কথা'য় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্মস্থানের প্রতি আক্রমণ হয়েছে,

'রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল!'

তবে 'নাপ্পি-পীরিতি কথা'র উপহাস ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় এতে আরামের উপকরণও দুষ্প্রাপ্য হয়নি। এর সম্বন্ধে বলা চলতে পারে,

'আঁচ লাগিলেও আরাম আছে'

লোকচক্ষে সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রত্যক্ষ কটাক্ষ সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাকে বড় বেশী ঝাঁঝালো করে তুলেছিল। বিদায় আরতির 'পাতিল-প্রমাদ,' 'নরম-গরম-সংবাদ' এবং বেলাশেষের গানের 'বেতালের প্রশ্ন' ইত্যাদিতেও ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ্য করা

যায়। হসন্তিকার 'রাজা ভড়ং', 'হুঁ' প্রভৃতিতে তীব্রতার ফাঁকে 'আরামে'র আয়োজনও আছে। 'আরাম' আর 'আঁচের চমৎকার সমন্বয় হয়েছে 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' (হসন্তিকা), 'সিগার সঙ্গীত' (ঐ), 'মদিরা-মঙ্গল' (ঐ), 'আদর্শ বিয়ের কবিতা', (ঐ), 'বিশ্বকর্ম্মার প্রতি B. E.' (ঐ) প্রভৃতি কবিতায়। 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' উৎকৃষ্ট হাস্যরসের কবিতা। এর রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে মাঝে মাঝে রচয়িতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝলক দেখা যায়,

'দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হতে সে পারেনি
উঠিতে পারেনি উচ্চে,
মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি
মহৎ হয়েছি তাই'

এরকম দৃষ্টান্ত অন্য কবিতাতেও আছে। যেমন,

'সিগার! ফিনিক্স-পাখী! মরিয়া অমর!
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে থরে থর।'
(হসন্তিকা, 'সিগার-সঙ্গীত')

সমসাময়িক গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর লেখায় এই রকম wit (কথার কৌতুক) এর খেলা দেখা যাচ্ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ-ক্রীড়ায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রয়োগ কৌশলে এক শব্দকেই ভেঙে চুরে তার থেকে নানা অর্থের দীপ্তি বার করতে পারতেন তিনি। বাংলা শব্দ সম্ভারের শক্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং শব্দ-ব্যবহারের অপরিসীম ক্ষমতার জন্য তিনি চমৎকার রঙ্গ ব্যঙ্গ জমিয়ে তুলতে পারতেন। উপরোক্ত কবিতা কটিতে তার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচনার বিষয় ছিল সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য এবং স্বদেশ। স্বদেশপ্রেমিক বলেই,

'দুঃখ দুর্দশার হিম-তাড়না থেকে আত্মরক্ষার জন্য কবি তাঁর দেশবাসীকে দিয়েছিলেন এই অগ্নিপাত্র—'হসন্তিকা আঙারধানী।'

(সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, 'হরপ্রসাদ মিত্র,' পৃঃ ২১১)

হাস্যরসের কবিতায় প্রকাশভঙ্গিতে স্থূলত্ব দেখা দেয় অনেক সময়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় কদাচিৎ এর নিদর্শন পাওয়া যায়,

'(তুই) পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকিস্
Tights পরে Marine Blue'

(হসন্তিকা, 'সাক্রাজেঠ-কৃত শ্যামাবিষয়,)

'জবান-পাঁচিশী' (হসন্তিকা)র 'কস্যচিৎ পঞ্চবাণ প্রপীড়িতস্য' যা বলেছেন তা সর্বদা নির্মল নয়।

'(হায়) চুমুর ক্ষুধায় মোর প্রাণ যায়···
চুমু-ভুকছানি লাগে
(আর) চুমকুড়ি দিয়ে তুমি মজা ভাখো ?
অঙ্গ জ্বলে যে রাগে।'

বিষয়ের স্থূলত্বে প্রকাশভঙ্গিতে যে স্থূলত্ব দেখা দেয় তা সবসময় দূষণীয় নয়।

'হসন্তিকা' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পত্র-পত্রিকায় 'নবকুমার কবিরত্ন' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ কালে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখেননি। রসিকতা করে তিনি গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় লিখেছিলেন,

'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রজ্বালিত
ও
শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা
ফুৎকৃত'

ভূমিকা করে ভূমিকা লেখানোর বিপক্ষ মত প্রকাশ করে কবি ইতিতে লিখেছিলেন,

'সদৈবানুমত

কিন্তু

ভূমিকা-লিখন-বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী

অথচ সুহৃদ্

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।'

এই 'অদ্ভুত ভূমিকা বা ফুৎকারে'র প্রারম্ভেও বলেছেন,

'অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন হৃদয়!
ওহে শ্রীনবকুমার কবিরত্ন মহাশয়!
সমপ্রাণ সখা! মোর দোস্ত হম্‌দম্!
* * *
একক্রিয় মিত্র! ....ইত্যাদি।'*

সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু প্রভাব পড়েছিল। 'কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি' (হসন্তিকা) কবিতার ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতি-লক্ষণ' (কল্পনা) কবিতার ছায়া সুপ্রকট। 'উন্নতি লক্ষণের' প্রারম্ভে আছে,

'ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎ ব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ?'
ইত্যাদি

'কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি'ও আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে,

'কেন বাজে ঢোল?—কেন এই জাঁক?
কেন সোরগোল? কেন ওড়ে কাক?
ভন্‌ভন্ করে মাছি ঝাঁকে ঝাঁক—
কিসের লভিয়া গন্ধ?'
ইত্যাদি

* অত্যাগ-সহনো বন্ধু সদৈবানুমত সুহৃদ
এক ক্রিয়াং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখামতঃ॥

সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্রূপ যেমন চাঁছাছোলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথে তেমন নয়। মধুসূদনের 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' (বীরাঙ্গনা কাব্য) কবিতার প্রথম দিকেও আলোচ্য কবিতাটির আরম্ভের মত কতকগুলি পংক্তি আছে। 'ছুঁচো-বাজীর দর্শকে'র (হসন্তিকা),

'নইলে মোরা কেবল করব তারিফ
(মিলে) হাকিম হুকিম-কোটাল-কাজী!
ফোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি
বলব সবাই "বাঃ বা! বা! জী!'

ইত্যাদি পংক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ইরাণ দেশের কাজী' (হাসির গান) কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়,

"আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
* * *
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল;—
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা, বাজি!"

'গন্ধমাদন' (হসন্তিকা) কবিতার,

'লক্ষণ যবে হয়েছিল কাবু
তীক্ষ্ণ সায়কে ইন্দ্রজির,—
অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রজিতের
মিলেরও তো রাখা চাই খাতির।'

অংশ দ্বিজেন্দ্রলালের ধরণটি স্মরণ করায়। 'তবে কিনা,' 'অর্থাৎ,' 'অর্থাৎ কিনা' এইসব শব্দ ও ব্যাকাংশ তাঁর কাব্যে সুলভ। এক পংক্তিতে কিছু লিখে পরবর্তী পংক্তিতে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় খুব পাওয়া যায়। 'আদর্শ বিয়ের কবিতা'তেও দ্বিজেন্দ্রলালের ধরণ এসেছে,

'(হুঁ হুঁ) বিয়ে করা—মানে হল—ওর নাম গিয়ে—
(এই) বিয়ে করা মানে কিনা—বিয়ে—কিনা—ইয়ে॥'
(হসন্তিকা) 'আদর্শ বিয়ের কবিতা'

সত্যেন্দ্রনাথের 'দশাবেতর স্তোত্র' দ্বিজেন্দ্রলালের 'দশ-অবতার' কবিতা

স্মরণ করায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মত সত্যেন্দ্রনাথও টিকি নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের,

'তবে, টিকি রাখি' কর সবে জীবন সফল'

(হাসির গান, 'দশ-অবতার')

ভাবটি সত্যেন্দ্রনাথের 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গলে' চমৎকার ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। * দ্বিজেন্দ্র-পরবর্তীকবি সত্যেন্দ্রনাথ হাস্যরসাত্মক রচনায় এই পূর্ববর্তী প্রতিভাশালী কবিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি।

যে রস-রচনার হাস্য ফেনরাশির নীচে অতল অশ্রু-জলধির অস্তিত্ব আছে সাহিত্য হিসেবে সেই রচনার মূল্য অপর্যাপ্ত। কিন্তু এই রস-সৃষ্টির শিল্পকৌশল দুরধিগম্য। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক করবার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর কবিতায় শুভ্র হাস্য-ফেন-রাশির অন্তরে অমনি অশ্রু সমুদ্রের আভাস ফুটে ওঠেনি। এইজন্য তাঁর হাস্যরসাত্মক কবিতাবলীকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান দেওয়া চলে না।

* হরপ্রসাদ মিত্রও বলেছেন—

তাঁর [দ্বিজেন্দ্রলালের] হাসির গানের প্রসঙ্গ, রুচি ও রীতি, তিন বিশেষত্বেরই আনুগত্য দেখা যায় নবকুমারের লেখায়।

('সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ', পৃঃ ২১৪

জ—সত্যেন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতি-তর্পণ করেছিলেন, তাতে প্রকৃতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের ভালবাসা এবং প্রতিদানে সত্যেন্দ্র-নাথের ললাটে প্রকৃতির দেওয়া 'বরণের টীকা'র কথা অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিল। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হবে, কিন্তু ভাব-সৌন্দর্য যথাযথ ভাবে অনুভব করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেই কথাগুলি শোনা যাক,

'বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়,
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি 'পরে?
আশ্বিনে উৎসব সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতিবর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্য কক্ষে তোমারে না দেখি'
উদ্দেশ্যে ঝরায়ে যাবে শিশির সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

('সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৭৪)

কবিগুরু, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকে অনেকখানি বড় করে দেখেছিলেন। বাস্তবিক, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিকে কবি বড় ভালবাসতেন। প্রকৃতির রূপে তিনি মুগ্ধ হতেন, ছয় ঋতুর উৎসব তাঁর প্রাণে প্রবল সাড়া জাগাত। তাই এই 'সুন্দরী ধরণী'কে তিনি 'দিনে দিনে নিত্যনব সঙ্গীতের হারে' সাজিয়ে তুলতেন।

প্রকৃতির ছবি আঁকতেন তাঁর কাব্যপটে। বিশ্বের জলে, স্থলে, আকাশে যে সুর ভেসে বেড়ায়, যে নৃত্য নানা ছন্দ-ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায়, তা অনুভব করতেন, ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। প্রকৃতির রূপে নানা ভাবের প্রকাশ ধরা পড়ত তাঁর চোখে। তাই বিচিত্রভাবে তিনি প্রকৃতিকে রূপ দিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিত্রাঙ্কনে। প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সাধারণতঃ তিনি কোন গভীর তত্ত্বকে রূপ দিতেন না। তাই বাহ্য-সৌন্দর্যই তাঁর এইসব কবিতার প্রধান অংশ। এই সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে কাব্যে ধরে দিতে হলে যে পরিমাণ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা চাই, সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় তা প্রচুর ছিল।

'পেরজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়।'

(কুহু ও কেকা, 'পাল্কীর গান')

বা,

'পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।'

(বিদায় আরতি, 'দূরের পাল্লা')

ইত্যাদি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ দেখা গেছে। খণ্ড খণ্ড চিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক একটি পরিবেশ যে কত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায় তার নিদর্শন কবিতাগুলিতে পাওয়া যাবে। 'পাল্কীর গান' ও 'দূরের পাল্লা'র খণ্ডচিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিখুঁত ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার কবিনায়ক বিশ্বরাগিণীর কথা বলেছেন,

'মাগো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী
অমৃত উৎসধারা।…
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া,
বিশ্বতন্ত্রী হতে।'…

(সোনার তরী)

রবীন্দ্রসাহিত্যে একথা বহুবার নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথও এই রাগিণী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনিও বলেছিলেন,

'কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল্ বীণা,

তারি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা।
পরাণ আমার শুনেছে সে মধুবাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে'

(বেণু ও বীণা, 'বেণু ও বীণা')

'বিশ্বলীনা' এ রাগিণী তাঁর ছন্দে মাঝে মাঝে বাঁধা পড়েছে। প্রকৃতির লীলা বর্ণনায় তার অন্তঃস্থিত অনতিস্ফুট এই সুরকে কবি ছন্দের দোলায় কোন কোন কবিতায় স্পষ্ট করে তুলেছেন। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির প্রসঙ্গে যে ছন্দের ব্যবহার, তাতে নিসর্গবর্ণনা বৃষ্টির ছন্দ-দোলা পেয়ে স্বাভাবিক ও সজীব হয়ে উঠেছে। 'ঝর্ণার গানে' ঝর্ণার গান যথার্থ ভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

'মেঘের মায়া' বুলানো 'গহন ছায়া' ভরা বর্ষার দিন মানব-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে যে সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে প্রাণে—সেই সুর ধরেছেন সত্যেন্দ্রনাথ 'বর্ষা নিমন্ত্রণে'।

'এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে,
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া-নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন কুলাবে;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।'

('অভ্র আবীর')

'কুহু ও কেকা'র 'অকারণ' কবিতা থেকেও মানবমনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়,

'শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে নাহি কেহ চলে,
পড়ে নাকো দাঁড় খেয়া তরণীর
তিমির মগন জলে,—
নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া

সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধতৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে ;
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রুছলে।'

সত্যেন্দ্র-কাব্যের বহুস্থানেই দেখা যায়, কবি প্রকৃতির মধ্যেও মানবমনের ভাব দেখতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে জীবন-নিরপেক্ষ অচেতন বস্তু বলে মনে করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যে নিগূঢ় সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানবের যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক তেমন করে এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেননি। সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কখনও আপনার মুগ্ধ অন্তরের অকারণ পুলকে বলেছেন্,

'পার্‌বনা একলাটি আজ ঘরে পার্‌বনা রইতে !
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে !
নিরালার কোল-ভরা ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।'
(বেলা শেষের গান, 'কয়েকটি গান')

কখনও বা প্রকৃতির মধ্যে জীব জগতের ভাব দেখে বলেছেন,

'ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম—পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়'
(বিদায়-আরতি, 'ঝর্ণার গান')

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা-বিলাসের উপাদান যুগিয়েছে। তাঁর 'ফুলের ফসল' গ্রন্থের 'লূতার সূতায়' বাঁধা দোলনার ঝুলন-লীলায় প্রকৃতির স্থান অনেকখানি। তাঁর সেই 'গোপন রাজ্যে'র 'স্বপ্ন শাসন' জমেছিল 'ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে'। সেখানে আরও ছিল 'জ্যোৎস্না', 'ফুলের তুরী ফুলের ভেরী', 'জোনাক পোকা', 'মঞ্জরী', 'ফুলের পরাগ', 'কুঁড়ির সোহাগ', 'চাঁদ', আর 'শিরীষ ফুলে'র কোমল বিছানার আয়োজন। 'ফুলের ফসলের প্রায় অর্দ্ধেক কবিতাই ফুল ও ঋতু নিয়ে। 'অভ্র আবীর' গ্রন্থের 'চকোরের গান' কবিতায় চকোর বলেছে,

'সুধার ক্ষুধা কাহার প্রাণে—আয় গো!
চাঁদের আলো বায় যে ব'য়ে যায় গো!
শ্যামল মেঘের পদ্মপাতে
আয় গো ভেসে গভীর রাতে
মেঘের পিঠে কিরণ-ছটায় আয়!
আয়গো ভেসে আয়গো মধু বায় গো!'

ইত্যাদি।

'জাফ্রাণের ফুল' দেখে কবির মনে হয়েছে,

'একি চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা!
একি মূর্চ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা!'

(অভ্র আবীর, 'জাফরাণের ফুল')

এরকম দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রকাব্যে অগুন্তি। 'এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি' বুলানো আর 'তরুণ-করা সবুজসুরে' 'ঘুরে ফিরে' সুর বাঁধা যার কাজ, সত্যেন্দ্রনাথ তেমন একটি সবুজ পরীর কল্পনা করেছিলেন। এই পরী প্রকৃতি রাণীর রূপেরই নব-পরিকল্পনা।

'ঝড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ!
সাবধানী! তুই আজকে কারে করিস্‌রে সাবধান?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন—অনুরাগে,

বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হবে গান।'

(কুহু ও কেকা, 'ঝোড়ো হাওয়ায়')

প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্যের ভীষণতায় মেতে ওঠা এই সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথও 'বর্ষশেষে'র প্রচণ্ড ঝড়ে উৎসাহদীপ্ত হয়ে প্রকৃতির এই ভীষণতার জয়গান গেয়েছিলেন। এই দুই কবির কাব্যেই প্রকৃতির ভীষণ লীলার বন্দনা আছে। 'পূর্ণিমা রাত্রে' 'জীবনে মৃত্যুতে' পরিণয়ের ভীষণ সাজ দেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ সমুদ্রের রূপসজ্জাতে। এ রূপ তাঁর চোখে 'অপূর্ব্ব' এবং 'চিত্তহারী'। এই ভয়ানকরূপী, 'মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ' তাঁর কাছে। প্রকৃতির এই ভীষণ রূপের বন্দনা সত্যেন্দ্রকাব্যে একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিগাথায় গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই গভীরতার প্রকাশ মাঝে মাঝে,

'ঋতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাবায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!'

(অভ্র আবীর, 'সিন্ধু তাণ্ডব')

এই ধরণের পংক্তি রবীন্দ্রনাথের,

'উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে।'

(সোনার তরী, 'সমুদ্রের প্রতি')

ইত্যাদি পংক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু এই কবিতাগুলির ভাবসৌন্দর্য চিরনবীন।

ঝ—বিবিধ

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সত্যেন্দ্রকাব্যের কয়েকটা প্রধান বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যে সত্যেন্দ্রকাব্য এত অধিক সমৃদ্ধ যে অনেকগুলি বিষয় পূর্বের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে ধরা যায়নি। এই স্থানে অবশিষ্ট বিষয়ের প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করে এই আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হবে।

প্রেরণাদাত্রী—

পূর্বে একস্থানে বলা হয়েছে 'বিশ্বের জলে, স্থলে, আকাশে যে সুর ভেসে বেড়ায়' সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে তা ধরা পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে—গ্রহ হতে গ্রহান্তরে সর্বত্র ওই সুরের মূর্চ্ছনা শুনতে পেতেন। এ বিশ্বের যত কাজ সব যেন ওই রাগিণীর ছন্দে বাঁধা। আর এই সুর, এই ছন্দের জন্য বিশ্বের সব কিছুর মধ্য দিয়ে এমন সৌষম্যের উৎসারণ। সত্যেন্দ্রনাথ সমস্ত অনুভূতিকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর করে বিশ্বের সকল কর্মের মধ্য থেকে সেই মূল সুরটি শুনবার চেষ্টা করতেন। কবি তাঁর এই 'মানসী দেবী' 'রাগিণী রাণী' (বেণু ও বীণা) মূর্ত্তিটা স্পষ্ট করে তুলবার জন্যই 'বেণু'তে ফুৎকার দিয়েছিলেন, 'বীণা'য় তুলেছিলেন ঝঙ্কার। জীবনের শেষ অবধি তিনি এই সুর-সরস্বতীর একাগ্র সাধনাতে ব্যাপৃত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রেরণাদাত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা কল্পনার তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথও 'বিশ্ব বীণা'র ঝঙ্কার শুনেছিলেন, তিনিও তাঁর কাব্যবীণায় সেই তান সাধনা করেছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মত তিনি শুধুই সুর ও তার ছন্দের পিছনে এমন কস্তুরী-মৃগের মত ছুটে বেড়াননি। তিনি বিশ্বের সুর-সৌষম্যের মূলে বিবর্তন-বাদের তত্ত্ব খুঁজে পেয়ে দর্শনের গভীরে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাতেই তাঁর জীবনদেবতা কল্পনার ব্যাখ্যা। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু অনুভূতির কবি, দার্শনিক কবি তিনি নন। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথের

প্রেরণাদাত্রী ওই 'রাগিণী রাণী' রূপিণী 'মানসী দেবী'র কল্পনার পিছনে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নেই। সত্যেন্দ্রনাথ প্রেরণাদাত্রীর স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন অনুভূতির মধ্য দিয়ে, চিন্তার মাধ্যমে নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই বিষয়ক কবিতার ভাষা কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতার ভাষার সঙ্গে অনেকখানি মিলে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের,

'বাতাসে চড়িয়া আর কতদূর
ছুটিব তোমার পাছে
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও, হায়গো কাহার কাছে?'
(বেণু ও বীণা, 'আন-গগনের আলো')

রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (সোনার তরী) কবিতা, বিশেষতঃ তার

'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!
বলো কোন্‌পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী'।

এই পংক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

'সজনি, শঙ্খ বাজা,—
আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা'
(বেণু ও বীণা, 'আন-গগনের আলো')

মনে করিয়ে দেয়,

'বাজা শঙ্খ বাজা,—
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা'
(খেয়া, 'আগমন')

কিন্তু, এই ভাষার মিল থেকে উভয়ের কল্পনার কোন গভীর সাদৃশ্য সন্ধান করতে গেলে বৃথা শ্রম করা হবে।

কাহিনী কাব্য—

সত্যেন্দ্রনাথ তুলি ধরে নানা চিত্র আঁকতেন। জীবনকাহিনীও হত তাঁর সে সব চিত্রের অবলম্বন। জীবনের চিত্র রচনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীই আশ্রয় করেছেন। আধুনিক জীবনের ঘটনা তাঁর কাহিনী কাব্যের বিষয় ছিল না। এই কবিতাগুলিতে

তাঁর ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য, মানব-প্রেম, সমাজ-সচেতনতা, নীতিবোধ এবং স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষকে ভালবেসে তিনি মানুষের সকল অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে জেনেছিলেন। এই জন্যে তিনি 'শোভিকা', 'বিষকন্যা', 'অনার্য্যা' প্রভৃতির স্নেহ-ভালবাসার যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছেন, একথা আগেও বলেছি ('সত্যেন্দ্রকাব্যে প্রেম' দ্রষ্টব্য)। কোন কোন কাহিনীতে নায়কনায়িকার কথার মধ্য দিয়ে কবির পরাধীনতার বেদনা স্ফূর্তি পেয়েছে, সে কথাও তাঁর স্বদেশ-প্রেমের আলোচনায় লেখা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্যগুলিকে বিষয় অনুযায়ী মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি কবিতা নীতিশিক্ষামূলক। সুরার জন্ম কাহিনী বর্ণনা করে কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার অপকারিতা বর্ণনা করেছেন কবি,

'ভালো সামগ্রী পচিয়ে সড়িয়ে
সৃষ্টি হয়েছে যার
সকল ভালো সে পচিয়ে সড়িয়ে
সব দেবে ছারেখার।
নগরের বার করে ফেলে, ঢেলে,
দাওগে উষর মাঠে,
ঘরে ও থাকিলে বিড়ালের কান
সাহসে ইঁদুর কাটে।'

(বেলা শেষের গান, 'সুরার কাহিনী')

যে সব ন্যায়নিষ্ঠ শাসক আপন কর্ত্তব্য পালনে চিরঅবিচলিত থেকে প্রণম্য হয়ে রয়েছেন তাঁদের গুণকীর্ত্তনেও নীতির জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। 'সর্ব্বদমন' (বিদায়-আরতি), 'মহানামন্', (বিদায়-আরতি), 'ইন্‌সাফ্' (বিদায়-আরতি) এই জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত। 'কয়াধু', 'ভীম জননী' 'অরুন্ধতী' 'স্কন্দধাত্রীগণ'ও ন্যায়ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখতেন। এজন্য তাঁরা কঠিনতম দুঃখও বরণ করেছেন। ন্যায়ের জয়-প্রতীক্ষা তাঁদের সকল দুঃখকাঁটাকে সার্থক করে কেমন ভাবে ফুল ফুটিয়ে তুলেছে তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

'পরিব্রাজকে'র পাপবোধের তীব্রতা তার নীতিবোধেরই কঠিন অনুশাসনের ফল।

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কাহিনী-কবিতায় বাৎসল্যরস পরিস্ফুরিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির সৌন্দর্য বহুস্বীকৃত। 'অনার্য্যা'র সন্তান-প্রীতি এবং মাতৃসম্বোধন শুনবার বুভুক্ষার এমন প্রকাশ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। পুরাণ-ইতিহাসের আরও কয়েকজন পাত্র পাত্রীর অপত্য স্নেহ সত্যেন্দ্রনাথের 'সুশ্বেতা' (বেলা শেষের গান), 'বাজশ্রবা' (তুলির লিখন), 'কয়াধু' (বিদায়-আরতি), 'স্কন্দধাত্রী' (বিদায়-আরতি), 'ভীম-জননী' (বেলা শেষের গান), 'অরুন্ধতী' (বেলা শেষের গান), কবিতাগুলিতে ফুটেছে। একথা কবির বাৎসল্য রসের কবিতার আলোচনাতেও বলেছি। 'মল্লিকুমারী'র বাৎসল্য শুধু মানবশিশুর জন্য নয়, সর্ব প্রাণীর জন্য।

কাব্যে প্রেমের কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা' (কুহু ও কেকা), 'শোভিকা' (তুলির লিখন), 'যশমন্তু' (তুলির লিখন), 'শবাসীন' (তুলির লিখন), 'বিষকন্যা' (তুলির লিখন) প্রভৃতিতে। প্রথমটি ছাড়া বাকী সব কটিই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। 'চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা' সে যুগের প্রবাসী'তে (১৩১৯ আশ্বিন) সমালোচক 'মুদ্রা-রাক্ষসে'র প্রশংসা পেয়েছিল। প্রমথ বিশীর 'বাংলার লেখককে'ও এই কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। 'শবাসীন' কবিতাটির কারুণ্য অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। 'তুলির লিখনে'র প্রেমবিষয়ক কাহিনী-কাব্যগুলির মধ্যে এই কবিতাটিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন মুদ্রারাক্ষস ('পুস্তক পরিচয়', 'প্রবাসী' ১৩২১ আশ্বিন)। যেমন কাব্য-সৌন্দর্যে তেমনি গল্পরসের গাঢ়তায় এই কবিতাগুলি চিত্তহারী।

কুসংস্কারের পরিণাম-বিপর্যয়ের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে 'দুর্ভাগা' কবিতায়। সমাজের কুসংস্কার কতখানি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তার নিদর্শন 'মন্নিরা' কবিতাতেও আছে। 'বেণু ও বীণা'র 'সহমরণে' যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারও মূলে আছে সমাজের কুসংস্কার।

কোনও কোনও কবিতা উপরোক্ত বিভাগ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইতিহাসের দাহিরকন্যাদ্বয়ের কাহিনী নিয়ে এইরকম একটি কবিতা ('রাজ-বন্দিনী', তুলির লিখন) রচিত হয়েছে। এই বন্দিনীরা যা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলনা। কিন্তু কবির সহানুভূতিতে তাদের কূট-কৌশল-পূর্ণ আচরণের নিষ্ঠুরতা অনেকখানি আবৃত হয়ে পড়েছে। এই সহানুভূতির গুণেই সত্যেন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যগুলি অপূর্বতা লাভ করেছে. এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। এই গুণেই তিনি প্রবঞ্চিতা 'দেবদাসী'কে পাপিষ্ঠা বলে ভুল করেননি। বয়স্ক 'বিদ্যার্থী'র দুঃখ-লাঞ্ছনা তিনি অনুভব করেছেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। দুঃখিনী 'বিনতা'র জন্য কবির দুঃখানুভূতি 'সূর্য্য-সারথি' কবিতাটিতে আগাগোড়া ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই করুণ রসে পরিপূর্ণ। বুদ্ধ মন্ত্রের পূজারি সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন করুণার অবতার। তাঁর অন্যান্য কবিতার মত এই কবিতাগুলিতেও অনেক স্থলে বৌদ্ধ-ধর্মের আদর্শ বর্ণনা দেখা যাবে। বৌদ্ধ যুগের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'মহানামন্' (বিদায়-আরতি), 'সুশ্বেতা' (বেলা শেষের গান), 'মল্লিকুমারী' (বিদায়-আরতি), 'পরিব্রাজক' (তুলির লিখন) ইত্যাদি তার উদাহরণ।

সত্যেন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে কাহিনীর 'আভাস মাত্র' আছে, কাহিনীর সকল ধর্ম সেগুলিতে নেই। 'বিদ্যার্থী', 'সূর্য্য-সারথি', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'সতী', 'মাতা-মনু' ইত্যাদির কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। এগুলির মধ্যে পৌরাণিক বা কোন প্রকার কাহিনীসূত্র আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক জমাট কোন কাহিনী নেই। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী'তে 'পুস্তক পরিচয়' প্রসঙ্গে 'তুলির লিখন' গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে মুদ্রারাক্ষস বলেছিলেন,

'...কবিতাগুলি গাথা জাতীয়। ...এক একটি গল্পের আভাসমাত্র অবলম্বন করিয়া বিচিত্র রসমধুর ছন্দে জটিল মানবহৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবলীলা চমৎকার 'লিরিক' বা গীতিকবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

কবি বহু অবস্থার বহুলোকের বহু বিচিত্র হৃদয়ভাবের একাত্ম-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে আমি গাথার লিরিক বা গল্পের গীতিকবিতা বলিতে চাই।'

(পৃ ৭৮১)

পুরোপুরি 'গাথাজাতীয়' কবিতা বলা যায় না অথচ কাহিনীর দিকে রস পাওয়া যাবে—এমনি কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম দিক্‌কার রচনায় বেশ কতকগুলি আছে। 'বেণু ও বীণা'র 'কুলাচার', 'দেবীর সিন্দুর', 'নাভাজীর স্বপ্ন', 'কুস্থানাদপি', 'বন্যায়', 'অন্ধশিশু', 'ভোজ ও পুত্তলিকা' ইত্যাদি অজস্র কবিতা এই শ্রেণীর। সত্যেন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে ভাব-সৌন্দর্য্যে বিশেষ সমৃদ্ধ কতকগুলি পংক্তি পাঠককে চমৎকৃত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—

'শ্যামা লতিকার ক্ষীণ তনু একি উপচিত পল্লবে?'

('শবাসীন')

'কাঠ-মল্লিকা-ফুলের পাতায়
কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।'

(শোভিকা) *

নীতি কবিতা—

'সুরার কাহিনী' (বেলা শেষের গান) কাহিনী-কাব্যের মত সত্যেন্দ্র-কাব্যে আরও কতকগুলি নীতিমূলক কবিতা পাওয়া যায়। এগুলিকে আর কোন পর্য্যায়ের কবিতা বলা যাবে না। 'সুরার কাহিনী'তে একটা কাহিনীর পিছন থেকে একটি নীতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাতে কাহিনীকাব্যের রস রয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা বা কিছু নীতি শিক্ষা দেওয়াই এই শ্রেণীর কবিতার মূল উদ্দেশ্য, কাব্য-রস সৃষ্টি এগুলির লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ 'কুহু ও কেকা'র,

'মেঘ দেখে কেউ করিস্‌নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে।

* চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ' অংশে এই দুই কবির তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।'

('অভয়')

Carlyle এর 'Every darkest cloud has its silver line' এর ভাবটিই প্রসারিত হয়েছে এতে। 'মমতা ও ক্ষমতা' (বেণু ও বীণা) কবিতার তত্ত্ব,

'মমতা—ক্ষমতা বিনা, উন্মাদ প্রলাপ।'

তত্ত্বকথা আছে 'আকাশ-প্রদীপে' ও (বেণু ও বীণা)। শেষে উল্লিখিত দুটি কবিতাই আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। এগুলি দেখে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কথা মনে পড়ে। 'হসন্তিকা'য় এই আয়তনের কতকগুলি কবিতা 'রেজ্‌কী' নামে সংকলিত হয়েছে। এগুলিতে অসঙ্গতি নির্দেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করা হয়েছে।

সাময়িক কবিতা—

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকেই 'সাময়িক কবি' হিসেবে তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। এ প্রসঙ্গের আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়ীভূত। যাহোক 'সাময়িক কবি' হিসেবে তাঁর নাম সুপরিজ্ঞাত। যে কোনও ঘটনা এই সমাজ-সচেতন কবিকে এত চঞ্চল করত যে তিনি সে সম্বন্ধে কবিতা লিখতে বাধ্য হতেন। সেকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কোনটিকেই এই তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল কবি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। এইজন্য তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর কালের সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুরই মোটা-মুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। সাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা রচনায় আর কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এই রচনাগুলি তাঁকে দেশের প্রাণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। যে কোন আন্দোলন বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দেশবাসী তাঁর কবিতার উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় থাকত। তাঁর স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতাবলীর অনেকগুলিই তৎকালীন ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ-বাসীর জন্য 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা' (বিদায়-আরতি)-র গান লিখেছেন

তিনি। 'হসন্তিকা'র প্রায় কবিতাই সে সময়ের ঘটনা নিয়ে লেখা। চারিত্র-পূজার অল্প কয়েকটি কবিতা ছাড়া প্রায় সবগুলির উৎস সেকালের কোন-না-কোন ঘটনা। সেকালের ঘটনাই অনেক স্থলে সমাজ বিষয়ক লেখাগুলিরও উপজীব্য হ'য়েছে। ('দোয়োখা একাদশী', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' ইত্যাদি)। 'কলিকাতা নগরে শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ স্থাপন উপলক্ষে' রচিত হয় 'বুদ্ধবরণ' (বেলা শেষের গান)। এছাড়া আরও আছে তাঁর 'সাল্-তামামী' (বেলা শেষের গান), 'সাল্‌পহেলী' (বেলাশেষের গান), 'বর্ষ-বোধন' (বিদায়-আরতি), 'আখেরী' (বেলা শেষের গান) ইত্যাদি কবিতা। এগুলিতে যুদ্ধ, ইংরেজদের প্রতারণা, সাম্রাজ্য-লিপ্সা, দেশবাসীর দুর্দশা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। 'সাল্-তামামী'তে সমস্ত বছরের ঘটনাবলীর জমা-খরচের খতিয়ান করতে গিয়ে কবি ঐসব প্রসঙ্গ নিয়ে দুঃখ করেছেন। 'আখেরী'তে 'বছর-শেষের শেষদিনে' কবি সব হিসাব চুকিয়ে দিয়ে 'মজ্জাগত গোলাম-সমঝ' শেষ করে দেবার ডাক দিয়েছেন। আর 'সাল্-পহেলী' এবং 'বর্ষ-বোধনে' এইসব দুঃখ অতিক্রম করবার শক্তি প্রার্থনা করেছেন 'সত্যস্থর্য্য'-রূপী 'ভুবন-স্বামী'র কাছে। এগুলির রস-গ্রহণ করতে হলে সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা দরকার। কবিতাগুলি হয়তো সর্বত্র বাস্তবজীবনের কোলাহলকে ছাড়িয়ে রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে এগুলির লক্ষ্য শুধু রস সৃষ্টি নয়, দেশ-সেবার প্রেরণা রয়েছে এর পিছনে। যে সব বড়-বড় ঘটনা জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলির সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলাই এগুলির উদ্দেশ্য। এর প্রয়োজনীয়তা অল্প নয়। এ কাজ চারণ-কবির। এইজন্য চারণ-কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের নাম জাতীয় জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

মৃত্যু—

কুহু ও কেকা এবং অভ্র-আবীরের দুটি একটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে তাঁর এই ধারণার কোন প্রভেদ নেই। মৃত্যুর মধ্যে অবিমিশ্র ভীষণতা ইনিও দেখেননি। তাঁর ভাষায়,

'মরণ করে অমৃত দান'

(কুহু ও কেকা, 'ঝোড়ো হাওয়ায়')

ঝড়ের রুদ্রতালে তিনি মৃত্যুর রূপ দেখে বলেছেন,

'মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন অনুরাগে।'

(ঐ)

'কাজেই যে মৃত্যু এমন মোহন,
বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হ'বে গান।'

(ঐ)

—এই ছিল তাঁর মত। কনক-ধুতুরার পাত্রে 'মৃত্যু ও মাদকতা', 'মৃত্যু-অভেদ জীবন-নৃত্য' দেখেছেন কবি। এ তত্ত্ব কবির কাছে অপরূপ ঠেকেছে। সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু সৌন্দর্যে ভরপুর। তাই শুষ্ক সূর্য-মল্লিকার অম্লান সৌন্দর্য তাঁর কাছে 'মৃত্যু-পারের কথা'র আভাস দিয়ে গেছে (অভ্র-আবীর, 'সূর্য্যমল্লিকা')।

বাউল—

সত্যেন্দ্রনাথের বাউল সুরের কবিতাগুলির ভাষা ঐসব কবিতার সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। অতিপর্বের ব্যবহারে বাউল কবিতার ধাঁচ এসেছে। 'দরদী' (কুহু ও কেকা) কবিতাটির ভাবেও খাঁটি বাউল-ভাব পাওয়া যায়। 'বনমানুষের হাড়' (অভ্র-আবীর) কবিতা বাউল কবিতার ঢঙে লেখা হলেও তার ভাব অন্য। 'হঠাতের হুল্লোড়ে'র (বিদায়-আরতি) 'পাথার জল' 'ঘেরাটোপ' ইত্যাদি কথা বাউল কবিতার পরিবেশ সৃষ্টির খুব সহায়তা করেছে। 'প্রবাসী'র ১৩১৯ এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাখী-বিসর্জ্জন' কবিতাটিও এই পর্যায়ের।

বৈষ্ণব—

সত্যেন্দ্র-কাব্যে কোথাও কোথাও বৈষ্ণব-ভাবের আভাস আছে। এসম্বন্ধে 'সত্যেন্দ্র-কাব্যে প্রেম' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পল্লী—

পল্লীর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এইজন্যই পল্লীর চিত্র অঙ্কনে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। 'পাল্কীর গান' (কুহু ও কেকা), 'দূরের পাল্লা' (বিদায়-আরতি) ইত্যাদি কবিতাতে একথা স্পষ্ট। পল্লীজীবনের প্রাণময়তা তাঁকে মুগ্ধ করত। ঐ জীবনের সহজ আনন্দের কথা তাঁর কাব্যে আছে। 'তাতারসির গান' এর অন্যতম উদাহরণ। পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রকাশ তাঁর কাব্যের নানা স্থলে ছড়িয়ে রয়েছে। ভাষায় গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত শব্দ, বাক্যাংশ ইত্যাদির ব্যবহারেও তার প্রমাণ আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতাকে স্পষ্ট কোন বিভাগের মধ্যেই ফেলা যায় না। অথচ এসব কবিতার অনেকগুলিতেই উল্লেখযোগ্য কাব্য-সৌন্দর্য রয়েছে। কবিতাগুলির নাম—'সিদ্ধিদাতা' (কুহু ও কেকা), 'শিল্পীর-গান' (অভ্র-আবীর), 'সুধা ও ক্ষুধা' (অভ্র-আবীর) 'রাজা-কারিগর' (বেলা-শেষের গান), 'কাঠ-গড়া' (বেলা শেষের গান) 'খাঁচার পাখী' (বেলা-শেষের গান), 'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্‌' ('বিচিত্রা' ১৩৩৭ শ্রাবণ, পৃ ১৪৯), 'বিশ্বরূপ' ('বিচিত্রা' ১৩৩৭ পৌষ, পৃ ৩), 'গুঞ্জামালা' ('বিচিত্রা' ১৩৩৭ ভাদ্র, পৃ ২৮৫) ইত্যাদি।

'বিশ্বরূপ' সনেটে এই বিশ্বের বিরাটত্বের মধ্যে মানুষ কত ক্ষুদ্র—সেই কথা বলা হয়েছে,

'রেণু হ'য়ে অণু হ'য়ে কোথা মিশে যাই,
নিজেরে খুঁজিয়া নিজে দেখিতে না পাই।'

'গুঞ্জামালা' কবিতাটি বিশেষ ভাবে আলোচিত হবার যোগ্য। এতে কবি আপন কাব্যের মূলকথা ও মূল্যসম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। * হসন্তিকার 'রেজ্‌কী' কবিতাগুলি এবং ১৩৫১ র 'জয়ন্তী মৌচাকে' প্রকাশিত 'ধাঁধা'গুলির কথাও এখানে উল্লিখিত হতে পারে। ধাঁধা রচনার মধ্যে কবির শিশুসুলভ ক্রীড়াশীলতার

* চতুর্থ অধ্যায়ে 'সত্যেন্দ্র-কাব্যের মূল্য বিচার' প্রসঙ্গে এ কবিতার আরও আলোচনা করা হয়েছে।

পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দ বিতরণের জন্য শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি এখানে।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় সবগুলি কাব্যগ্রন্থে একটি করে প্রবেশক কবিতা থাকত। কখনও কখনও গ্রন্থের শেষেও একটি কবিতা থাকত। নানা প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই রকম কোন কোন কবিতার কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের পারম্পর্য নেই বলে যে অভিযোগ আছে, এই কবিতাগুলি তার প্রতিবাদস্বরূপ। ফুলের ফসল ও হসন্তিকার কথা বাদ দিলেও কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিদায়-আরতি ছাড়া সব গ্রন্থেই বিশেষ একটি ভাবের প্রাধান্য রয়েছে এবং প্রবেশক কবিতায় সেই ভাবের সূত্রটি কবি ধরিয়ে দিয়েছেন। বিদায়-আরতির সজ্জায় কবির আপন হাতের স্পর্শ ছিল না বলেই কবিতাগুলি অগোছালো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ গ্রন্থটিতে কোন প্রবেশক কবিতা নেই। †

† বেলা শেষের গান গ্রন্থটিও সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থটি কবির জননী 'মহামায়া দেবী'র নামে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় মনে হয় এ গ্রন্থের কবিতাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালেই সংকলিত হয়েছিল, তিনি নিজে উৎসর্গ পত্রও রচনা করে গিয়েছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। বিদায়-আরতি বা সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতার মত এতে অনুবাদ কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়নি। ঐ গ্রন্থটিতে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে কোনটি মৌলিক এবং কোনটি অনুবাদ তাও নির্দিষ্ট করা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

রচনাশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ

ক—সনেট রচয়িতা

বাংলা সনেটের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। সত্যেন্দ্র পূর্ব্ববর্তী সনেট রচয়িতাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী এঁরাই প্রধান। সনেট রচয়িতা হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের নামও উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র পংক্তিগুলি চার, চার, ছয়ের (৪ + ৪ + ৬) ভাগে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি কবিতাই আট-ছয় মাত্রার পয়ারে লেখা। মধুসূদন ইটালিয়ান্ সনেটের আদর্শে সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হলেও তার সকল নিয়ম বন্ধন যথাযথ-ভাবে অনুসরণ করেননি। তাঁর সনেটের অন্ত্যানুপ্রাসে বৈচিত্র্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সনেটে বিচিত্র পদ্ধতিতে পদবিন্যাস করে নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর কোন কোন সনেটে পদবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, পর পর দুটি পদগুচ্ছের প্রথমটির শেষ পদ না আসতেই বা সম্পূর্ণ না হতে'ই ভাবের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে, এবং দ্বিতীয় পদগুচ্ছের প্রথম চরণে পূর্ববর্তী চরণের বাকী পদ বা মাত্রাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। চরণের শেষের মিলেরও বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল তাঁর সনেটে। মাত্রা সংখ্যাও শুধু আট-ছয় (৮ + ৬) নয়, আট-আট (৮ + ৮), আট-দশ (৮ + ১০), দশ-দশ (১০ + ১০) ইত্যাদি নানারকম ছিল। প্রমথ চৌধুরী এগার মাত্রার পয়ারেও সনেট লিখেছেন। তাঁর পদবিন্যাস কখনও আট-ছয় (৮ + ৬) বা চার, চার, দুই, চার (৪ + ৪ + ২ + ৪) ভাগে আবার, চার, চার, চার, দুই (৪ + ৪ + ৪ + ২), তিন-এগারো (৩ + ১১), চোদ্দ (১৪), চার-দশ (৪ + ১০) ভাগেও আছে। এঁর সনেটেও পংক্তিশেষের মিলের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পয়ার ছন্দের সনেটগুলিতে আট-ছয় এবং আট-দশ মাত্রার পংক্তিই ব্যবহার করেছেন। তাঁর পদবিন্যাসে চার-চার-ছয় (৪ + ৪ + ৬), চৌদ্দ (১৪), ছয়-ছয়-দুই (৬ + ৬ + ২), আট-চার-দুই (৮ + ৪ + ২), চার-চার-চার-দুই (৪ + ৪ + ৪ + ২), চার-চার-দুই-চার (৪ + ৪ + ২ + ৪) এবং দুই-চার-চার-চার (২ + ৪ + ৪ + ৪) রীতি অবলম্বিত হয়েছে।

প্রথম রীতিটি মধুসূদনের সব সনেটে দেখা যাবে। তার পরের চারটি রীতি রবীন্দ্রনাথে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ রীতি দুটি প্রমথ চৌধুরীর বহু ব্যবহৃত। দ্বিতীয় রীতিটিও প্রমথ চৌধুরীর সনেটে আছে। চার-চার-চার-দুই (৪+৪+৪+২) রীতিটিই সত্যেন্দ্রনাথে বেশী দেখা যায়। 'বেণু ও বীণা'র 'মমির হস্ত' কবিতার দ্বিতীয় সনেটটির পদবিন্যাস হয়েছে দুই-চার-চার-চার (২+৪+৪+৪) রীতিতে। বাংলা সনেটে এই বিন্যাস চোখে পড়ে না। অন্ত্যানুপ্রাস সনেটের বিশেষ অঙ্গ। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সনেটগুলিতে উনিশ-কুড়ি রকমের মিল ব্যবহার করেছিলেন। তার মধ্যে পাঁচটি রীতি তাঁর পূর্ববর্তীদের সনেটে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাকী চোদ্দ-পনরটি মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে তো নয়ই, রবীন্দ্রনাথ-দেবেন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর সনেটেও বড় একটা দেখা যায় না। এখানে এই বিশিষ্ট অন্ত্যানুপ্রাসগুলির একটি তালিকা সঙ্কলন করা হচ্ছে।

(ক) ১২২১, ৩৪৩৪, ৫৬৫৫, ৭৭.
(খ) ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪, ৫৫.
(গ) ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪, ৫৫.
(ঘ) ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪, ২২.
(ঙ) ১২, ২১১৩, ৩১৪৪, ৪৪৫৫.
(চ) ১২১২, ৩৪৩৪, ৫৬৫৬, ৩৩.
(ছ) ১২২১, ৩৪৪৩, ৫৬৫৬, ৭৭.
(জ) ১২১২, ৩৪৩৪, ৫৬৫৬, ৭৭.
(ঝ) ১২২১, ১২২১, ৩৪৩৪, ১১.
(ঞ) ১১২২৩৩, ১১৪৪৫৫, ৬৬.
(ট) ১১২২, ৩৩৪৪, ৫৫৬৬, ৫৫.
(ঠ) ১১২২, ২২৩৩, ৪৪৫৫, ৬৬.
(ড) ১১২২৩৩৩৩২২৪৪৫৫.
(ঢ) ১২১২৩৪৩৪, ৫৪৫৪, ৬৬.

সত্যেন্দ্রনাথ সনেটের আঙ্গিকে অচিন্তিতপূর্ব নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করেন দলমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করে। ইতিপূর্বে সুধী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে সনেটের গাঢ়বদ্ধতা এবং গাম্ভীর্য্য পয়ার ছন্দ ছাড়া আর কোন ছন্দে অটুট থাকতে পারে না। এমন কি পয়ার ছন্দেরও একমাত্র আট-ছয় বিভাগে মাত্রাবিন্যাস রীতি ছাড়া সার্থক সনেট সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বিশ্বাসটি রবীন্দ্রনাথ ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অপর ভ্রমটির মূলেও প্রবল নাড়া দিলেন। বাংলা ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৩৫১ পৃষ্ঠায় তাঁর

'ইচ্ছামুক্তি' সনেটটির প্রকাশ প্রাজ্ঞজনের মনে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কবিতাটির উপলক্ষ্য ছিল 'ম্যাক্‌সুইনি'র মৃত্যু। এই দুঃখজনক ঘটনার গাম্ভীর্য কবিতাটিতে সার্থক অভিব্যক্তি পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে পয়ার ছন্দের পরিবর্তে দলমাত্রিক ছন্দে লেখা সনেট এই প্রথম। এবং এই প্রথম প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই কাজে যে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার অনুসরণ করতেও খুব কম কবিই সাহসী হয়েছেন। 'বনফুলে'র দলমাত্রিক ছন্দে লেখা 'পরশুরামের উক্তি' ('অঙ্গারপর্ণী') সনেটটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'কবির তিরোধান' (বেলা শেষের গান) নামে সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা দেখা যায়, তারও বিষয়টি গম্ভীর ('স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের দেহান্তে' রচিত) কিন্তু ছন্দ দলমাত্রিক। এ কবিতাটিও সনেটসুলভ ভাব-গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। কিন্তু কবিতাটি সনেটধর্মী হলেও একে ঠিক সনেট বলা চলে না। সনেটের পদ সংখ্যা চোদ্দ হওয়া অবিচল বিধি হিসেবে গণ্য। কিন্তু এই কবিতাটির পদসংখ্যা ষোল। 'সনেট' বলতে ভাব ও আঙ্গিক উভয়ের নিয়ম বন্ধনে রচিত বিশেষ এক ধরণের কবিতা বোঝায় বলে এই কবিতাকে আমরা 'সনেট' না বলে 'সনেটধর্মী কবিতা' বলে অভিহিত করছি। সত্যেন্দ্র-কাব্যে এই ধরণের আরও কয়েকটি কবিতা আছে। 'বেণু ও বীণার' 'ডাক-টিকিট' কবিতাটি এই জাতীয়। কবিতাটির শেষের যুগ্মপদ এটিকে সনেট-ধর্মী করে তুলেছে। এটির পদসংখ্যা ছাব্বিশ। 'অভ্র-আবীর' গ্রন্থের 'দিগ্বিজয়ী' কবিতাটিও সনেট-লক্ষণযুক্ত। এতে কবি বিজয়ী রঘু ও শঙ্করের কথা বর্ণনা করে কবির দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তাঁদের জয়ের তুলনা করে দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট করে তুলেছেন। ভাবের সুসংহতিতে কবিতাটি অতি চমৎকার হয়েছে। এ কবিতার পদ সংখ্যা কুড়ি। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'ও চতুর্দশের অধিক পদের সনেট-ধর্মী কবিতা আছে। 'সমুদ্র' ('কড়ি ও কোমল') কবিতার পদ-সংখ্যা বাইশ। এর প্রথম ষোল পংক্তিতে বিষয়ের অবতারণা এবং বাকী ছয় পংক্তিতে সে বিষয়ে কবির মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে।

অথচ কবিতার দৈর্ঘ্য সনেটের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সনেটের পরিবর্তে 'দশপদী' কবিতা রচনা করেছিলেন। এতে তিনি দলমাত্রিক ছন্দও ব্যবহার করেছেন। ('কবি'—'ত্রিবেণী')। 'ত্রিবেণী' গ্রন্থের ভূমিকায় এই কবি বলেছেন,

'আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দ্দশপদী না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান Sonnet এর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দ্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী।'

(দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী)

ক্ষুদ্রত্ব যে সনেটের একমাত্র লক্ষণ নয়, একথা সুপরিজ্ঞাত। সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রয়াসকে বিদ্রূপ করেই ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে (পৃঃ ৭০০) 'কেন ?' নামে একটি 'দশপদী কবিতা' লিখেছিলেন। তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কবি'র

'কেন গাহে কবি ? কেন সূর্য্য ওঠে ? বর্ষে বারি মেঘে'

('ত্রিবেণী')

ইত্যাদির অনুকরণে

'কেন নাচে ভালুক ? কেন লাফায় ব্যাং ?
আর্সুলারা ওড়ে ?'

ইত্যাদির শেষে ছিল,

'প্রাণের গভীর পাগ্‌লামি সে ; কিম্বা
একটা মৌলিকতার বেগে
এসব কর্ম্ম করে ; এবং তাহা ছাড়া
দশপদী (ও) লেখে ?'

অবশ্য, বলা আবশ্যক, এরূপ বিদ্রূপ ঠিক রুচি-সম্মত হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে নানারূপ মতের অবকাশ আছে !

বাংলা ভাষায় জাপানী সনেট বা তান্‌কা রচনা সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। প্রথমে তিনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে এই সনেটের সঙ্গে

পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মৌলিক 'তান্‌কা' রচনা করেন ('তান্‌কা সপ্তক', অভ্র-আবীর)। 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে তান্‌কার অনুবাদ করতে গিয়ে সে সম্বন্ধে তিনি যে পরিচিতি দিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধার করে সেই বিস্মৃত কথাগুলি আবার জেনে নেওয়া যাক। 'ভারতী' ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৩৭। তান্‌কা অনুবাদ চয়নের প্রথমে,

"'তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।'

১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবির 'মিকাডোর নূতন খাতা' প্রবন্ধে তান্‌কার আঙ্গিক সম্বন্ধে প্রায় এক ধরণের কথাই রয়েছে,

'এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম নাই ; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; জাপানী ভাষায় এগুলিকে "তান্‌কা" বলে। তান্‌কার পাঁচ পংক্তিতে সাধারণতঃ একত্রিশটি মাত্রা থাকে।'

(পৃ ৬০)

মালয় উপদ্বীপের সনেট জাতীয় কবিতা 'পান্তমে'র সঙ্গেও আমাদের প্রথম পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মাধ্যমে। পান্তম্‌ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন,

'ইতালির যেমন সনেট, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পান্তম্‌। পান্তম্‌ অর্থে গান বা গীতিকবিতা। পান্তমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণ পরবর্তী শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক এবং সাধারণতঃ চারি শ্লোকে একটি পান্তম্‌ সম্পূর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের, সঙ্গমস্থলে গঙ্গাযমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্তর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পান্তমের

অনুবাদ করেন। হুগো মৌলিক পান্তম্ রচনা না করিলেও তৎ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পান্তমের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দব সুন্দর মৌলিক পান্তম্ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দো-বিদ্যা ও কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।'

('প্রবাসী' ১৩১৬ পৌষ, পৃ-৭৪২)

এ দেশের অন্য কোন কবি বাংলায় পান্তম্ রচনা বা অনুবাদ করে 'স্বদেশের ছন্দো-বিদ্যা ও কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ' করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বিভিন্ন দেশীয় সনেট বাংলায় অনুবাদ বা প্রবর্ত্তিত করে সাহিত্যসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করে গেছেন।

তিনি ফরাসী সনেটেরও অনুবাদ করেছিলেন। মাতৃভাষার সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর এই দান বিশেষ মূল্যবান্।

খ—অনুবাদক

[কবিতা পাঠের সময়, কবির কল্পিত জগতের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ ঘটে। কিন্তু আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে সেটি অনুভব করি। ফলে, কবির কল্পনা আমাদের মনোজগতে নবরূপ লাভ করে। কল্পনার এই নবরূপকে যথাযথ ও শিল্পসঙ্গত ভাবে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে, মূল ভাবের সঙ্গে পরবর্তী রূপকারের মৌলিকত্ব মিশ্রিত হয়। অনুবাদ হয় প্রাণবন্ত। একাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুবাদে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে অনুবাদকের শুধু শিল্পবোধ থাকলেই হবে না, সৃষ্টি ক্ষমতাও থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ 'তীর্থরেণু' গ্রন্থের কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন,

'এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য।'

('তীর্থরেণু' পাঠান্তে কবির কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র)

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে একথা বারবার স্মরণ হয়। কবিতাগুলি কেবল ভাষান্তরিত হয়নি, কবির প্রগাঢ় উপলব্ধির অনুরঞ্জনে নূতন প্রাণ পেয়েছে। এইজন্য তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে বলা হয়,

'লেখক মহাশয় এগুলিকে 'অনুবাদ' বলিয়া ছাপিয়া না দিলে কেহই তর্জমা বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

(পুস্তক সমালোচনা—'তীর্থরেণু', প্রবাসী ১৩১৭ আশ্বিন, পৃ-৬১৯)

এই সমালোচক, কবির অনুবাদ-দক্ষতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন তাঁর কবিকল্পনার সহজ দ্রুতগতি, স্বভাবতঃ বিচিত্র ভাব এবং বিভিন্ন অবস্থায় কল্পনা সঞ্চালন ক্ষমতার মধ্যে। বাস্তবিক, সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা এত বিচিত্র বিষয়ে এত সহজে পক্ষবিস্তার করেছে যে তা দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, সাহিত্য তত্ত্ব, দেশ প্রীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হাস্যরস, প্রেম, নারী বন্দনা, বাৎসল্যরস, নীতিকথা, সামাজিক বৈষম্য, চারিত্র পূজা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের

কবিতার অনুবাদ করেছেন তিনি। এবং কি ভাব, কি ভাষায় সে সব কবিতায় এতটুকুও বিজাতীয় গন্ধ পাওয়া যায় না। গ্রীসদেশীয় কবি 'থিয়োক্রিটাসে'র কবিতার অনুবাদে (মণি মঞ্জুষা, 'গাঁয়ের পালা') কবি 'গোষ্ঠলীলা', কৃষ্ণ, সুবল, বলাই, বড়াই বুড়ি, ললিতা, শিব, 'রাসের নাচ' প্রসঙ্গ গ্রথিত করে সেটিকে আমাদের দেশের খাঁটি জিনিষ করে তুলেছেন। এরকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। ভাষা ব্যবহারেও বাংলার প্রাণস্পন্দন ধরা পড়েছে। 'তরু দত্তে'র কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'আঁখি ইতি উতি ছুটে'—'শিশির টোপায়ে পড়ে' (মণি-মঞ্জুষা, 'যোগাদ্যা')। বেলজিয়মের কবি 'গেরার্দ্দি'র কবিতার অনুবাদে লিখেছেন—'আচোট ও ঠোঁট দেখতে নারি মোটে' (মণি-মঞ্জুষা, 'দুঃখে সুখ')। এই সব ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার তাঁর অনুবাদকে স্বাভাবিক করে তুলেছে।

'খোকা আমার, খোকা আমার, 'তুল্-তুল্সী'র পাতা !'

(তীর্থ সলিল, 'মাউরি জাতির ঘুম পাড়ানি')

বা,

'আহা, আহা 'আ-ঈ' !
আহা মরে যাই,
কচি আঙুল ঘুরুণি,
বাছা, পরাণ জুড়ুনি,
কে বেড়াবে হামা দিয়ে,
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেল্‌বে ধুলো নিয়ে
ছাঁচত লাটির ছাওয়ায় !'

(তীর্থরেণু, 'ঘুম-ভাঙা')

কিংবা,

(আমি) 'করব না কো কাঁদু
হব সোনার যাদু
দেখবো খালি ডালিম গাছে কেমন নাচে প্রভু।

(মণি-মঞ্জুষা, 'ঘুম পাড়ানোর গল্প')

এইগুলিতে আমাদের দেশের ছড়ার ভাব, ভাষা এমন স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কবিতাগুলিকে অনুবাদ বলে মনে করতে দ্বিধা হয়।

'ডালিম গাছে পরভু নাচে
টাক ডুমাডুম বাদ্যি বাজে!'

এই ছড়ার সঙ্গে শেষোদ্ধৃত কবিতাংশের শেষ পংক্তিটির মিল সুস্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকুশলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁর অনুবাদের পাশাপাশি Burns এর মূল কবিতা তুলে দিচ্ছি,

'ওরে কচি! ওরে জড়সড়! নতমুখ!
কত আতঙ্কে দুরু দুরু তোর বুক,
অত দ্রুত আর হবে না পলা'তে
তুরিত চলি
মারিতে ধরিতে আমি যাব নারে
লাঙল তুলি।'
সত্যই ব্যথা পেয়েছি পরাণে, ভাই,
স্বভাবের ভাব—মানুষ তা' রাখে নাই;
অকারণ নয় তোর এই ভয়,—
আমারে ত্রাস!
ধরাচর তবু তোরি সহচর,
মরণ-দাস।'

(তীর্থ সলিল, 'একটি মুষিকের প্রতি')

'Wee, sleeket, cowrin, tim'rous beastie,
Oh, what a panic's in thy breastie!
Thou needna start awa sae hasty,
Wi' bickerin bratle!
I wad be laith to rin an' chase thee,
Wi' murderin' pattle!
I'm truly sorry man's dominion
Has broken nature's social union,

And justifies that ill opinion
Which makes thee stratle 10
At me, thy poor earth-born companion,
An' fellow-mortal !'

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক সময় তিনি মূল কবিতার ছন্দ বজায় রেখেই সেগুলিকে ভাবান্তরিত করতেন। যেমন,

'ইহ হি । ভবতি । দণ্ডকা- । রণ্যদে- ।
শে স্থিতিঃ ।
পুণ্যভা- । জাংমুনী- । নাংমনো- । হারিণী ।
গগনে গগনে । নীল্ নিবিড় ।
ভিড়্ মেঘের । ভিড় গো ভিড় ।
শোন্ তাদের । শব্দ ভীম ।
ডম্বরুর । দুন্দুভির ॥'

('ছন্দ-সরস্বতী' ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ-৩)

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার ডালিতে অন্য ভাষার কিছু সনেটের অনুবাদও আছে।

কবির কয়েকটী নাট্যকাব্যানুবাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। একটি তাঁর 'রঙ্গমল্লী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এটির নাম 'আয়ুষ্মতী'। এই বিষাদান্ত নাট্যখানি ওজস্বী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়ায় ভাবমহিমা বিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে। 'রঙ্গমল্লী' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কোন সমালোচক (সমালোচনার শেষে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়নি) 'আয়ুষ্মতী'র অনুবাদসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলেছিলেন,

'যেমন আসল নাটকখানি ভাবে রসে কবিত্বে সুন্দর, অনুবাদও তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। সরল স্বচ্ছ কবিত্বময় ভাষায়, অনাহত গম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একেবারে দেশী ছাঁদে অনুবাদটি আশ্চর্য্য রকম পরিপাটি হইয়াছে। কোথাও একটু জটিলতা, আড়ষ্টভাব, বা বিদেশী গন্ধ নাই।'

(পৃ-২৫০)

কবির অপর নাট্যকাব্যের অনুবাদ 'বন্দীদেবতা' ১৩২০র আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল (পৃ-৭৬০)। অনুবাদকের মৌলিকতার সংযোগে কাব্যটি অত্যন্ত সজীব হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার এক প্রবন্ধে এর উচ্চ প্রশংসা দেখা যায়,

'গ্রীক কবিতার ইংরেজী অনুবাদে শুনি Prometheus বলিতেছে,

"Alas me ! alas me !
Ye offspring of Tethys who bort at her breast,
Many children, and eke of Oceanus,—he,
Coiling still around earth with perpetual unrest !
Behold me and see
How transfixed with the fang
Of a fetter I hang
On the high-jutting rocks of this fissure and keep
An uncoveted watch o'er the world and the deep".

সত্যেন্দ্রনাথ ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়াছেন আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে,

"হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! কি আর বলিব বল্ !
চির-যৌবনা ! চির-কুমারীর দল !
অথির লহর নিতি যার আসে ধেয়ে,—
তোরা অপ্সরা সেই সাগরের মেয়ে ;
এই দিকে আয়,—দেখে যা আমার দশা,
শিকল বেড়ীতে সকল শরীর কশা।
বন্দী হইয়া পাহাড়ে পাহারা আছি—
এ-পদ কখনো লয় নাই কেহ যাচি।"

রূপ ও রীতিতে এই রূপান্তরিত কবিতাটি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। মূল কবিতাটি বাংলা অনুবাদের মধ্যে যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছে। ......ইহাকে অনুবাদ না বলিয়া মৌলিক সৃষ্টি আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়।'

('কবি সত্যেন্দ্রনাথ', সৈয়দ আলী আহ্‌সান, পরিচয় ১৩৪৮ পৌষ, পৃ-৫১২)

১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'র ৬৮২ পৃষ্ঠায় 'রাজা ও রাখাল' নামে সত্যেন্দ্রনাথের এক নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। এটি খৃষ্ট-জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্ব্বে' লেখা 'রাজা সলোমনের "Song of Songs" অবলম্বনে রচিত। এখানেও অনুবাদ অতি স্বচ্ছন্দ। 'ভারতী' ১৩২২, আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ-৫৪৫) 'শক্র' নামে একটি নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়। মাত্র একটি পত্র (গদ্যে লিখিত) ছাড়া কাব্যটি আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সাবলীল রচনাভঙ্গির গুণে নাটকটি মূলের মতই রোমাঞ্চকর হয়েছে।

এবারে সত্যেন্দ্রনাথের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। লক্ষ্য করা যায় সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষার কবিতার অনুবাদ করেছেন। কোন ভাষা জানা না থাকলে সে ভাষার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বন করেও পাঠকদের অন্য ভাষার কবিতার রস উপভোগ করবার সুযোগ করে দিতেন তিনি। বহু প্রাচীন, অপরিচিত বা দুষ্প্রাপ্য কবিতা অনুবাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন,

'তিনি যে সকল বিদেশী কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন, সেগুলির নির্বাচনে সাহিত্যিক রসবোধ অপেক্ষা সাহিত্যিক কৌতূহলই জয়ী হইয়াছে। যে সকল কবিতা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ সেগুলিকে তেমন আদর না করিয়া, অপরিচিত দেশের, অখ্যাত ভাষার, অখ্যাত কবির কবিতার প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন; অথবা, সুকবিতার সংখ্যা অপেক্ষা কবিদের নামের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছেন—যাহাতে তাঁহার অধ্যয়নের পরিধি কত বিস্তৃত তাহাই প্রমাণিত হয়।'

('সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ পৃ-২০০)

'সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ' কবিদের রসবোধকে তৃপ্ত করে। কিন্তু 'চিরন্তন সম্পদ' ছাড়া অন্য শ্রেণীর সাহিত্যও তাঁদের তৃপ্তি দিয়ে, মনে অনুবাদের প্রেরণা জাগাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের অনুবাদ কবিতাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সাহিত্য হিসেবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য কবিতাই শুধু নয়, নানা ধরণের এবং

নানা শ্রেণীর কবিতাই তাঁরা অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য-কৌতূহলী ছিলেন সে কথা সত্য। কিন্তু এই অনুবাদকের সাহিত্যিক কৌতূহল তাঁর রসগ্রাহিতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, এ অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল নানা সাহিত্যতীর্থের মণি, রেণু এবং বিন্দু বিন্দু সলিল সংগ্রহ করে মাতৃভাষার সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। এইজন্য তিনি বিভিন্ন ভাষার অজস্র কবিতা চয়ন করেছিলেন। সকল ভাষার সাহিত্য সমান উন্নত নয়। তাই নানা সাহিত্যের নমুনার সংগ্রহে সব কবিতা হয়তো উচ্চ শ্রেণীর হয়নি। 'তীর্থরেণু' গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন,

'বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদি
অভ্র-আবীর রাশি,
অঞ্জলি দিই নিখিল কবির
আকুল অশ্রু হাসি ;
আমার অশ্রু আমার পুলক
তারি সাথে যায় মিশে,
খুঁজিনা, বাছিনা, বুঝিনা কেবল
চেয়ে থাকি অনিমেষে।'

এই স্বীকৃতির পর আর কোন কথা তোলা উচিত মনে হয় না।

গ—ভাষাশিল্পী

শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্দ্রকাব্যের দোষগুণ বিচার করে সর্বশেষে মন্তব্য করেছিলেন,

'বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ভাষার বাকৃপদ্ধতির নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা, ও তাহার সমৃদ্ধি-সাধন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিতে বাংলা ভাষার যেন একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; এ ভাষার যত স্তর আছে, অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভাষার ভাণ্ডারে যত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যে সকল শব্দ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং 'rare word-jewels of ancient authors'—তিনি এই সকলকেই কেমন অর্থ-গৌরব ও ধ্বনি-সৌষ্ঠব সহকারে তাঁর রচনা রাশিতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন সব নূতন শব্দও সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি যেন বাংলা বুলির এক রত্নাকর। ভাষার রীতি বা idiomকেও তিনি যে ভাবে উদ্ধার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জাতির একটি মহা উপকার হইয়াছে······বাংলা ভাষার জাতি, কুলও কৌলীন্যের পরিচয়টি অতঃপর আর সহজে লুপ্ত হইতে পারিবে না।'

(আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', পৃ-২২৯)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে ভাষাশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ কীর্তির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। বাংলা ভাষার উপর সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ দখল ছিল, এ ভাষার প্রকৃতিকে তিনি যথার্থ চিনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বাংলা ভাষার শব্দসমৃদ্ধি সাধনে এমন কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যের 'খুঙ্গি পুঁথি' (ক্রমে খুঙ্গি পুঁথি লয়ে পাঠশালে যায়', তীর্থ-সলিল, 'দশাচক্র'), 'ইতি উতি' ('উৎসুকতার আঁখি ইতি উতি ছুটে', মণি-মঞ্জুষা, 'যোগাদ্যা',) 'বুলে' ('মেঘরূপে আকাশে সে বুলে' মণি-মঞ্জুষা, 'বাণীর পুরোহিত') 'রড়ে' (লজ্জায় সে পলায় রড়ে', বেণু ও বীণা, 'ঝড় ও চারাগাছ'), 'সেঁউতি'

('যদি সেঁউতি পরে চরণ পড়ে, হয় সে সোনা অনায়াসে', ফুলের ফসল, 'কিশোরী') 'গাঁথনি' ('প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি', হোমশিখা, 'সোম'), 'দিঠি' ('প্রিয়ার দিঠিতে ভোলা মন আজ', কুহু ও কেকা, 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ'), 'ঠাকুরালি' ('আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি', কুহু ও কেকা, 'আমরা') প্রভৃতি শব্দ তাঁর সাহিত্যে কেমন নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বহুদিন থেকে এই শব্দগুলি আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় প্রবেশাধিকার হারিয়েছিল।' অথচ খাঁটি বাংলা শব্দ হিসেবে এইগুলিই বাংলা ভাষার প্রাণ-সম্পদ। ভাষায় এমন অনেক শব্দ এবং বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়, যেগুলির ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা অতুলনীয়। কিন্তু নেহাৎ দেশজ শব্দ এবং দেশীয় বুলি বলে তাচ্ছিল্য করে এগুলিকে সাহিত্যে ব্যবহার করা হচ্ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে নব-চেতনা দেখা দেয়, তাতে দেশীয় শব্দ প্রভৃতির স্থলে সংস্কৃত শব্দাদির ব্যবহারের প্রতি অধিক ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই অবহেলিত শব্দ এবং বাক্যাংশের ব্যবহারে তাঁর সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে তুললেন।' ফলে সাহিত্যের ভাষায় এই সব শব্দ ইত্যাদি ব্যবহারের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়ে গেল। শুধু মৌলিক কবিতায় নয়, অনুবাদ করতে গিয়েও তিনি এই শব্দগুলির ভাবপ্রকাশক্ষমতা উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীও এগুলির মূল্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করেছে। সত্যেন্দ্রকাব্যের খাঁটি বাংলা শব্দ এবং বুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখলে এগুলির শক্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ হবে।

'গাছপালা হতে শিশির **টোপায়ে** পড়ে'
('যোগাত্মা', মণি-মঞ্জুষা)

'ব্যথার জোয়ার **ছড়িয়ে** তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ'
('কাঠগড়া', বেলা শেষের গান)

'**কালিয়ে** গেছিস ? পাঁজরাগুলো আমারো হিম যেরে'
('নেই ঘরের ঘুম পাড়ানী', সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)

'**নাদুস্ নুদুস্** হাত আমি একখানি'
('বিকাশ-ভিখারী', তীর্থ রেণু)

'আনৎ মেলে আপদ বালাই কর্ব্ব আমি ক্ষয়'
('ঘুম পাড়ানী গান', তীর্থ রেণু)

'কে বেড়াবে হাম্মা দিয়ে
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেল্‌বে ধূলো নিয়ে
ছাঁচতলাটির ছাওয়ায় !'
('ঘুম ভাঙা', তীর্থ রেণু)

'দুধটি খেয়ে কল্‌কলাবি'
(ঐ)

'দর্‌কচা মারা জোয়ান চেহারা'
(বেলা শেষের গান, 'রাজাকারিগর')

টপ্ টপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় শিশির বিন্দুর ঝরে পড়াকে এক কথায় বলা গেছে 'শিশির টোপায়ে পড়ে'। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতেই এই শব্দগুলির ইঙ্গিতময়তা লক্ষ্য করা যাবে।

এবারে বাক্যাংশের পরিচয়,

'কচি কাঁচা নেইক কোলে, শিখেছে সব খুঁটে খেতে
(তুলির লিখন, 'সতী')

'নাড়ি ছেঁড়া বয়সে, তবু ভুলতে নারি তায়'
(তুলির লিখন, 'অনার্য্যা')

'গায়ের রোঁয়া যায় না ভাখা, সন্ধ্যা হ'ল রাত্রি আসে'
(বেলা শেষের গান, 'ভীম-জননী')

'প্রাণ করে খালি আথালি-পাথালি'
('অরুন্ধতী', বেলা শেষের গান)

'ঠাকুর ! ঠাকুর !···চ্যাচায় প্যাঁচা !···বুকের ভিতর
মুচ্‌ড়ে ওঠে,
গায় কাঁটা ভায়···ভীমকে আজি পাঠিয়েছি
রাক্ষসের কোটে।

বালাই !···বালাই !···কি ছাই ভাবি···ডেকেছে
কর্ত্তব্য তাকে ।

(বেলা শেষের গান, 'ভীম-জননী')

'মাথা গুঁজে যাদের ভিটায় নির্ব্বাসনের ক্লেশ ভুলেছি'

(ঐ)

'কন্যা দিয়ে দেবতা জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবস যামী ।'

('গিরিরাণী', বিদায়-আরতি)

'সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে,
ছেলে হ'ল পর চেয়েদূর—এ দুখ কারে কই ?'

(ঐ)

'সতী' (তুলির লিখন), 'ভীম-জননী' (বেলা শেষের গান), 'গিরিরাণী' (বিদায়-আরতি) প্রভৃতি কবিতার ছত্রে ছত্রে বাংলা বুলি গাঁথা রয়েছে। এই সব জায়গায় সংস্কৃতশব্দবহুল 'সাধু'ভাষা প্রয়োগ করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাতে ভাব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা। আমাদের ঘরোয়া শব্দগুলির প্রতিশব্দ সে ভাষায় পাওয়া কঠিন ত বটেই, পাওয়া গেলেও ভাষার শক্তি তাতে অনেক কমে যায়। আমাদের নিত্যব্যবহারের ভাষারভাবপ্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশী, সংস্কৃত বা পোষাকী ভাষায় ঘরোয়া ভাষার শক্তি পাওয়া যাবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে একটি অভিযোগ আছে যে তিনি, 'অত্যন্ত অসুন্দর কথা অসঙ্কোচে কবিতায় ব্যবহার করতেন'

('অনামী', 'পত্রগুচ্ছ', [শ্রীকল্পনাকুমারেষু],
দিলীপ কুমার রায়, পৃ-৪১৭)

এ অভিযোগ অগ্রাহ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় শব্দের প্রয়োগ সুসঙ্গত নয়। উদাহরণ,

'—আজি মনে যে মনোজের কেল্লা হ'ল !'
—যুঁই ফুলেতে জোছনার জেল্লা হ'ল !

রাকা চাঁদের আলো
পেয়ে ভ্রমর কালো
বেল্ ফুলের মালঞ্চে বেলেল্লা হল।'
(অভ্র-আবীর, 'কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ')

'ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো
জান্‌বে তা কোন মন্দ গো।
(অভ্র-আবীর, 'লালপরী')

'বাদ্‌লাদিনের উদ্‌লা ঝামট্ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি ;
লাগ্‌বে উছট ; ছাটের জলে ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।'
(অভ্র-আবীর, 'দোসর')

'নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যায় তলিয়ে অগাধ নিষ্ঠীবনে!'
(বেলা শেষের গান, 'সরযূ')

'আঁতের কথা বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ কেমন দাঁত ত্থাখায়'
(বেলা শেষের গান, 'শিরাজ্-ই-হিন্দ্')

'মুগুলগন মজ্জা-মেরুর কাবাব জোগায় কুক্কুরে'
(ঐ)

ঢাকের পিছে ট্যাম্‌টেমি-প্রায় টমির খাঁচায় ট্যাঁশ্‌টোঁশ্‌ও আজ ঘোরে
(বিদায়-আরতি, 'কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি')

উদ্ধৃত অংশগুলির কোন কোনটিতে অর্থও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অনেক সময় অনুপ্রাসের মোহে সত্যেন্দ্রনাথ শব্দের এরকম অপপ্রয়োগ করেছেন। 'কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ', 'দোসর', 'কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি', 'সরযূ' এবং 'শিরাজ-ই-হিন্দ্' থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতাংশটিতে তার নিদর্শন রয়েছে। এছাড়া আরও দৃষ্টান্ত আছে,

'অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বাল্মীকি
হোম্‌রা-চোম্‌রা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি ?'
(অভ্র-আবীর, 'অঞ্জলি')

ভাবকে বিশেষ দীপ্তি দান করেনা এমন ধরণের শব্দের খেলা নিন্দনীয়। কিন্তু কৃতিত্বের তুলনায় কবির এইসব ত্রুটি নগণ্য।

(মুখের কথায় আমরা অনেক বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে থাকি। সত্যেন্দ্রনাথ এইরকম অনেক শব্দকে সাহিত্যের ভাষায় আসন দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে ইংরেজী, আরবী এবং ফারসী শব্দ পাওয়া যায়। 'হসন্তিকা'র কবিতাগুলিতে রসসৃষ্টির প্রয়োজনে বহু ইংরেজী শব্দের ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়াও মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ পাওয়া যায়,

'চারুতায় ছেয়ে দাও মিল্ মেড্ শিল্পে'

(বেলা শেষের গান, 'চরকার আরতি')

'কলে-গড়া 'কম্ফর্ট !'—খেসারত বিস্তর।'

(ঐ)

আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের ভাষায় বহু আগেই শুরু হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ব্যাপক ভাবে ঐ সব শব্দ আমদানী করতে লাগলেন। 'কবর-ই-নুরজাহান্' (অভ্র-আবীর), 'ইৎমদ্-উদ্দৌলা' (ঐ), 'তাজ' (ঐ), 'সাল্-পহেলী' (বেলা শেষের গান), 'সাল্-তামামী' (ঐ), 'আখেরী' (ঐ), 'ইন্‌সাফ্' (বিদায়-আরতি) ইত্যাদি বহু কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই ব্যবহার সার্থক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

'নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে,
লেগেছে য়োস্‌মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলের কোলে সোনার কেশর, নীল সুখেতে স্পন্দমান,
নীল পাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্‌রাণিস্থান।'

(বিদায়-আরতি, 'জাফ্‌রাণিস্থান')

'বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।'

(অভ্র-আবীর, 'কবর-ই-নুরজাহান্')

'মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা
মনে মনে আছে মিল্,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল্!'

(কুহু ও কেকা, 'ফুল-শির্ণি')

২০

কিন্তু এ সম্বন্ধেও অভিযোগ আছে। ১৩৪৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় সমালোচক সৈয়দ আলী আহ্‌সান বলেছেন,

আরবী ফারসী শব্দের শোভন এবং স্বাভাবিক প্রয়োগে কবির কাব্য অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ইহার অপপ্রয়োগে ভাষা সুসজ্জিত হওয়ার পরিবর্ত্তে সং সাজিয়াই বসে, যেমন সং সাজিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি,

'হাল্‌কা হাসির গুল্‌ গুলাবি
পাপ্‌ড়ি কেবল ছড়িয়ে রে
আমেজে মশ্‌গুল ক'রে দেয়
সকল শিকড় নড়িয়ে রে।'

('কবি সত্যেন্দ্রনাথ', পৃ-৫১২)

কবির আত্যন্তিক অনুপ্রাসপ্রিয়তার দরুণই এ অংশের আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার অসুন্দর হয়েছে। শব্দ ব্যবহারের এই ত্রুটির সমর্থনে খুব বেশী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

বাংলায় খুব অল্প পরিচিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেও সত্যেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। 'দ্রোণী', 'প্রাবৃট', 'মদিরেক্ষণা', 'ঋতম্ভর', 'সান্দ্র', 'ন্যগ্রোধ' ইত্যাদি অজস্র শব্দ এর উদাহরণ।

প্রয়োজনবোধে শব্দ সৃষ্টি করতে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এই শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা বহু সমালোচককে চমকিত করেছে। শিশুদের প্রতি সোহাগে তাঁর ভাষা শিশুদের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে,

'আমি কর্‌ব নাকো কাঁদু'

(মণি-মঞ্জুষা, 'ঘুম পাড়ানোর গল্প')

শিশুকে বলেছেন,

'কচি আঙুল ঘুরুণি
বাছা পরাণ জুড়ুনি'

(তীর্থরেণু, 'ঘুম-ভাঙ্গা')

খোকার সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে 'তুল্‌সী পাতা' হয়ে গিয়েছে 'তুল্‌-তুল্‌সী'র পাতা ('খোকা আমার! খোকা আমার! তুল্‌তুল্‌সীর পাতা',

তীর্থ-সলিল, 'মাউরি জাতির ঘুম-পাড়ানী')। শুধু 'তুল্‌সী'র সঙ্গে খোকার তুল্‌তুল্‌ কোমল অঙ্গের তুলনা চলে না। কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে, অনুপ্রাসমোহে সত্যেন্দ্রনাথ কখনও কখনও শব্দের অপব্যবহার করেছেন। কিন্তু শব্দের অনুপ্রাস ভাবের সৌন্দর্যকে স্ফুটতর করেছে এমন দৃষ্টান্তও সত্যেন্দ্র-কাব্যে অনেক আছে। তার একটি,

'উল্‌সে ওঠে মন্‌টা, দেখে
ইল্‌শেগুঁড়ির নাচ।'

(অভ্র-আবীর, 'ইল্‌শে গুঁড়ি')

'ইল্‌শে'র সংঘাতে 'উল্‌সে' শব্দের উল্লাস যেন দ্বিগুণ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। 'উল্লসিত' অর্থে 'উল্‌সে শব্দের ব্যবহারে কবির মৌলিকতা রয়েছে। জুঁই ফুলকে 'বন-জোসিনী' নাম দেওয়াতেও (ফুলের ফসল, 'জুঁই') কবির নবশব্দসৃষ্টির পরিচয়। উড়োজাহাজকে তিনি বলেছেন 'তৈলপ' এবং 'চিড়িয়াগাড়ী'। 'বিস্তার করে' অর্থে 'বিথারি' শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্র-কাব্যে একাধিকবার আছে ('বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও', কুহু ও কেকা, 'যক্ষের নিবেদন',

'সত্য সাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারি,
অজ্ঞমনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি' ইত্যাদি)

'খেলোয়াড়ের দলে'র গুণগাথায় কবি যে-সব বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার উপর কিশোরদের দাবীর দলিল পাকা। 'হণ্টন', 'এস্পোর্ট', 'ক্যাচ্‌-অ্যাজ্‌-ক্যাচ্‌-ক্যান্‌' এই সব শব্দে কিশোরদের একচেটিয়া অধিকার। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান পেয়ে এই শব্দগুলি কবিতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হবার যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে। শিশুরঞ্জক অপর এক কবিতায় রয়েছে 'ঢেঁড়স কি তরকারী', 'নবডঙ্কা', 'হাপুৎ হুপুৎ হপ্‌' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'পেটুকের বর্ণ-পরিচয়')। ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে ভাব-প্রকাশের নিদর্শন আরও আছে। যেমন্‌ 'শিল্‌' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা) কবিতার,

'কঁড়োমড়ো রব যেন উড়ের বুলি'

'রেলগাড়ীর গান' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা) কবিতার,

'একি ! একি ! একি দেখি ! ঢেঁকি ঢেঁকি ভাই
ঘোড়া-চুলো গাছগুলো ছোটে বাঁই বাঁই
উঁকি মেরে ঝাৎ করে
স'রে যায় সাঁৎ করে' ইত্যাদি।

মাসতুত, পিসতুত ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক শব্দ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ 'ফুলতুতো' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, 'বসন্তের ফুল'), 'লতাতো' (ঐ, 'শিউলি'), 'গাছতুতো' (ঐ) ইত্যাদি শব্দের উদ্ভাবন করেছিলেন। নবশব্দসৃষ্টির এমন দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যে বিস্তর। কবিরা সাধারণতঃ ভাবোপযোগী শব্দের সন্ধান করতে গিয়েই নতুন শব্দ সৃষ্টি করে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথের সৃষ্টি করা শব্দগুলি প্রায় সর্বদাই ভাব-বহনের উপযোগী হয়েছে। ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান গুণ। একটি মাত্র কবিতা থেকে তাঁর ভাষার এই গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। কবিতাটির নাম 'ছিন্নমুকুল' (কুহু ও কেকা)। অত্যন্ত সহজ ভাষার মধ্য থেকেও কি করে অনুভূতির বেদনা স্ফূর্তি পায়, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। 'সবচেয়ে' এবং 'ছোট' এই দুটি শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ এর কারুণ্যকে ঘনীভূত করে তুলেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে আরও কয়েকটি একই ধরণের কথা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। যেমন—'সেগুলি', 'সেই', 'গেছে', 'হারিয়ে গেছে', 'হারিয়ে গেল', 'চলে গেছে', 'ছেড়ে গেছে', 'চলে গেল'। 'কুহু ও কেকা'র কবিতাগুলির ভাষা সম্বন্ধে মুদ্রারাক্ষস মোটামুটি ভাবে বলেছেন,

'সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে কাব্যের ভাষা হইবে অপরিবর্ত্তন-সহ। অর্থাৎ যে কথাটি কবি ব্যবহার করিবেন সেটির বদলে ছন্দ ও ভাব বজায় রাখিয়া আর কোন কথা ব্যবহার করা যাইবে না। এই কাব্য খানিতে সেই গুণটি প্রচুর আছে। ইহার ভাষা ভাবদ্যোতক এবং সঞ্জীবিত। আভিধানিক শব্দ অপেক্ষা চলিত শব্দের ভাবব্যঞ্জনার শক্তি সমধিক, সেইজন্য কবি নির্ভয়ে যথাস্থানে যে সমস্ত চলিত শব্দ প্রয়োগ

করিয়াছেন তাহাতে কবিতাগুলির দ্যোতনশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে—সেইজন্য এই কবির কবিতাগুলি বলে যাহা তাহা অপেক্ষা ভাবায় অনেক বেশী।'

('প্রবাসী' ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ-৬৯৪)

বাস্তবিক, কবিতা তখনই সার্থক, যখন তার ভাষা হয় অপরিবর্তনীয়। কবিতার ভাব এবং আঙ্গিক একান্ত ভাবে পরস্পরসাপেক্ষ। এইজন্য ভাষার পরিবর্তন কবিসৃষ্ট ভাবলোককেও পরিবর্তিত করে দেয়, কবিতার অঙ্গহানি হয় তাতে। সত্যেন্দ্র-কাব্যের ভাষার এই 'অপরিবর্তন সহ'তা তাঁর কাব্যের ভাবকে নিখুঁত মূর্তি দিতে পেরেছে। শুধু 'কুহু ও কেকা' নয় তাঁর সব কাব্য সম্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে এই কথা বলা যায়। এই গুণ তাঁর কাব্যসাধনার সাফল্যের অন্যতম কারণ।

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রধান বা প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক কবিতার ভাষার সঙ্গে অন্যান্য কবিতার ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 'ফুলের ফসল' এবং অন্যান্য গ্রন্থেরও অনেকগুলি কবিতায় তাঁর ভাষা কাব্যময়। ভাষা সেখানে অতিচারী কল্পনার বাহন। এই ভাষার নিদর্শন,

'ওগো শতদল! আজিকে কেবল
সব কোলাহল ভোলা,
রাঙা টুক্‌টুক্ পাপ্‌ড়ি ঝিনুক
নিভৃতে ভরিয়া তোলা!
জ্যোৎস্না-মাখানো মরালের পাখা
আঁখি মেলে আজ তারি পানে তাকা,
বর্ষা চুকায়ে বিজুলি লুকায়ে
শাদা মেঘে চোখ্ বোলা;
(আজ) সীস্ মহলের সকল তলের
সকল ঝরোখা খোলা!'

(ফুলের ফসল, 'শতদল')

'ঘাসের শীষে সবুজ করে শিস্ দিয়েছ সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি!'

(অভ্র-আবীর, 'সবুজ পরী')

'আঙুর-দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন-বুলানো হাওয়া'
(ফুলের ফসল, 'পুষ্পের নিবেদন')

অন্যত্র তিনি যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন তার ভঙ্গি গদ্যের। সে ভাষা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, তাতে রহস্যময়তা নেই। উদাহরণ,

'পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার।'
(অভ্র-আবীর, 'কবর-ই-নূরজাহান্‌')

'কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।'
(বিদায়-আরতি, 'কয়াধু')

'কালার কীর্ত্তি মিশর-দ্রাবিড়-আরব-চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্ত্তি? ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা!'
(বিদায়-আরতি, 'দাবীর চিঠি')

'রাজায় প্রজায় খাদ্য-খাদক! কেমন রাজা! কেমন প্রজা!'
(বেলা শেষের গান, 'ভীম-জননী')

'চিড়িয়া-গাড়ী শাঁজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন মারতে নিরস্ত্রেরে,
'বেবি-কিলার' জাঁদরেল্‌ এলেন জালিয়াঁবাগে, জবর ফৌজ ঘেরে;
ভাঙ্‌তে সভা বল্‌লে নাকো, বললে নাকো "নইলে সাজা হবে",
হঠাৎ শুরু মৃত্যু বৃষ্টি! আকাশ বধির আর্ত্ত-কলরবে!'
(বেলা শেষের গান, 'ফরিয়াদ')

এ তাঁর ভাবানুগ ভাষা ব্যবহার ক্ষমতার পরিচয়।

(এই কবির কবিতাতে ভাষার চিত্রণ-নৈপুণ্যের কথা সর্বজনবিদিত। 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা' প্রভৃতি কবিতায় এর অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। 'তুলির লিখনে'র 'শোভিকা' থেকে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি,

'শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার
কীলক-বদ্ধ কবাট তাহে,

গৃহচূড়ে সৌভাগ্য-পতাকা

গৃহতলে শুক সারিকা গাহে ;

শ্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই

রেশমের হিন্দোলার পরে,

দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা

মক্ষী তাড়ায় চামর করে।'

এই উদ্ধৃতিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। 'স্বপ্ন', 'বর্ষামঙ্গল' ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন শব্দচয়নের বিশিষ্টতায় কালিদাসের কাব্যের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন,—সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাংশেও তেমনি শব্দ-ব্যবহারের বিশিষ্টতায় কালিদাসের কাব্যের যুগের পরিবেশ স্পষ্ট হয়েছে।

১৩২৯ এর শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিবন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

'বহু শব্দ জানা ছিল বলে' ও কবিতার মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে' সত্যেন্দ্র কথা নিয়ে ওলট-পালট করে' বা এক কথা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে' শব্দক্রীড়া (pun) করতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় 'হসন্তিকা' বইয়ে 'অম্বল-সম্বরা কাব্যে।'

('সত্যেন্দ্র পরিচয়', পৃ-৫৮৯)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উল্লিখিত প্রবন্ধেই সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-ক্রীড়ার একটি উদাহরণ রয়েছে। কবি কাশ্মীর থেকে ঐ প্রবন্ধের লেখককে লিখেছিলেন,

'হয়েছে ভূস্বর্গ-প্রাপ্তি হঠাৎ আমার,

স্বর্গীয় হয়েছি আমি, ভুল নাই তার।

ভূ-পূর্ব্ব স্বর্গীয় কবি অদ্য তাই sings

নিসর্গের জয়! আর বিজয়া greetings।'

'হসন্তিকা' গ্রন্থের 'অদ্ভুত-ভূমিকা বা ফুৎকারে' আছে,

ক'সে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টিকা ;

কানুন্-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক'

এই কবিতাটি পুরোপুরিই দ্বর্থ্যবোধক। সত্যেন্দ্রনাথের এই গুণ গল্প-লেখক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য স্মরণ করায়।

সব শেষে আবার বলব—ভাষাশিল্পী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের মস্ত বড় কৃতিত্ব মুখের ভাষায় প্রচলিত দেশী-বিদেশী নানা শব্দকে সাহিত্যের ভাষায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভাষাকে জোরালো করবার আদর্শ স্থাপন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন,

তাঁর হাতে বাংলা ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি ভাস্বর আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে উঠত।

('৺সত্যেন্দ্রনাথ', 'সবুজপত্র' ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ-৬২৮)

সংস্কৃত ভাষার বন্ধনজাল থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দেবার জন্য যে আন্দোলন তাতে সত্যেন্দ্রনাথের সহায়তা আছে অনেকখানি। তাঁর প্রথমগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা' (আশ্বিন ১৩১৩, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) থেকেই সরল ভাষা ব্যবহারের প্রতি তাঁর ঝোঁক দেখা গেছে। ঐ গ্রন্থের 'সহমরণ', 'একদিন-না-একদিন', 'ধর্ম্মঘট' ইত্যাদি কবিতার ভাষা লক্ষ্য করলে একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। এর বহু পরে ১৩২১ সালে 'সবুজ পত্রে'র প্রতিষ্ঠার পর ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভাষাশিল্পী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিকতার দাবী অনেকখানি।

ঘ—ছন্দের যাদুকর

(নানাবিধ পরীক্ষণ নিরীক্ষণ দ্বারা বাংলা ছন্দকে ঋদ্ধ করেছিলেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দোগুরু' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'ছন্দের রাজা' এবং 'ছন্দের যাদুকর' আখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি একদিকে যেমন প্রশংসার স্বর্ণমুকুট পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নিন্দার কণ্টক-জ্বালায়ও জর্জরিত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভাবের চাইতে ছন্দ-সৌষ্ঠবের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে সাহিত্যরসকে উপেক্ষা করেছেন।) ছন্দ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-বোধ কতখানি নিন্দা-প্রশংসার যোগ্যতার আলোচনা হবে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে।)

১৩২৫ সালের 'ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে সত্যেন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি 'গাঙ্গিণী-তরণ-পদ্ধতি', 'গঙ্গা-যমুনা-পদ্ধতি', 'ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতি', বিমান-বিহার-পদ্ধতি', এবং 'বুলবুল-গুলজার-পদ্ধতি' নামে বাংলা ছন্দের পাঁচটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কবি-বর্ণিত প্রথম তিনটি পদ্ধতিকে আমরা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যথাক্রমে—'জটিল কলামাত্রিক', 'সরল কলামাত্রিক', ও 'দলমাত্রিক' রীতি নামে অভিহিত করে থাকি (ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের নামকরণ অনুযায়ী)। সাধারণ্যে এগুলি যথাক্রমে 'পয়ার' বা 'যৌগিক', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং 'স্বরবৃত্ত' বা 'লৌকিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নামে পরিচিত। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মত বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিতে ধ্বনির লঘু-গুরু প্রকারভেদ নেই। সেই সব ভাষার ছন্দানুবাদকালে বাংলা ধ্বনির এই অভাবপূরণের চেষ্টায় সত্যেন্দ্রনাথ মুক্ত-দল ও রুদ্ধদল বিন্যাসের যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন—তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'বিমান-বিহার পদ্ধতি'। জটিলকলামাত্রিক এবং দল-মাত্রিক ছন্দে দল (syllable)-বিন্যাসের ধরণে সকল পর্বে উচ্চারণ-নিরপেক্ষ ভাবে সম-সংখ্যক মাত্রা দাঁড়াবার স্থান পায় না। তখন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে আমাদের ঐ সমতা বিধান করতে হয়। যেমন,

বন উপবন। আলো ক'রে। অশোক ফুটে। আছে

এখানে প্রথম পর্বটিতে ছমাত্রাই দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে 'আলো'র পরে এক এবং 'করে'র পরে আর এক মাত্রা টেনে পড়ে আগের পর্বের মাত্রা সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হচ্ছে। ঐ পংক্তির তৃতীয় পর্বেও 'ফুটে'র পর এক মাত্রা টেনে পড়তে হয়। বিশেষ ধরণে দল সমাবেশ করে মাত্রার সকল ফাঁক পূরণ করে দল-সংখ্যা ও কলা (mora) পরিমাণ যুগপৎ ঠিক রাখা হয় যে পদ্ধতিতে তাকেই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'বুলবুল-গুলজার পদ্ধতি'। আধুনিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'দল-কলা-মাত্রিক' রীতি (প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নামকরণ অনুযায়ী। এই ছান্দসিক পূর্বে এর নাম দিয়েছিলেন 'স্বর-কলামাত্রিক' রীতি)।

শেষ দুটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সত্যেন্দ্রনাথের একার। এই কারণেই বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর পূর্বে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলায় কবিতা রচনা হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্তীদের কবিতায় সংস্কৃত উচ্চারণ অনুযায়ী হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে লঘু-গুরু ভেদ ধরা হত। এরকম কবিতা সত্যেন্দ্রনাথও লিখেছেন (বিদায়-আরতি, 'দুর্ভিক্ষের গান')। বাংলা উচ্চারণের খাঁটি রূপ ঐ রীতিতে রক্ষিত হতনা। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণকে ঠিক রেখে তারই মধ্যে দল-সমাবেশের কৌশলে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ: (rhythm)কে ধরবার চেষ্টা করলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ মূল ভাষার ছন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ছন্দানুবাদ সাজিয়ে কিভাবে মূল ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা উপলব্ধি করবার সহায়তা করেছেন। তিনি মন্দাক্রান্তা, মালিনী, রুচিরা, পঞ্চচামর, ছালিক্য, গৌড়ী গায়ত্রী, শার্দূল বিক্রীড়িত, তোটক, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত প্রভৃতি সংস্কৃতের নানা ছন্দদোল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এগুলির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাক।

মন্দাক্রান্তা,

'সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাওহে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।'

(কুহু ও কেকা, 'যক্ষের নিবেদন')

মালিনী,

'উড়ে চলে গেছে বুলবুল্,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।'

(কুহু ও কেকা, 'রিক্তা')

রুচিরা,

'তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল্-বাতাস লেগে'

(কুহু ও কেকা, 'তখন ও এখন')

পঞ্চচামর,

'মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল'

(অভ্র-আবীর, 'সিন্ধু-তাণ্ডব')

ছালিক্য,

'জয় জয় ভারত ! জয় জয় মাতা !
ঋদ্ধির নিধান ! সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তির গাথা ! জয় ! জয় !'

(বেলা শেষের গান, 'ভারতের আরতি')

শার্দূল বিক্রীড়িত,

'সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ !'

(বেলা শেষের গান, 'বিদ্যুৎ-বিলাস')

তোটক,

'একি চঞ্চলতায় ডানা বৃন্তে বাঁধা !
একি মূর্চ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা !'

(অভ্র-আবীর, **'জাফ্‌রাণের ফুল'**)

চণ্ডবৃষ্টি প্রপাত,

'গগনে গগনে নীল নিবিড়
ভিড় মেঘের ! ভিড় গো ভিড় !
শোন্‌ তাদের শব্দ ভীম
ডম্বরুর—দুন্দুভির !'

(মণি-মঞ্জুষা, 'বর্ষা-মেঘ')

কিংবা,

'পাখী ডেকে ওঠে ওই গো ওই,
বয় ভোরের হিম বাতাস ;
জাগ্‌ল কার শান্ত চোখ
ফুট্‌ল কার পুষ্প হাস।'

(বেলা শেষের গান, 'মাতা-মন্থ')

জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ দশাবতার স্তোত্রের ছন্দে,

'পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি টেষ্ট্‌ফুল্‌ !'
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো ! বিল্‌কুল !
দেবতা ! হইলে মছ্‌লি বেবাক্‌ !
বলিহারি যাই তোমারি !'

(হসন্তিকা, 'দশাবেতর স্তোত্র')

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁর 'অনামী' গ্রন্থের 'পত্রগুচ্ছে' 'কল্পনাকুমার'কে লেখা পত্রের একস্থানে বলেছেন,

'বস্তুতঃ সংস্কৃত গুরুস্বর অতি অপূর্ব্ব কল্লোল আনে। কিন্তু কল্লোল সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতেন না। তাই তিনি স্বরমাত্রিকের যুগ্মধ্বনিকে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরবর্ণের বদ্‌লি হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলুনতো, তাতে কি সংস্কৃত ছন্দের প্রতিরূপটি এসেছে? ঠাট এসেছে মানি,

কিন্তু উধাত্তধ্বনি—ডমরুরোল—গাম্ভীর্য্য ?—আস্‌তেই পারে না। কেন পারে না ? কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরবর্ণের দরাজ আওয়াজের 'পরে ওর অনেকখানি সৌন্দর্য্যই নির্ভর করে।'

১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধখানি লিখেছিলেন, তাতে 'ছন্দ সরস্বতী'র মুখে স্পষ্ট ভাবে একথা আছে,

'দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার-ভাঁটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয়তো বাংলায় হবে না। না হোক, যতটা হয় তাই বা ছাড়বে কেন ? তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাও,—মেঘের সংঘাতে যে গর্জ্জন, যে বিদ্যুৎ, অক্ষর-সঙ্ঘাতের সাহায্যে তারি সৃষ্টি কর।'

(পৃ-১৭)

এরপরেও সত্যেন্দ্রনাথ 'কল্লোল বুঝতেন না' এ ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করা কি অযৌক্তিক এবং অর্থহীন নয় ? সংস্কৃত উচ্চারণের 'দরাজ আওয়াজ' বা 'উদাত্ত ধ্বনি' আনতে হলে বাংলাতেও সংস্কৃতের উচ্চারণ অনুযায়ী দীর্ঘস্বরের যথার্থ উচ্চারণ করতে হবে একথা জেনেই তিনি 'দুর্ভিক্ষের গানে' লিখেছিলেন,

[উচ্চারণ সংস্কৃতানুযায়ী, হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে লঘুগুরু]

'আজি নিরন্ন দেশ বিপন্ন,
ক্লেশ বিষণ্ণ লক্ষ হিয়া ;
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীরব-ছায়া
ছাইল অম্বর পক্ষ দিয়া।'

(বিদায়-আরতি)

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দ ছাড়াও অনেক ভাষার ছন্দ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। আরবী, ফারসী ছন্দের অনুবাদের সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে আছে। মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থের 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' কবিতায় মূল ফারসী ছন্দের অনুসরণের নিদর্শন রয়েছে।

'জগৎসার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেয !
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ !'

গুজ্‌রাটি অঁজ্‌নী ছন্দের অনুসরণে তিনি লিখেছেন,

'হাস্‌ তুই খেল্‌ তুই কলরব কর্‌ তুই
সুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর্‌ তুই
বাপ্‌মার কোল জুড়ে থাক্‌ সুন্দর তুই
খোকা তুই ভালো থাক্‌রে।'

(মণি-মঞ্জুষা, 'খোকা')

চীনের আলগ্‌ পাপড়ি (mono-syllable)র অনুসরণে,

'শিস্‌ কে ভায়গো আজ
তার কি ভিন্‌ গাঁ ঘর।'

তাঁর 'রাজর্ষি রামমোহন' (অভ্র-আবীর) কবিতাটি গ্রীক Bumos বা বেদীভূমক ছন্দে লিখিত। 'দিগ্বিজয়ী' (অভ্র-আবীর) কবিতাতেও পংক্তিসজ্জার একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এই দুটি কবিতার ছন্দে জটিল-কলামাত্রিকের সুরই স্পষ্ট। মূলের ছন্দস্পন্দের বৈশিষ্ট্য এগুলিতে পাওয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ সে ছন্দের পংক্তিসজ্জার বৈশিষ্ট্যই শুধু অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। ইংরেজী 'Young Lochinvar' কবিতার ছন্দে তিনি লিখেছেন,

'ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ!'

(কুহু ও কেকা, 'সিংহল')

আরবী, ফারসী, গুজরাটি, চীনদেশীয়, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি ছন্দের অনুবাদ সত্যেন্দ্র-পূর্ব কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩২৯ এর 'ভারতী' শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর 'সত্যেন্দ্র-স্মরণে' প্রবন্ধে কবির নানা ভাষার ছন্দানুবাদের কথা উল্লেখ করে তালিকা দিয়ে বলেছেন—'নানা বিদেশী ছন্দ—ইংরাজী, গ্রীক, ইতালিয়ন্‌, স্কচ, ফরাসী, জাপানী, জার্ম্মান ছন্দের সুর' সংস্কৃত জটিল ছন্দের সুর' তিনি বাংলায় আমদানী করেন। এই তালিকায় অতিশয়োক্তি আছে। একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, উল্লিখিত কবিতাগুলিতে অন্য ভাষার ছন্দের ধ্বনিস্পন্দন বিধৃত হয়েছে

বটে, কিন্তু বাংলা ছন্দের মাত্রা গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেকটিকে জটিল কলামাত্রিক বা সরল কলামাত্রিক বা দলমাত্রিক কিংবা দল-কলামাত্রিক রীতিতে বিশ্লেষণ করা যাবে। এগুলির মাত্রা গণনার কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নেই।

'ছন্দ-সরস্বতী'তে উল্লিখিত পঞ্চম পদ্ধতি অর্থাৎ দল-কলামাত্রিক রীতির ছন্দ রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই 'নোতুন পদ্ধতি' সত্যেন্দ্রনাথের স্বোদ্ভাবিত। বাংলা ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করে, বাংলা ছন্দকে কেমন দরকার মত উচ্ছল বা তরঙ্গিত করে তোলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ তার নানাপ্রকার উদাহরণ রেখে গেছেন তাঁর কাব্যে। এই ছন্দের প্রতি পর্বের দল-কলা বিন্যাসে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বিদল-ত্রিকলা বিন্যাসের উদাহরণ রয়েছে চীনের Mono-syllabic ছন্দের অনুবাদে। দ্বিদল-চতুষ্কলা-মাত্রিক ছন্দের উদাহরণ 'পিয়ানোর গান' (অভ্র-আবীর) কবিতা।

'টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।'

বিদায়-আরতিতে সংকলিত 'দূরের পাল্লা' কবিতাতেও আংশিক-ভাবে এই রীতির ব্যবহার আছে,

'ছিপ্ খান্ তিন্ দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।'

এই কবিতারই কিয়দংশে ত্রিদল-চতুষ্কলা-মাত্রিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে,

'রূপশালি ধানবুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।'

'ঝর্ণার গান' এবং 'যশোধন' কবিতায় ত্রিদল-পঞ্চকলা-মাত্রিক বিন্যাস আছে। 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' ত্রিদল-পঞ্চকলা বিন্যাসে লেখা। 'ঝর্ণার গান' থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক,

'শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্ ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গমোর ঝল্‌মলে।'

(বিদায়-আরতি)

ত্রিদল-ষড়কলা-মাত্রিকের দৃষ্টান্ত রয়েছে Young Lochinvar-এর ছন্দে লেখা 'সিংহলে'। ছন্দানুবাদ প্রসঙ্গে এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্দল-পঞ্চকলা বিন্যাসে লেখা হয়েছে 'সমুদ্রাষ্টক' (অভ্র-আবীর), 'হরমুকুট গিরি' (অভ্র-আবীর) এবং 'দূরের পাল্লা' (বিদায়-আরতি) কবিতার কিছু অংশ।

ক. 'সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।'

('সমুদ্রাষ্টক')

খ. 'হরমুকুট ! হরমুকুট !
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট'

('হরমুকুট গিরি')

গ. 'পান সুপারি ! পান সুপারি !
এইখানেতে শঙ্কা ভারি'

(দূরের পাল্লা')

সংস্কৃত পঞ্চচামর ছন্দের অনুবাদে লেখা কবিতাটি (অভ্র-আবীর, 'সিন্ধু তাণ্ডব') চতুর্দল-ষড়কলা বিন্যাসের উদাহরণ। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় দল-কলামাত্রিক ছন্দের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পর্বে অসম-সংখ্যক দল-কলা সন্নিবেশে। বিদায়-আরতি গ্রন্থের 'হিন্দোল-বিলাস' কবিতাতে এক এক পর্বে দ্বিদল-ত্রিকলা, দ্বিদল-চতুষ্কলা, ত্রিদল-চতুষ্কলা, ত্রিদল-পঞ্চকলা, চতুর্দল-চতুষ্কলা, চতুর্দল-ষড়কলা, এবং চতুর্দল-অষ্টকলা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন,

'প্রাণে মনে হিল্লোল
বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙের বোল্ মৃদু-মন্থর ;
শ্রাবণেরি ছন্দে
কদমেরি গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল ! চির সুন্দর !
* * *
পশ্‌লায় পশলায় রূপ ধর্‌গো
* * *
জুঁইফুল,-বিল্‌কুল চুলে তুই পর ।'

বেলা শেষের গানের 'ছন্দ-হিন্দোল' কবিতায় চতুর্দল-পঞ্চকলা, চতুর্দল-ষড়কলা এবং চতুর্দল-সপ্তকলা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'প্রণাম' (বেলা শেষের গান) কবিতার প্রতি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে ষড়দল-ষড়কলা এবং অন্য দুটি পর্ব এবং পরবর্তী দুই পংক্তির চারটি পর্বেই ত্রিদল-পঞ্চকলা ব্যবহৃত হয়েছে। 'বর্ষা-মেঘ' (মণি-মঞ্জুষা) ও 'মাতা-মনু' (বেলা শেষের গান) র ছন্দে প্রতি স্তবকের প্রথম পর্বে ষড়দল-ষড়কলা এবং বাকী সব পংক্তির সব পর্বে ত্রিদল-পঞ্চকলা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথের দল-কলা-মাত্রিক ছন্দ ও তার বৈচিত্র্যের মোটামুটি পরিচয়। এই কবিতাগুলিতে রুদ্ধদল ও মুক্তদল বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দেখা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জটিল কলামাত্রিক, সরল কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক রীতিতেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্বসূরির অনুসরণে এসেছে, কোন কোন স্থলে তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে তিনি হসন্তিকা গ্রন্থের 'অম্বল-সম্বরা-কাব্য' এবং তীর্থরেণুর 'দুর্গমচারী' লিখেছিলেন। নাট্যকাব্য 'শক্র' (ভারতী' ১৩২২ আশ্বিন, পৃ-৫৪৫) তেও এই ছন্দের ব্যবহার আছে। নাট্যকাব্য 'আয়ুষ্মতী' (রঙ্গমল্লী) তেও অমিত্রাক্ষর ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে—তবে, এর পর্বভাগ আট-ছয়ের

রীতিতে নয়, আট-দশের রীতিতে। এইরকম পর্বভাগের অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'বন্দীদেবতা' ('প্রবাসী' ১৩২০ আশ্বিন, পৃ-৭৬০)তেও আংশিক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অসমপংক্তির জটিল কলামাত্রিক রীতির কবিতা তাঁর কাব্যে অনেক দেখা যায়। তার একটি দৃষ্টান্ত,

'বসন্তের প্রথম উষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু ;— কে আজি সুধায়
মুহুর্মুহু আনন্দে গলিয়া ?—কু ?'

(কুহু ও কেকা, 'কু ?')

আর একটি,

'হায় !
বসন্ত ফুরায় !
মুগ্ধ মধুমাধবীর গান
ফল্গুসম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল অনিমিখ
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্ !
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায় !'

(কুহু ও কেকা, 'গ্রীষ্মের সুর')

এই কবিতার পংক্তিসজ্জার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই পংক্তিসজ্জার বিশেষত্ব দেখা যায়। অসমপংক্তির জটিল কলামাত্রিক রীতির কবিতা 'মহাসরস্বতী' (অভ্র-আবীর)তে প্রবহমানতা দেখা দিয়েছে। কবিতাটির ভাব-গাম্ভীর্য এ ছন্দে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন,

'রুদ্রের দুহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধাভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমনবার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'— বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথি ঐক্য সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।'

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি পয়ার জাতীয় কবিতায় প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। এর ভালো উদাহরণ 'পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি' (অভ্র-আবীর) কবিতা।

'জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
কার লাগি মহাবাহু ! কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ ?
জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মহা উল্লাস
কেন আজি দেহে-মনে ? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে
সন্ধি আজি শুভক্ষণে— পরিণয় জীবনে-মৃত্যুতে !'

অভ্র-আবীরের 'অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও প্রবহমানতা আছে। তীর্থরেণুর 'গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে', 'ধর্ম্ম' ইত্যাদি, মণি-মঞ্জুষার 'বিস্মৃতি', 'সূর্য্যের মৃত্যু', 'চিরন্তনী', 'বিশ্বের প্রার্থনা' ইত্যাদি কবিতাতেও ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলি দীর্ঘ পয়ারে রচিত। আট-ছয় পর্বভাগের পয়ারেও প্রবহমানতা দেখা যায়। তীর্থরেণুর 'আদর্শযাত্রী', তীর্থসলিলের 'মাতার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা তার নিদর্শন।

'মরমে মরি, মা, আজি স্মরিয়া আপন
কৃতকর্ম্ম ;— যাহা ব্যথিয়াছে তব মন ;—
যে মনে— সবার বেশী পাই স্নেহধন।'

(তীর্থ সলিল, 'মাতার প্রতি')

জটিল কলামাত্রিক রীতির কয়েকটি কবিতায় মাত্রাবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

লক্ষ্য করা যায়। তীর্থ সলিলের 'মৃত্যুরূপা মাতা'র প্রতি পংক্তির দুই পর্বে দশটি করে মোট কুড়িটি মাত্রা আছে। এই কবিতার দুএক স্থানে প্রবহমানতা আছে।

'প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,— মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!— দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!'

তীর্থরেণুর 'শীতসন্ধ্যা'র প্রথম পংক্তির মাত্রাবিন্যাস আট আর দশে, দ্বিতীয় পংক্তিতে ছয় মাত্রা। ঐ গ্রন্থের 'সাগরের প্রতি' কবিতায় প্রথম পংক্তিতে দশ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে দশ-দশ করে কুড়িটি মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে। এ ছন্দেও দু এক জায়গায় প্রবহমানতা আছে। ছন্দের গুণে কবিতাটিতে সাগরের গাম্ভীর্য যথার্থ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। জটিল কলামাত্রিকের মাত্রা বিন্যাসের এই ধরণটি সচরাচর দেখা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,

'হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার,
মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি'
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব, মাঝে মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি
অতল পাতাল গুহা প্রায়,
তারি পরে অস্পষ্ট সুদূর তরী চলে স্পন্দিত পাখায়।'

রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের জটিল কলামাত্রিক রীতির সমিল মুক্তক ছন্দে লেখা কবিতাগুলি ১৩২১ সাল থেকে ১৩২২ সালের মধ্যে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রায় সেই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থের 'চোখের চাহনি' কবিতায় ঐ ছন্দের ব্যবহার আছে। সমগ্র সত্যেন্দ্র-কাব্যে জটিল কলামাত্রিক রীতির সমিল মুক্তক ছন্দে লেখা কবিতা এই একটিই,

'অভুক্ত চাহনি,
যেন সব অন্ধকার খনি;
কারো আঁখি যেন ঠিক্ নারী-হত্যা দেখিতে লোলুপ,

কারো গূঢ় বিষাদের কূপ,
অজ্ঞাত দুঃখের বাষ্পে পাংশুল পাণ্ডুর,
শুধুই বিধুর ;
যেন কোন চাষাদের ছেলে,
কারখানা জানালায় আছে আঁখি মেলে,
তাঁতীর ব্যবসা যেন নেছে মালাকর ;
মোমের পুতুলে ভরা যেন যাদুঘর,—
নিদাঘের রৌদ্রের আভাসে।'

দলমাত্রিক মুক্তক ছন্দও রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ঐ ছন্দের ও একটি কবিতা ('সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে') মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থে আছে। বিদায়-আরতির 'মালাচন্দনে'ও এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'মালাচন্দন' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক,

'প্রণাম তোমায় কর্‌ছি অনুপ কবি !
যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি ছাখেন বিশ্ব-ছবি
নিত্যদিনই নূতনতর ছাঁদে ;—
চিত্তলোকে পুলক যে ছায়, নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে।'

এই ছন্দগুলির বহুল ব্যবহার সত্যেন্দ্র-কাব্যে নেই। রবীন্দ্রনাথের নব-ছন্দ পরীক্ষা কালেই লেখা বলে সত্যেন্দ্রনাথের এই ছন্দগুলির বিশেষ মূল্য আছে।

সরল কলামাত্রিক ছন্দে মাত্রাবিন্যাসের নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। 'দূরের পাল্লা' কবিতার,

'চাপ্‌ চাপ্‌ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তার
জল-গায় চরছে।'

(বিদায়-আরতি)

যা তীর্থরেণুর 'জিন্' কবিতার,

'নিরজন
নিদ্‌পুর—
নিকেতন
মৃত্যুর ;
বায়ু, হায়,
মুরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুর।'

অংশে প্রতি পূর্ণ পর্বে চতুষ্কলা বিন্যাস দেখা যায়। কুহু ও কেকার 'দুইসুর' কবিতার প্রতি পূর্ণ পর্বে পঞ্চকলা আছে। যেমন,

'কোকিল-কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !'

ষড়কলা পর্বের কবিতা সত্যেন্দ্র-কাব্যে অগণ্য। একটি উদাহরণ,

'আদি-সম্রাট সর্ব্বদমন—
পুরাণেতে যাঁরে ভরত বলে'
(বিদায়-আরতি, 'সর্ব্বদমন')

সপ্তকলা পর্বের দৃষ্টান্ত,

'মৈত্র করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগহে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়'
(বেলা শেষের গান, 'বুদ্ধপূর্ণিমা')

সংস্কৃত থেকে অনূদিত ছন্দে একই পর্বে অষ্টকলা বিন্যাসও দেখা যায়। মন্দাক্রান্তায়,

'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভোতল কই গো কই মেঘ উদয় হও।'

এই কবিতাটিতে সকল পর্বের মাত্রা সংখ্যা সমান নয়। প্রতি পংক্তির প্রথম পর্বগুলিতে আটমাত্রা এবং বাকী পর্বগুলিতে সাতমাত্রা করে আছে। এও সরল কলামাত্রিক রীতিতে বৈচিত্র্যের নিদর্শন। ছন্দানুবাদমূলক কবিতায় এই রকম বৈচিত্র্যের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

সত্যেন্দ্র-কাব্যে লঘু ত্রিপদীর ছাঁদে লেখা সরল কলামাত্রিক ছন্দের কবিতা পাওয়া যায়। যেমন,

'চিত্ত হারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম।'

(মণি-মঞ্জুষা, 'বরভিক্ষা')

সরল কলামাত্রিক রীতিতে রচিত 'বেলজিয়মের জাতীয় সঙ্গীতে' (মণি-মঞ্জুষা) দীর্ঘত্রিপদীর বিন্যাস আছে,

'দাম্ভের লজ্জা সে টুটিল তোমার ওগো
দুখ দুর্দ্দিন অবসান,
উড়াও তোমার ধ্বজা ঝঞ্ঝার অঞ্চলে
লও পুন নব সম্মান।'

সত্যেন্দ্রনাথ এ ছন্দে এক পংক্তিতে অনেক পর্ব এবং পরের পংক্তিতে কিছু কম পর্ব সমাবেশ করেও কবিতা লিখেছেন,

'বনে, প্রান্তরে, শৈল-শিখরে সে আছে সীমার পারে,
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে ;
লুপ্ত-আলাপ বিশ্বরাগিণী লিপ্ত করিছে তারে,
পান্থ-পাখীর সাথী হ'য়ে সে বিহরে।'

(তীর্থরেণু, 'সে')

তীর্থরেণুর 'মুগ্ধ', 'সাধ' এবং 'সঙ্কেত গীতিকা'য় কলাবিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। ষড়কলার অনেকগুলি পর্বের পংক্তির মধ্যে মধ্যে পঞ্চকলার এক পর্বের পংক্তি সজ্জিত হয়েছে। আগে বলেছি, পংক্তি-সজ্জার বিশেষত্ব সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। এই ছন্দে লেখা 'জিন্' (তীর্থরেণু) কবিতা ও 'ঝড়ের ছড়া' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা)-য় এই বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতি স্তবকের পংক্তিগুলিতে কখনও পর্বের কলাসংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে, কখন বা পর্বসংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে 'জিন্' কবিতাটি এমন ভাবে লেখা যে, তার পংক্তি-সজ্জায় স্বাতন্ত্র্য

দেখা দিয়েছে। 'ঝড়ের ছড়া'র শব্দগুলি যেন দমকা হাওয়ায় ওরকম-ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ফুলের ফসলের একটি গানে ('হায় বারণ করে') পংক্তির মাঝখানে অতিপর্ব বিন্যাস করা হয়েছে। অপর একটি গানেও ('চাঁদেরি মত চির সুন্দর সে', ফুলের ফসল) মাঝে মাঝে পংক্তির মধ্যে অতিপর্ব সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে পূর্বোল্লিখিত গানটির মত এর পংক্তি সজ্জায় আগাগোড়া এক নিয়ম অনুসৃত হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার 'ছন্দ-গীতি'র কথা বলতে গিয়ে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কবির সরল কলামাত্রিক ছন্দে রচিত 'পারব্‌না একলাটি আজ ঘরে পারব্‌না রহিতে' (বেলা শেষের গান, 'কয়েকটি গান') এবং জৈষ্ঠী-মধু' (বিদায়-আরতি) কবিতা দুটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন ('সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ'।) ঐ প্রবন্ধে 'জৈষ্ঠী-মধু' সম্বন্ধে আরও বলেছেন—তাতে,

'কবির শুধুই কণ্ঠের গুন গুন নয়—হাতের তুড়ি-দেওয়ার শব্দও শুনা যাইবে।'

রুদ্ধদল ও মুক্তদলের সমাবেশ কৌশলের ফলে কবিতাটিতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সরল কলামাত্রিক ছন্দটি 'গড়িয়ে চলে', তাকে 'যেখানে সেখানে থামানো যায় না' (কবির সংলাপ, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন)—এই কারণে এতে প্রবহমানতা আনা কষ্টসাধ্য। মণি-মঞ্জুষার 'ঝুলন' কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সামান্য প্রবহমানতা আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন,

'পদ্মফুল ফুটিয়া আছে চক্রটির কেন্দ্রেতে,
সূক্ষ্ম তার অর্থ—আহা জানে সে কোন্ সজ্জনে!'

সরল কলামাত্রিক ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা অভিনব যে কীর্তি তা হচ্ছে 'মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর' রচনা। তীর্থ রেণু'র 'সঙ্গীত মিস্ত্রীর নিবেদন' কবিতাটিতেই শুধু এই ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। একটু নমুনা,

'তরুলতা—পুষ্পে,
তারা—উদয়াস্তে,

নদী—ভাঁটা জোয়ারে,
সঙ্গীতে বেপমান !
রাজরাজ ব্রহ্মণ
কবিদের জ্যেষ্ঠ
তাঁরি মহাছন্দে
চরাচর চলিছে ।'

মাঝে মাঝে মিলের ঝোঁক যে এসে পড়েনি, এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

'সত্য কি ?—শুনিছ ?
তুমি সব দেখিছ ?'

সরল কলামাত্রিক ছন্দে লেখা 'রেলগাড়ীর গানে' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা) সত্যেন্দ্রনাথ রেলগাড়ীর চলার ছন্দকে ধরেছেন। ছন্দে কাজের ছন্দ ধরে দেওয়ার এই ক্ষমতা দলমাত্রিক ছন্দেও পরিস্ফুট হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের দলমাত্রিক ছন্দে লেখা মুক্তকের কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হয়েছে। এই ছন্দে বিভিন্ন পর্বে অসমসংখ্যক দলবিন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আছে। প্রতি পংক্তিতে প্রথম পর্বে ত্রিদল ও দ্বিতীয় পর্বে চতুর্দল বিন্যাস করা হয়েছে বেলা শেষের গানের 'সাঁঝাই' কবিতায়,

'সোনালি জর্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
নিথরের পর্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়।'

এই ধরণের দলমাত্রিক ছন্দের ছড়ার সন্ধান আমাদের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারেও পাওয়া যায়,

'হ্যাদেরে কলমী লতা
এতকাল ছিলে কোথা।
এতকাল ছিলাম বনে
বনেতে বাগ্দী ম'ল,
আমারে যেতে হোলো।'
ইত্যাদি

('লোকসাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলে ভুলান ছড়া' (২))

'কোথাকার ঢেউ লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার সোঁত ভেঙেছে
মেঘের থরে।
গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল করে'।

ঝড়ে আজ ঝুলনো ঝুলে
তমাল তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয় চমকে তাকায়।
বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নূতন দলে,
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায় সরে।'

(অভ্র-আবীর, 'আষাঢ়ের গান')

সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতার প্রথম স্তবকের প্রথম তিন পংক্তির প্রথম পর্বগুলিতে ত্রিদল ও দ্বিতীয় পর্বগুলিতে চতুর্দল বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ পংক্তিতে চারটি দল আছে। এই স্তবকেরই পরবর্তী চারটি পংক্তিতেও পূর্ববর্তী চারটি পংক্তির মতই দলবিন্যাস হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে ত্রিদল এবং দ্বিতীয় পর্বে চতুর্দল আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির সব পর্বেই চারটি করে দল বিন্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী চার পংক্তি প্রথম স্তবকের প্রথম চার পংক্তির মত। বিদায়-আরতির 'ভোম্‌রার গানে'ও তিন ও চারদলের বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে। দলমাত্রিক ছন্দের প্রচলিত নাম লৌকিক ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ। 'ছড়ার ছন্দ' নামে এ ছন্দের চটুলতার কথাই চট্ করে মনে পড়ে। কিন্তু সত্যেন্দ্র-কাব্যে

দলমাত্রিক ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এ ছন্দ যে কেবল 'পাল্কীর গান', 'ইল্‌শেগুঁড়ি' প্রভৃতি চটুল কবিতার বাহন হতে পারে তা নয়। সত্যেন্দ্রনাথের দলমাত্রিক ছন্দের কবিতায় তিনটি ধরণ দেখা যায়—চটুল বা ঝোঁকপ্রধান, সুরপ্রধান এবং গম্ভীরভাব প্রকাশক। চটুল ছন্দের কবিতায় কবি কাজের ছন্দ, চলার ছন্দ এবং আনন্দের উল্লাস ধ্বনিত করে তুলেছেন। 'চর্‌কার গানে' (বিদায়-আরতি) চর্‌কাকাটার ছন্দ ধরা পড়েছে। 'পিয়ানোর গানে'র ছন্দে পিয়ানোর সুর ফোটানর চেষ্টা হয়েছে। পাল্কীর গানে' বেহারাদের 'দুল্‌কি চাল'কে ধরেছেন কবি। 'ইল্‌শে-গুঁড়ি' বৃষ্টিতে বালকদের মনে যে উল্লাস জাগে তার প্রতিধ্বনি রয়েছে 'ইল্‌শেগুঁড়ি' (অভ্র-আবীর) কবিতায়। তাঁর বাৎসল্যরসের অনুবাদ কবিতাগুলিতে প্রায়ই ছেলে ভুলানো ছড়ার সুর পাওয়া যায়। সুর-প্রধান ছন্দের উদাহরণ 'দুর্ভিক্ষে' (কুহু ও কেকা), 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ' (অভ্র-আবীর), 'তিলক' (বিদায়-আরতি) প্রভৃতি অনেক স্থানে আছে। 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ' থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি,

'এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন কুলাবে;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।'

গম্ভীর ভাবের প্রকাশ ঘটেছে 'কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি' (বিদায়-আরতি), 'সরযূ' (বেলা শেষের গান), 'ইচ্ছামুক্তি' (বেলা শেষের গান), 'কবির তিরোধান' (বেলা শেষের গান), 'ফরিয়াদ' (বেলা শেষের গান), 'কাঠ-গড়া' (বেলা শেষের গান) ইত্যাদি কবিতায়। এই ধরণের কবিতার অনেকগুলিতে প্রবহমানতা আছে। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা যাক,

'কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এঁটে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে?
মুক্তপুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হ'য়ে আছে;

'মুক্ত হবই !' একথা যে বল্‌তে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাদের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।'
('ইচ্ছামুক্তি')

সত্যেন্দ্রনাথের দলমাত্রিক লঘুপয়ারের দৃষ্টান্ত 'বুদ্ধবরণ' কবিতা (বেলা শেষের গান),

'নেই বালিকা উপাসিকা ; আমরা তারি হ'য়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে ;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে !'

দলমাত্রিক দীর্ঘপয়ারে লেখা 'সরযূ' (বেলা শেষের গান),

'স্তন্যে তোমার পুষ্ট হল দিগ্বিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা,
সুহ্ম-মগধ-পাণ্ড্য-কেরল-হূণ-পারসিক-যবন-দর্পহারী ;
ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের ; সরিৎস্রোতে সাগর-ঢেউয়ের ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে বারম্বারই
পীযূষ দানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই জৈত্র-ধনুর্ধারী।'

উদ্ধৃতিটির ছন্দে প্রবহমানতা লক্ষ্যণীয়। দলমাত্রিক ছন্দের কবিতায় পংক্তি-সজ্জার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় 'বাসন্তিকা' (মণি-মঞ্জুষা), 'বিরহে' (মণি-মঞ্জুষা)- 'জর্দ্দাপরী' (অভ্র-আবীর) প্রভৃতি কবিতায়। ভাবের পরিবর্তন বোঝাতে একই ছন্দের খণ্ড পর্বে দলবিন্যাসের ব্যতিক্রম সৃষ্টির উদাহরণ আছে 'স্কন্দ-ধাত্রী' কবিতায় (বিদায়-আরতি)। প্রথম দিকে কাহিনী বর্ণনায় তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং একদলের অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হচ্ছিল। যেই ছেলে ভুলানর প্রসঙ্গ এলো অমনি অপূর্ণ পর্বে আরও দুটি দল যুক্ত হল। এতে যে সুরের কী পরিমাণ পার্থক্য ঘটেছে, উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে।

'আর কেন বোন্ বর্ষয়ন্তী আর কেন বিমন ?
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমার ষড়ানন !'

ইত্যাদির পরে,

'ছয় জননী স্তন্য পিয়াই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে।'

ভাবের ব্যতিক্রম বোঝাতে একই ছন্দের পর্ব বা দলবিন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টির কথা বলা হল। ঐ একই উদ্দেশ্যে এক কবিতায় প্রয়োজন মত বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশও সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। কুহু ও কেকার 'পাল্কীর গান' কবিতাটি প্রধানতঃ দলমাত্রিক ছন্দে লেখা। কিন্তু শেষদিকে বেহারাদের ক্লান্তির সুর ফোটানর প্রয়োজনে সরল কলা-মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার হয়েছে।

'গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে।
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।'

তারপর,

'পাল্কী চলেরে !
অঙ্গ ঢলেরে !
আর দেরী কত ?
আরো কত দূর ?'
ইত্যাদি

বিদায়-আরতির 'দূরের পাল্লা'তেও নৌকার চলার বিচিত্র ছন্দ অনুযায়ী বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। একই কবিতায় এরকম নানা পদ্ধতির ছন্দের সমাবেশ সাধারণতঃ দেখা যায় না। বেণু ও বীণার 'সহমরণ' কবিতাটির প্রথম ভাগ দলমাত্রিকে লেখা, শেষাংশ সরল কলামাত্রিকে। এ কবিতার চাইতে পরবর্তীকালের ছন্দ-পরিবর্তন অনেক বেশী শিল্প-সম্মত। বেণু ও বীণা, তীর্থরেণু, ফুলের ফসল প্রভৃতি প্রথমদিকের গ্রন্থের কবিতাগুলি লিখবার সময় সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-বোধ নিখুঁত ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'একদিন-না-একদিন' (বেণু ও বীণা), 'শিশুর আশ্রয়' (বেণু ও বীণা), 'দুঃখকামার' (তীর্থরেণু) ইত্যাদি কবিতায়। ফুলের ফসল এবং অন্যান্য গ্রন্থের গানগুলির ছন্দোবন্ধ

প্রায়ই শিথিল। গানে যে সব ফাঁক সুর দিয়ে ভরাট করে নেওয়া যায়, কবিতায় তার সুযোগ থাকে না বলে এরকম 'গান' কবিতার ছন্দে শৈথিল্য দেখা দেয়। কাঁচা হাতের ছন্দের ত্রুটির আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া নিরর্থক। পরবর্তী জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দবোধের চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। স্বরবৃত্ত ছন্দে যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তা তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন। তাঁর সাধনায় বাংলা কবিতায় স্বরবৃত্ত ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষার পথ খুলে গেছে। বাংলা ছন্দ শিল্পে সত্যেন্দ্রনাথের দান অবিস্মরণীয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান

ক—অগ্রজ কবিগণ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র-মণ্ডলী

অগ্রজ কবিগণ—

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর অগ্রজ কবিদের মধ্যে যাঁদের কথা বলতে হয়, তাঁদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রও রয়েছেন। সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' ২য় খণ্ডে 'বিবিধ' প্রসঙ্গে সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী ও উর্দু মিশান ভাষায় একটি কবিতা (পৃ-৩২১) আছে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'জবান-পঁচিশী' (হসন্তিকা)-তে উনত্রিশটি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এই কৌতুক কবিতাটি রচনা করবার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের ঐ সরস কবিতাটি থেকেই। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের মত সত্যেন্দ্র-কাব্যেও 'যাবনী মিশাল' ভাষার ব্যবহার আছে।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের সাময়িক কবি হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাময়িক বিষয়ের উপরে কবিতা লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথে এই ধারাটি পুষ্ট হয়। এই কবির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ এই সাময়িক কবিতাগুলি। এগুলিতে জনমনের খোরাক থাকত প্রচুর। চারণ কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের নাম চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের আরও সম্পর্ক ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর-গুপ্তের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের 'বাকৃচাতুরী ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,

'এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি যেন তাঁহার, কবি-স্বভাব অপেক্ষা জাতি-স্বভাবের মূলগত বলিয়া মনে হয়। এখানে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখ কবি, ও কবিওয়ালাগণের বংশধর;—অথবা, আরও প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়দেশের বাঙালী সমাজে যে একপ্রকার চটুল ও মুখর রসিকতা ভাষার সাহায্যে বড় উপভোগ্য হইয়া আসিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ সেই সমাজ ও সেই ভাষার কবি হিসাবে, সেই রসিকতাই যেন সহজাত শক্তির মত লাভ করিয়াছিলেন।'

(আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' পৃ-২১৭)

সত্যেন্দ্রনাথ রঙ্গলাল প্রমুখ কবিদের মত দেশের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই সব দিক্ থেকে তিনি ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতির উত্তর-সাধক।

প্রথম অধ্যায়ের 'সাহিত্যিক পরিবেশ' অনুচ্ছেদে সত্যেন্দ্রনাথের অগ্রজ আরও কয়েকজন কবির উল্লেখ আছে। তাতে বিহারীলালের পরবর্তী কয়েকজন কবি—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি দিকের তুলনা-মূলক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সত্যেন্দ্র-কাব্যে হাস্যরস' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বলেছি। এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ঋণী, একথা স্বীকার করতে হবে। স্বদেশপ্রেম-মূলক কবিতার ক্ষেত্রে এই দুই কবির কৃতিত্ব বলতে গেলে সমান। দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ', 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' ইত্যাদি যেমন দেশবাসীর হৃদয় আলোড়িত করেছিল,—সত্যেন্দ্রনাথের 'মধুর চেয়েও আছে মধুর সে এই আমার দেশের মাটি' এবং 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' ইত্যাদি গানও তেমনি বাঙালীর প্রাণের মূলে নাড়া দিয়েছিল। এই গানগুলি বাঙালী জাতির চিরন্তন আদরের সামগ্রী। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' ইত্যাদি গানটির মূলে সত্যেন্দ্রনাথের 'কোন্ দেশেতে তরুলতা' গানটির প্রেরণা আছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন (দ্রষ্টব্য—'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ', প্রবাসী ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ-১৫২)। ছন্দকীর্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশিষ্টতর। নানা কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের চাইতে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-কীর্তি সার্থকতর বলে পরিগণিত হয়েছে। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যেন্দ্রনাথের মত রসের সন্ধান পাননি। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে 'মৌলিকতার বেগ' ছিল, কিন্তু তাঁর রচনা সর্ব্বদা শিল্পোত্তীর্ণ হতনা। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ কীর্তি বাংলা

সাহিত্যের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মত করে বাঙালীর প্রাণকে ছন্দের সুরে মাতিয়ে তুলতে পারেননি।

'সাহিত্যিক পরিবেশে' (প্রথম অধ্যায়) সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের কথা বলা হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)-কার সুকুমার সেন বলেন—সতীশচন্দ্রের গাথা কবিতা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ গাথা কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা পান।

অগ্রজ কবিদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,

'......জগতের সকল পূর্ব্ব কবি ও মনীষীগণের সাক্ষ্য, এবং পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ তাঁহার ধারণা ও কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট ভাবমার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ......তিনি বর্ত্তমানের মধ্যে যে ভবিষ্যতের আশার আলো দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন, তাহাতে আধুনিক প্রগতিবাদীর নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন ছিল না। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী যে নব জাগরণ আনিয়াছিল—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি ও মনীষী তাহার যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই সাধন ক্ষেত্রের একপ্রান্তে সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কর্ষিত হইয়াছিল, তিনিও সেই বাংলার সেই নব্যসংস্কৃতির পতাকা বহন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহার প্রথম ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিয়াছিল, একদিকে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং অপরদিকে 'আলাল' ও 'হুতোমে' যাহা দ্বন্দ্ব সংশয় ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু বিদ্যা ও কবিত্বের দোটানায় পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ, হেম, নবীন প্রভৃতির কাব্য-সাধনায় যাহা ভাব ও কল্পনার সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই—এবং একমাত্র বঙ্কিম মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিভায় যাহা একটি সুসম্পূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছিল—সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই মূল প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের ভাবনা কামনা ও সাধনাকে কল্পনার তুঙ্গ শিখর হইতে সাধারণের সমতল মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।'

(আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', পৃ-২০৩-২০৪)

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ—

সত্যেন্দ্রনাথ যে সময়ে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তার বেশ আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেখানে একাধিপত্য করছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুগামী এই কবি আপন বৈশিষ্ট্যে তারই মধ্যে নিজের একটি আসন তৈরী করে নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লেখেন, তাতে তিনি বলেছিলেন,

'ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।'

(পূরবী, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত')

রবীন্দ্রনাথ এই কবির বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নানা উপলক্ষ্যে বহুবার তিনি সত্যেন্দ্র-প্রতিভার প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে কিছুমাত্র বিনয় না করেও বলা যায়, ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের দখল ছিল তাঁর চাইতে অনেক বেশী (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩২৯ আষাঢ় ২২, বুধবার)। সত্যি সত্যি নানারকম শব্দের সংগ্রহ এবং ভাষার ভাব-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল অসামান্য। ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। এই দুই কবির প্রধান পার্থক্য ছিল তাঁদের প্রকৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে যে কোন ব্যাপারে অত্যন্ত গভীর দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হতেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে সাধারণতঃ তার বাহ্যরূপটির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন, তার থেকে ব্যাপক বা গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন হতেন না। আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে সতেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,

'ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এজনা একবারেই,
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তা নেই'

(অভ্র-আবীর, 'অঞ্জলি')

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্যের উপাসক। প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনাবিলাস করেছেন অনেক, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানবের গূঢ় সম্পর্ক বা ঐ ধরণের কোন তত্ত্ব তাঁর চিত্তকে বিশেষ অধিকার করেনি। সত্যেন্দ্রনাথের সাময়িক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ বিষয়ক কবিতার তুলনা করলেও এই পার্থক্য ধরা পড়বে। সত্যেন্দ্রনাথ ঘটনাগুলিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে সেই যুগে তার প্রভাব এবং ফলাফলের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর রবীন্দ্রনাথ অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সেই সব ঘটনার সম্পর্ক সন্ধান করে অনন্তকালের উপরে তার প্রভাব কতখানি অর্থাৎ তার নিত্যফল কি, সেই সব বিষয়ে চিন্তা করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি বাস্তবের ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবতার আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় দান করে। সত্যেন্দ্রনাথের 'ইজ্জতের জন্য', 'বন্যাদায়' ইত্যাদি কবিতার কাব্যমূল্য নগণ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা), 'প্রশ্ন' (পরিশেষ) ইত্যাদি কবিতা পাঠ করে পাঠকচিত্ত কাব্যরসে অভিষিক্ত হয়। তবে সত্যেন্দ্রনাথের,

'লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা'

বা,

'হেথায় কুবের ফুলিছে কাঁপিছে, ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী।'

(হোমশিখা, 'সাম্য-সাম')

ইত্যাদি পংক্তির মত রবীন্দ্রনাথের,

'স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার'

(চিত্রা, 'এবার ফিরাও মোরে')

বা,

'দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥'

* (গীতাঞ্জলি, 'অপমান')

ইত্যাদি পংক্তিতেও তীব্রতা আছে। তবু রবীন্দ্রনাথের অস্ত্র সত্যেন্দ্রনাথের মত তীক্ষ্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথের ভাবাবেগ নেই, ভাষায় ভাবের আচ্ছন্নতাও নেই।

'কাব্যলক্ষ্মী' কল্পনায় উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা 'বিবিধ' প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায়) বলা হয়েছে।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের কয়েকটি প্রধান ভাবধারা—যেমন, মানব-প্রেম, জ্ঞানের সাধনা ইত্যাদি রবীন্দ্র-কাব্যেও আছে। এঁরা উভয়েই সকল গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষে মানুষে মহামিলন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতি এঁরা ছিলেন খড়্গহস্ত। উভয়েই বিশ্বাস করতেন জ্ঞানের আলোকে সকল মোহ দূর করা প্রয়োজন—তারই মধ্য দিয়ে সকল ঈপ্সিত ধন লাভ করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন কাব্য-জীবনের প্রারম্ভে সকল জ্ঞানের আধার হিসেবে 'সবিতা'র বন্দনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বহুবার জ্ঞান-সূর্যের বন্দনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'সাবিত্রী' (পূরবী) কবিতাটি স্মরণীয়। বিজ্ঞানের সাধনাকে এঁরা উভয়েই বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। মিথ্যা ধর্মের প্রতি এঁদের কোন মোহ ছিলনা—ধর্মের মূল কথাটি এঁরা মনেপ্রাণে ধরতে পেরেছিলেন। ঐতিহ্য স্মরণের প্রয়োজন এঁদের কাছে অনেক বড় বলে গণ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দু'জনেই গুণের পূজা করতে জানতেন। চারিত্র-পূজারি হিসেবে এঁদের ঐক্য আছে। তাঁরা দু'জনেই স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমে লীন হয়নি। পরবর্তী কবি স্বদেশকেই বড় করে

দেখেছেন, বিশ্বের দিকে চাইবার বিশেষ অবকাশ তাঁর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্য ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়—কাহিনীকাব্য রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ জাতীয় জাগরণের কথা ভেবে ভারতের অতীতকে স্মরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্য রচনার পিছনে ঐরকম কোন চিন্তা ছিলনা। তাঁর প্রধান কাজ ছিল কাহিনীরস সৃজন। অবশ্য আপন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের দরুণ কাব্যের বিষয়বস্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে মানবতার জয়গান বা সত্যের জয়মূলক। এসব কবিতায় তাঁর চরিত্রাঙ্কন নৈপুণ্য চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতা সম্বন্ধে নানা আপত্তি আছে। সে-সব আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি অনবদ্য। তাতে শিশুর চিন্তায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই—ভাষায় পাণ্ডিত্যত নয়ই বয়স্কব্যক্তির ভাষার ছাপও তাতে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথের শিশু দার্শনিক নয়। সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান্ সম্পদ। রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিহাস বিষয়ে লেখা কবিতা পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই বিষয়ের কবিতার সঙ্গে তার প্রভেদ অনেক। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে ঐতিহাসিক তথ্যেরই যে এক বিশেষ রস পাওয়া যায়, তা সে যুগের আর কোন কবির লেখাতেই পাওয়া যায়নি। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ অনন্য।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আগেও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর প্রেম ও মৃত্যু-বিষয়ক ধারণা মোটামুটি-ভাবে রবীন্দ্র-দর্শনের আওতার মধ্যেই পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথের হাস্য-রসের কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছি। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি 'কণিকা' জাতীয় কবিতা রচনা করেছিলেন, সেগুলি প্রধানতঃ ছিল নীতিমূলক। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথেরও বাউল কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল। কাব্যের বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয়ের কাব্যে সাধর্ম্য আছে। সত্যেন্দ্রনাথের যে-সব কবিতার ভাব বা

ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মিল দেখা যায় সেগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সমগ্র প্রবন্ধে একবারও এই তুলনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়নি, এমন কবিতার কথাই এখানে বলব। নিস্তব্ধ পরিবেশে প্রকৃতির পরিচর্যায় কবি-মনে যে-সব ভাবের উদয় হয়, তার অনেক বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' গ্রন্থের একটি কবিতায় সেই ধরণের বর্ণনা রয়েছে,

'অর্দ্ধরাতে,—বর্ত্তি নির্ব্বাপিত,
ঘুমে যবে অচেতন সবে,
তুমি মোর ঘুম দাও নয়ন-পল্লবে ;
কোলে ল'য়ে আহ্লাদে আকুল,
চোখে মুখে পড়ে কাল চুল।
অন্ধকারে তন্দ্রা আসে ঘিরে,
কত দেখি বিচিত্র স্বপন,
মনে হয় তোর দেহে ফিরে
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,—
তোর ক্ষেতে, গাছে, মেঘে, এই তনু মন ;—
শস্যে মিশি কখন শিশুতে,
স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে।
গন্ধ হ'য়ে রহিগো কুসুমে,
রস হ'য়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হ'য়ে মেঘে, ধূমে,
জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে,
শব্দরূপে পিককণ্ঠে,—নির্ঝরের জলে।
তনু মন প্রাণ মিশে যায়,
একে একে পৃথ্বী তোর কায় !'

('সর্ব্বংসহা')

সত্যেন্দ্রনাথের 'চূড়ামণি' (কুহু ও কেকা) কবিতার 'শক, হুণ, মোগল, পাঠান কতশত……' রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'র 'শক, হুণদল, পাঠান,

মোগল……' স্মরণ করিয়ে দেয়। বেলা শেষের গানের 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা' রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র ভাবে ভরা। উদ্ধৃতি দিলে স্পষ্ট হবে,

'মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগহে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।

*   *   *

হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥'

আরও আছে 'করুণা-সিন্ধু হে', 'হিংসানাগিনী' ইত্যাদি বাক্যাংশের ব্যবহার। সে যুগের অন্য কবিদের উপর রবীন্দ্র-প্রভাবের তুলনায়, সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুসরণ নিতান্ত নগণ্য।

সত্যেন্দ্র-মণ্ডলী—

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও সে যুগের ছোট বড় প্রায় সকল কবির উপরই অল্প-বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছিলেন। তাঁর এই দুরতিক্রম্য প্রভাব থেকে তাঁর বর্তমান বিরুদ্ধ সমালোচক দিলীপকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতিও মুক্ত থাকতে পারেননি। এই প্রবল প্রভাবের অন্যতম কারণ তাঁর ছন্দ-শিল্প। সত্যেন্দ্রনাথের আগেও বাংলা সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্য সে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ছন্দের দৌর্বল্য সে সময়ে কেটে গিয়েছিল, তার সুষমার চর্চা চলেছিল বাংলার কাব্যসাহিত্য জুড়ে। সে যুগের পত্র-পত্রিকাগুলিতে তখন যে-সব কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল, তার অধিকাংশই ছিল ছন্দের কারিগরিতে ভরা। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দানুসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাক,

'অঞ্জন
গঞ্জন
অম্বর গাত্রে
অভ্রের
আল্‌পন্‌
অঙ্কন রাত্রে।'

('শরচ্ছবি', শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
'প্রবাসী' ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ-৬০০)

'অচপল
নয়নের
ওই মধু দৃষ্টি,
উড়ো মেঘ
করে যায়
রামধনু সৃষ্টি।'

('চঞ্চলের জয়যাত্রা', কুমুদ রঞ্জন মল্লিক,
'প্রবাসী' ১৩২৮ ভাদ্র, পৃ-৭৩৪)

আরও,

ঋতুসংহার—

গ্রীষ্ম

'ভারীরোদ, 'কড়্-কড়্',
ভাঙাডাল, 'মড়্-মড়্',
ইত্যাদি

বর্ষা

'আকাশ-জোড়া মেঘ,
ভূতল-ভরা জল,
কদম ফুল-বাস,
ব্যাঙের কোলাহল।'
ইত্যাদি

শরৎ

'বাপ-মার বউ-ঝির
অন্তর অস্থির !'

ইত্যাদি

হেমন্ত

'শিউলি-ঝরণ, মধুর তপন,
সবুজ শোভা, সুনীল গগন'

ইত্যাদি

শীত

'পাকা ধানের গন্ধ মিঠে,
নানান্ বাড়ীর নানান্ পিঠে'

ইত্যাদি

বসন্ত

'মুহুর্মুহু 'কুহু-কুহু'
পরাণ-চাওয়া 'উহু-উহু'

ইত্যাদি

(শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ-৬০৬)

সখি 'পাতিস্‌নে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিস্‌নে গোলাব-ছিটে খাস্ লো মাথা !
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কম্‌লি মালা—
সখি দিস্‌নে লো দিস্‌নে লো, বড় সে জ্বালা !'

('ফাল্গুনী', কাজী নজরুল ইস্‌লাম, সঞ্চিতা)

ছন্দের এই চটুলতাই শুধু নয় সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদও শুরু হয়েছিল তাঁর আদর্শের অনুসরণে। কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'ছায়ানট' গ্রন্থে শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত একটি কবিতা পাওয়া যায়। তার

ভাষার সঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথের ঐ ছন্দে লেখা 'বিদ্যুৎবিলাস' (বেলা শেষের গান) কবিতার ভাষার মিল আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে যে সব কবিতা রচিত হয়, তার একটি ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দে ('ভারতী' ১৩১৯ শ্রাবণ, পৃ-৩১৬), রচয়িতা শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। 'অনামী' গ্রন্থের পত্রগুচ্ছে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বলেছেন,

'একসময় ছিল যখন সত্যেন্দ্রনাথের "ছন্দের টুংটাং" আমার ভালোই লাগত।'

(শ্রীঅরবিন্দকে লেখা পত্র)

'আমি সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-নৈপুণ্যেরও গুণগ্রহণের বিরোধী নই। তাঁর ভাব না থাকুক ছন্দের গঠন-নৈপুণ্য ছিল অসামান্য। ছন্দের নানা ধ্বনি-সমাবেশ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর নানা এক্সপেরিমেণ্ট থেকে অনেক শিখেছিও আমি নানা সময়ে—যে জন্য সকৃতজ্ঞে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করব বরাবরই।'

(কল্পনা কুমারকে লেখা পত্র)

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-ঝঙ্কার ছিল সুস্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দানুসরণ—মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ আরও অনেক কবির কবিতাতেই দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যে-সব কবি তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের সকলেই কিঞ্চিদধিক সত্যেন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা বা ছন্দের অনুসারী ছিলেন। শিশুকবিতা রচয়িতা সুকুমার রায়ের ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের অনুরূপ ছিল। এঁদের কেউ কাউকে প্রভাবিত করেছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা শক্ত। এঁরা প্রায় সমসাময়িক কবি। গোলাম মোস্তাফা সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কীর-গানে'র অনুসরণে 'পাল্কী চলেরে' লিখেছিলেন ('প্রবাসী' ১৩২৯ পৌষ, পৃ-৩৯৯)। কবিতার শিরোনামার নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল '(বেহারাদের পাল্‌কি-গানের ছন্দ)'। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়

পাল্কীচলার ঠিক ছন্দটি পরিস্ফুট হয়নি, এই ধারণায় তিনি এই কবিতা লেখেন।* কবিতার মিল, চিত্র ইত্যাদি সব সত্যেন্দ্রনাথের কবিতারই অনুরূপ।

দেশ স্বাধীন হবার পরে (সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ২৫ বৎসর পর) আনন্দোদ্বেলিত বাঙালী যে গান রচনা করেছে তাতেও সত্যেন্দ্রনাথের 'কোন্ দেশেতে তরুলতা'র সুরই প্রধান,

'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা
দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান ?
পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান, সে পাকিস্তান।'

সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব যে কিরকম সুদূরপ্রসারী, তার প্রমাণ এইখানে।

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির কবিতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যাত্মক কবিতার সাধর্ম্য আছে। এঁরা পরস্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ 'নেই-ঘরের ঘুমপাড়ানি'তে লোক-প্রচলিত ছড়া গেঁথে গেঁথে কবিতার ছড়া ভাবকে স্ফুটতর করেছিলেন,

'ঢেঁকীর গড়ের পাড় ধ্বসেছে নিকিয়ে রাখিস্ বউ
আতাগাছের তোতাপাখী ডালিম গাছের মউ।'

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতির ছড়াজাতীয় কবিতাতে সেই বিষয়ের অনুস্মৃতি দেখা যাবে যেমন,

'কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গালি
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে সংসার হাসালি।'

(উড়কি ধানের মুড়কি, বঙ্গদর্শন)

বা,

'আগডুমরে বাগডুমরে সাজলোরে ঘোড়াডুম ঘোড়াডুম।
সাজলোরে বাজলোরে ঢাক তাক তাক ডুমাডুম ডুমাডুম।'

(ঐ, আটামর হামলা)

এই ধরণটি বর্ত্তমানে সুপ্রচলিত।

---

* সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বেহারাদের দুল্‌কি চালের ছন্দটাই ফোটাতে চেয়েছিলেন। তাতে কোন ত্রুটি নেই।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ দেখা যায় সব চাইতে বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দই শুধু নয়, ভাব ও ভাষাও তাঁর কাব্যে গভীর ছায়া ফেলেছে। সত্যেন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইস্‌লামই চারণ-কবির পদ পূরণ করেছিলেন। জাগরণের বাণী এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর লেখনীর মুখে স্ফূর্ত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের মতই ইনিও সাম্যের গানে দশদিক্ পূর্ণ করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবপ্রেমের বাণী তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। সর্বহারাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর 'অগ্নিবীণা' ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বিদ্রোহের সুর ভাবের আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল, সত্যেন্দ্রনাথ তাকে বাস্তবে নিয়ে এসেছিলেন। নজরুল তাকে আরও স্পষ্ট করে সর্বজনের হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁর বিদ্রোহের সুর সত্যেন্দ্রনাথের চাইতে প্রবলতর। এক্ষেত্রে যেমন, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথও নজরুলের মধ্যবর্তী সেতু-স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের ভাষা সত্যেন্দ্রনাথের হাতে সরল ও ঘরোয়া হয়ে না উঠলে, নজরুলের কাব্যে তা এতখানি স্বাভাবিক হতে পারত না। নজরুলের কবিতায় অনুপ্রাস এবং শব্দের খেলা সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং শব্দক্রীড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দব্যবহারে যে সাহস দেখা যায়, তার প্রেরণা সত্যেন্দ্র-কাব্যের আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। সত্যেন্দ্রনাথের আগেও বাংলা ভাষায় ঐসব শব্দ ব্যবহার হত, কিন্তু এরকম নিঃসঙ্কোচবহুল ব্যবহার এর আগে দেখা যায়নি। মোহিতলাল মজুমদারও এঁদের অনুসরণে তাঁর কবিতায় 'যাবনীমিশাল' ভাষা ব্যবহার করেছেন।

খ—সত্যেন্দ্র-কাব্যের মূল্যবিচার

রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন,

'তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।'

(পূরবী, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত')

এই তন্ত্রটি কি সুরে বাঁধা ছিল সেটি সন্ধানের বিষয়। সত্যেন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে প্রধানতঃ অবাস্তব কল্পনার চর্চা চলছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে যাওয়ায় ঐপথে আর কোন নতুন সম্ভাবনা ছিলনা। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন রচনায় কাব্যের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। এ পথে সাহিত্যে বাস্তবতার অবতারণা হচ্ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনা সাহিত্যের এই পথটিকে পাকা করে দিল। এঁদের সাধনায় যে নবযুগের সৃষ্টি হল, তাতে মানুষের জীবনের সকল সুখ-দুঃখের কথাই সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও যে এসব কথা ছিলনা তা নয়, কিন্তু এই কবি সাধারণ মানুষের মত জীবনের খণ্ড সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখতেন না। তাঁর কাছে সকল ঘটনা মহৎ কোন ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে দেখা দিত। তাই মহৎভাবের আবরণে জীবনের সুখ-দুঃখ হয়ে যেত তুচ্ছ। সাধারণের মনের সঙ্গে এর যোগ ছিল কম। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাব্যে মানুষের নানা সমস্যার কথা প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হল। সাধারণ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটল। সাহিত্যের নতুন পথ গেল খুলে। নবযুগের অন্যতম প্রধান এবং প্রথম কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের মূল্য অনেক।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মানবের সুখ-দুঃখকে কবি যেভাবে অনুভব করেছেন তারই প্রকাশ প্রধানতঃ দেখতে পাওয়া যায়। এতে গীতি-কবিসুলভ আত্মগত কল্পনার উচ্ছ্বাস নেই। তাঁর কবি-প্রকৃতির এই দিকটি ক্লাসিকধর্মী। সত্যেন্দ্রনাথের বাস্তবতা এবং 'সমাজধর্ম্মনিষ্ঠা'কেই

এর 'মূল প্রেরণা' বলেছেন মোহিতলাল। সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা এইখানে। সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির অধিকাংশেই তাঁর ক্লাসিক কবি-ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই কবিতাগুলির আরেক বৈশিষ্ট্য, এগুলি গদ্যধর্মী। এইজন্য কোন কোন সমালোচক বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা 'ছন্দোবদ্ধ' বক্তব্য—এসব কথা গদ্যেই প্রকাশ করা চলত। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার যা বলেছেন, তা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ঐ অভিযোগের জবাবরূপে সে কথা উদ্ধৃত করা যায়।

('সত্যেন্দ্রনাথের রচনার······ভাববস্তু—খাঁটি কল্পনাও নহেই, অনেক স্থলে বুদ্ধি, বিদ্যা, ভাবনা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল। বস্তু এবং চিন্তা উভয়ের সম্পর্কেই তাঁহার একপ্রকার ভাবগ্রাহিতা ছিল—ভাববিলাসও ছিল, তাহাকেই তিনি শব্দার্থের কৌশলে যেমন অর্থবান, তেমনই সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন; অনেক স্থলে ছন্দ বাদ দিলেও কেবল শব্দ ও ভাষার কারিগরিতে তাহা একধরণের রস-রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের······কবিতা এইরূপ গদ্যধর্মী হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু ইহাও সত্য যে ছন্দ তাঁহার রচনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কবি যে ছন্দের সাহায্য বিনা লিখিতেই পারিতেন না, ইহা নিশ্চিত। ইহার কারণ কি? ছন্দ তাঁহার ভাষার নিত্যসঙ্গী, এমনকি, সেই ভাষাকে শক্তি ও মূর্ত্তি দিয়াছে ঐ ছন্দ; তাঁহার সকল চিন্তা ও ভাববস্তুর মূলে নিশ্চয় এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বাক্যকে ছন্দের পক্ষযুক্ত করিতে হয়। এই বস্তুটি কি? কেবল জানা বা কেবল দেখা নয়—কেবল জিজ্ঞাসার যথোচিত জবাব পাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে যে তৃপ্তি ও যে আশ্বাস—প্রাণে যে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়, তাহাতেই বাণী এমন ছন্দোময় হইয়া উঠে, ভাষায় বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়। সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান-বুদ্ধির যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহার মূলেও একটা প্রবল আবেগ ছিল, সেই আবেগের বশেই মনের দীপ্তিকে তিনি ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। এইজন্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের একটা বিশেষ মূল্য আছে।'

(আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', পৃ-২২৫-২৬)

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির আরেকটি দিক্ ছিল। এই দিক্‌টিকে মোহিতলাল বলেছেন তাঁর 'কারুকল্পনা'। বলেছেন,

'ইহা খাঁটিকল্পনার রসাবেশ নয়—সজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারু-কুশলতা।'

(ঐ, পৃ-২১১)

এই কল্পনার প্রকাশ আছে 'বঙ্গজননী' (বেণু ও বীণা), 'মেঘলোকে' (কুহু ও কেকা), 'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি' (অভ্র-আবীর), 'পুরীর চিঠি' (ঐ), 'যুক্তবেণী' (বেলা শেষের গান) প্রভৃতি কবিতায়। একটু উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে,

'কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল্‌ঢল্ নয়ন যুগল জল ভরে পড়্‌ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?'

বাস্তববাদী হলেও সত্যেন্দ্রনাথের ভিতরে একটি কল্পনাপ্রবণ মনও ছিল। তাঁর অনেক কবিতায় অবাস্তব স্বপ্নলীলার পরিচয় রয়েছে। 'ফুলের ফসল' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই লীলার বিশেষ প্রকাশ আছে। এই গ্রন্থের প্রবেশক কবিতাটি লক্ষ্য করলে তাঁর কবি-প্রকৃতির এই দিক্‌টি ভালভাবে বোঝা যায়। তাতে তিনি অপ্সরীদের আহ্বান করে বলেছেন,

'পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লূতার সূতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয় !

* * *

'ঝুম্‌কো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক-পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে
স্বপ্ন শাসন মেল্‌বি আয় !

ক্লান্ত নয়ন পড়লে ঢুলে
ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে'

গোপন স্বপ্নরাজ্যের এই কল্পনায় কবির রোম্যাণ্টিক প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র সমুদ্রতলে বারুণীর পুরীর দৃশ্যে এইরকম কল্পনার আভাস আছে। বাংলা সাহিত্যে এইরকম কল্পনার প্রকাশ দুর্লভ। সত্যেন্দ্র-কাব্যে এই জিনিসটি খুব অপ্রধান নয়। তাঁর প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক প্রায় সব কবিতাতেই এইরকম রোম্যাণ্টিক কল্পনার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত কবিতাটিতে কবি আরও বলেছেন,

'ভ'রে দে এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়।'

এই সুরের মোহ কবিকে বাস্তব-জগৎ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেত। তাঁর রাগিণী-রাণীর বন্দনার কথা আগেও 'বিবিধ' পর্যায়ের 'প্রেরণাদাত্রী' আলোচনায় (দ্বিতীয় অধ্যায়) বলেছি। কবির সুর-সাধনায় অনুভূতির তীব্রতা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে চিন্তার গভীরতা নেই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে এর প্রভেদ স্পষ্ট। (এই কবির সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। সত্যেন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসনা করতে গিয়ে তার মধ্যে তত্ত্বের সন্ধান করতেন না। তুলি ধরে সুন্দরের প্রতিকৃতিটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন তিনি। এইজন্য তাঁর কাব্যে চিত্রের সমৃদ্ধি দেখা যায়। ছবি ও গান তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সত্যেন্দ্র-কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সত্যেন্দ্র-কাব্যে গভীরতা নেই। কোনো দেশের কাব্যেই সব সময় গভীর সুর ধ্বনিত হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ, দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলেই তাঁর সম্বন্ধে ওই প্রশ্ন উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সকলকে অভিভূত করলেও তার যথার্থ কারণ তাঁরা ধরতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নন বলেই, রবীন্দ্রনাথের, পর জন্মগ্রহণ করেও, বাংলা সাহিত্যে এতখানি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবে, এই প্রকৃতির ফলে কবি হিসেবে হয়তো তিনি অমরত্বের দাবী করতে পারেন না। এ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। 'গুঞ্জামালা' কবিতায় তিনি বলেছেন,

'নগর-জনারণ্যে আমার মন নিরালা
গুঞ্জনেরি গেঁথেছে এই গুঞ্জামালা;
আমি শুধু এনেছি তায় হিয়ায় বেঁধে,
দুঃখে সুখে অনেক হেসে অনেক কেঁদে।

গুঞ্জাফলে মিট্‌বেনা গো কারোই ক্ষুধা,
গুঞ্জনে মোর নাই স্বরগের নাই গো সুধা।
নাই ভ্রমরের ছন্দে গভীর তত্ত্বকথা,
গুঞ্জনে রয় কিছু যদি—সে মত্ততা।

গানের নেশা পায় যারে তার শান্তি ভারি;
ভুল্‌ব ভেবে ভুল করি, হায়, ভুল্‌তে নারি।
সকাল বেলার প্রতিজ্ঞা সে সাঁঝ না হ'তে
যায় ভেসে কোন্ গুঞ্জনেরি নূতন স্রোতে!

গুঞ্জাফলের খানিক রাঙা খানিক কালো,—
গুঞ্জনে মোর মিশিয়ে আছে মন্দ ভালো;
একলা লোকারণ্যে আমার মানস-বালা
গুঞ্জনেরি হার গেঁথেছে গুঞ্জামালা।'

('বিচিত্রা' ১৩৩৭ ভাদ্র, পৃ-২৮৫)

সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান-সাধনা তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। তিনি ব্যাপকভাবে ভারতীয় এবং বিশ্বসংস্কৃতির অনুশীলন করেছিলেন। জ্ঞানের চর্চাই আধুনিক বুদ্ধিনিষ্ঠ সাহিত্যের ভিত্তি। গদ্যসাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান সমর্থক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, পদ্যে

সত্যেন্দ্রনাথ। এদিক্ থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার অগ্রদূতদের অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। সাম্প্রতিক সাহিত্যে একমাত্র সুধীন দত্তের মধ্যেই তাঁর মত জ্ঞানচর্চার বিপুল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানের গভীরতা তাঁর কাব্যকে মর্যাদাবান্ করে তুলছে। আশা করা যায়, আধুনিক যুগের জ্ঞান সাধনার ফলে ভবিষ্যতে যখন আমাদের জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত হবে, তখন আমরা সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি করতে পারব। সেদিনই আমরা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের এক অংশকে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারব। পাশ্চাত্ত্যের কবি Huxley, Browning, Elliot প্রভৃতির কাব্য বুঝতে যেমন যথেষ্ট জ্ঞানের দরকার, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতেও তেমনি পাঠকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানী কবি পাঠকের জ্ঞানের সীমার কথা স্মরণ রেখে কবিতা রচনার সময় আপন জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেন না। এই সচেতনতা কবির ধর্ম নয়। কাজেই জ্ঞানের পরিচয়-ভরা কাব্য যদি দুর্বোধ্য মনে হয়, তার দায় জ্ঞানী কবিকে দেব, না স্বল্পজ্ঞান পাঠককে? সত্যেন্দ্রনাথের 'দিল্লীনামা', 'কবর-ই-নুরজাহান্', 'রাজবন্দিনী' প্রভৃতি কবিতার পূর্ণ রসগ্রহণ করতে হলে যেমন ইতিহাসের ভাল জ্ঞান থাকা চাই, রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতাগুলি বুঝতেও তেমনি সে যুগের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কবিতার সব বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পাণ্ডিত্যভার সম্বন্ধীয় অভিযোগ অনেকটা আমাদের জ্ঞানের অভাবের দরুণ। অবশ্য তাঁর কবিতার দু-এক স্থান থেকে পাণ্ডিত্যের অসঙ্গতির উদাহরণ তুলে দেওয়া হয়তো খুব অসম্ভব নয়। তবে এরকমভাবে ত্রুটি বিচার করবার চাইতে কবির গুণ গ্রহণ করতে পারলেই আমরা বেশী উপকৃত হব।

(সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল এমন এক পরিবেশে যা, ছিল স্বদেশী আন্দোলনে মুখর। এই অনুভূতি-প্রবণ কবি স্বদেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই সাময়িক যে কোন ঘটনা

তাঁর মনে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করত। এইজন্য সে যুগের সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধেই তিনি কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর এই অনুভূতি-প্রবণতা অনেকের কাছে 'হুজুগপ্রিয়তা' বা বালক-সুলভ 'অপরিণত' চরিত্রের লক্ষণ বলে গণ্য হয়েছে। তথাকথিত 'হুজুগ-প্রিয়তা'র অভিযোগ নজরুল সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে। নজরুল 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাতে এই অভিযোগের জবাবে যা বলেছেন—তা সত্যেন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎ হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। নজরুলের মত সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও স্বদেশ ও সমাজের দিক থেকে মন ফিরিয়ে রাখা ছিল অসম্ভব। তাই তাঁদের কৈফিয়ৎ,

'বন্ধু! তুমিত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল!'

(সর্ব্বহারা)

দেশের দুর্দশা তাঁদের অন্তরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল,

'বন্ধুগো আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারিনাত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড দুখে!'

(ঐ)

দেশবাসীর চেতনার উন্মেষ ঘটানর জন্য এইরকম চারণ কবির প্রয়োজন অসীম। এঁরা দেশকে পথ দেখিয়ে দেন, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। সাময়িক কবি বলে এঁদের তুচ্ছ করলে আমরা অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় দেব। এই রকমের অভিমতে 'বিচারসঙ্গত' 'শাস্ত্রশ্রী' নেই। সত্যেন্দ্রনাথের সাময়িক কবিতাগুলি দেশের প্রয়োজন মিটিয়েছিল। তবে, আগেও বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথ বাস্তবের ঘটনাকে

দূরে স্থাপন করে তার গভীর তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারতেন না। তাঁর এই ধরণের অধিকাংশ কবিতা তাই আমাদের মনকে বাস্তবের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে উচ্চ রসলোকের সন্ধান দিতে পারেনি।

সমগ্র দেশ যখন অসীম আগ্রহে সত্যেন্দ্রনাথের বাণী থেকে আশ্বাস ও উৎসাহ সংগ্রহ করছে এমন সময়েই এই সর্বপ্রিয় চারণ-কবির মৃত্যু চতুর্দিকে হাহাকার জাগিয়েছিল। এই কবির মৃত্যু যে অকাল-মৃত্যু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা পরিণত হবার অবকাশ পায়নি। তাঁর কবিতায় ভাবে ভাষায় যে তীব্রতা ছিল, তাকে অপরিপক্কতার অম্লত্ব বলা যায়। কালে এই অম্লত্ব মিষ্টত্বে পরিণত হতে পারত। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম জীবনের কবিতাতে বেশ তীব্রতা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের ভাবধারার আলোচনায় দেখা যায় তাঁর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল। (তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও অতুলনীয় শিল্পবোধ বাংলা-সাহিত্যকে আরও অনেক সমৃদ্ধ করে যেতে পারত। বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব প্রগাঢ়। সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি ছন্দের ঝোঁকে ভাবকে অগ্রাহ্য করেছেন, তাঁর কবিতায় ভাব নেই। তাঁর ছন্দ-ক্রীড়ার নিদর্শন 'পিয়ানোর গান', 'জাঁফরাণের ফুল', 'ঝর্ণার গান' 'চরকার গান' ইত্যাদি সকল কবিতা মন দিয়ে পড়লে দেখা যায়—প্রত্যেকটিতেই ভাবের সূত্র অটুট রয়েছে। ছন্দ-লীলায় মত্ত হয়েও কবি ভাব-সূত্র রক্ষা করে গেছেন। অথচ তাঁর ছন্দের মোহে আমরা এতখানি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে এই ভাব-সূত্রটি লক্ষ্য করতে পারি না। কিন্তু এর দায়ও কি কবির? সত্যেন্দ্রনাথের এইসব কবিতায় ভাব নেই, একথা সত্য নয়। তবে, যে ভাব আছে তা যে উচ্চভাব একথা বলা যায় না। ছন্দ-সৃষ্টির প্রেরণায় অতিতুচ্ছ ভাব-সূত্র নিয়েও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথেরও কতকগুলি কবিতায় ছন্দ-লীলার পরিচয় রয়েছে। 'বেঠিক্ পথের পথিক' তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই কবিতাটি প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময় পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শব্দের শেষে হসন্ত চিহ্ন

দেওয়া ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের ভাবের সমৃদ্ধির তুলনায় এ কবিতার ভাব নিতান্ত নগণ্য। সত্যেন্দ্রনাথেরও এই ধরণের কবিতার ছন্দ-মূল্য অপরিসীম হলেও ভাব সমৃদ্ধ নয়। (সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্যের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক—এই কবির ছন্দ-চর্চার পর বাঙালীর কোন ছন্দে এমন শিক্ষিত হয়ে উঠেছে যে সত্যেন্দ্র-পূর্ব ছন্দে আজ আর কারও রুচি নেই। ছন্দ-সৌন্দর্য্য কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে—পঙ্গু-ছন্দ এখন উচ্চসাহিত্যের বাহন হতে পারে না।) তাঁর ছন্দক্রীড়ার ভার নিয়েছেন শিশুকবিতার রচয়িতারা। নজরুল পর্যন্ত তাঁর ছন্দের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ, পরবর্তী কবিদের কাব্যে এই প্রভাব রয়েছে পরোক্ষ-ভাবে। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাভাষার খাঁটি রূপটিকে সাহিত্যিকভাষায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। তাঁর পন্থা অনুসরণে কবিরা সাহিত্যের ভাষাকে আরও সরল করে এনেছেন। এ সম্বন্ধে আগেও বলেছি। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ-কীর্তি সম্বন্ধে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,

('বাগর্থের নিপুণ যোজনা, ভাষার বৈভব ও ছন্দের বৈচিত্র্য, বাংলা সাহিত্যের যে অভাব পূরণ করিয়াছে তাহা আর কাহারও দ্বারা হইত না।'

(আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত')

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'অনুবাদক' আলোচনায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অনুবাদের সার্থকতা সম্বন্ধে এর চাইতে বড় প্রশংসা আর হতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রায় সকল দিকের নানা সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুবাদ-দক্ষতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। নানা সাহিত্যের বিচিত্র ধরণের কবিতার নিদর্শন বাংলা ভাষায় সংগৃহীত হওয়ায় আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির যে কতদূর সহায়তা হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদ কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর তান্‌কা ও পান্তম্‌ সম্বন্ধে 'সনেট রচয়িতা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতার মধ্যে 'খেলোয়াড়ের দল', 'ছিন্নমুকুল', প্রভৃতি কবিতার

নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ইতিহাস-রসের কবিতা 'দিল্লী-নামা', 'কবর-ই-নূরজাহান্' সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে 'কোন্ দেশে', 'মধুর চেয়েও আছে মধুর' প্রভৃতি অনেক কবিতার নাম করা যায়। মানবত্বের জয়গান সার্থকভাবে ধ্বনিত হয়েছে 'সাম্য-সাম', 'জাতির পাঁতি', 'নষ্টোদ্ধার' ইত্যাদি অনেক কবিতায়। তাঁর প্রায় সকল কাহিনী-কাব্যই বিশেষতঃ 'অনার্যা', 'সুশ্বেতা', 'দেবদাসী', 'শোভিকা, 'শবাসীন', 'যশ্মস্তু' প্রভৃতি সাহিত্যের আসরে চির-আদৃত হবার মত। হাস্যরসাত্মক কবিতাবলীর মধ্যে 'টিকিমঙ্গল' শ্রেষ্ঠ। 'বর্ষার মশা', 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ', 'সিগার-সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার মধ্যে 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা', 'বর্ষা-নিমন্ত্রণ' প্রভৃতি মূল্যবান্। 'ফুলের ফসলে'র প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক অনেক কবিতাই কল্পনাসৌন্দর্য্যে মনোরম। তাঁর চারিত্রপূজা বিষয়ক কবিতাগুলিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের গুণাবলীর বর্ণনা আছে, কিন্তু কোন কবিতাতেই কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে ফুটে ওঠেনি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সংখ্যায় অল্প নয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেক বিভাগের কবিতাতেই কয়েকটি করে উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে। কিন্তু রচনা সংখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা অল্প। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কবিদের কাব্যসাধনা চলে কাব্যরচনার মধ্য দিয়েই। কাজেই তাঁদের সব কবিতাই উচ্চ পর্যায়ের হবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল যা, তার মূল্য অনেক। সংখ্যার লঘুত্ব বা গুরুত্বে সেই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরচনাগুলি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে এই অধ্যায় সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলে নেওয়া যাক। এর আগে পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থখানিতে আমরা নানাভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনাই শুধু করেছি। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্য-কর্মের মধ্যে কবিকর্মকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। গদ্য-রচনার এই আলোচনাটিকেও পূর্ববর্তী আলোচনারই পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় কাব্যধর্ম ও গদ্যধর্ম এত মেশামেশি করে ছিল যে তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কবি হিসেবে তাঁকে সম্পূর্ণ জানাও অসম্ভব। সেইজন্য এখানে তাঁর গদ্য সাহিত্যের আলোচনাও সন্নিবেশ করা হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময়েই আমরা তাতে গদ্যধর্মী মননশীলতার পরিচয় পেয়েছি। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাতে যেমন—সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেও তেমনি 'পদ্যের rhyme' এর সঙ্গে 'গদ্যের reason'-এর মিশ্রণ ঘটেছে। *সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-ইতিহাসের আলোচনা-প্রধান কবিতাগুলিতেই এই মিশ্রণ সবচাইতে বেশী দেখা যায়। এই মননশীলতা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রশস্ত পথ পেয়েছিল।

গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের ভাষার কাঠিন্যের অনুসরণ করেননি। 'সবুজ পত্রে'র 'ভাষার মুক্তি' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাষা ও ভঙ্গি আজ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য রচনাতে সেই ভাষা ও ভঙ্গির প্রতিই তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষা ও ভঙ্গি সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, এক্ষেত্রে তিনি সর্বদা পুরোপুরি গদ্যধর্মী নন। এখানে তাঁর কবিধর্ম এসে মিশেছে গদ্যধর্মের সঙ্গে। এর প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে 'ছন্দ-সরস্বতী' ('ভারতী' ১৩১৫ বৈশাখ, পৃ-৪) প্রবন্ধে। অক্ষয়কুমার দত্তের ভঙ্গির সঙ্গে এ ভঙ্গির পার্থক্য অনেক।

---

* 'উৎসর্গপত্র'—'পদচারণ', প্রমথ চৌধুরী।

এবারে সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

ক—নাটক

১৩১৯ সালে 'রঙ্গমল্লী' নামে সত্যেন্দ্রনাথের একটি নাট্যানুবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নাট্যকাব্য কখানা ছাড়া 'সবুজ সমাধি', 'দৃষ্টিহারা' এবং 'নিদিধ্যাসন' সংকলিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের অন্যান্য নাট্যানুবাদ এখনও নানা পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে। 'প্রবাসী' ১৩২২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ-৬০৯) 'রাজা' নামে তাঁর একটি নাট্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। 'নাথু সর্দ্দার' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ সালের 'বিচিত্রা'তে (আশ্বিন, পৃ-৪২৮)। 'সবুজ সমাধি' নাটকটি সম্বন্ধে একজন সমালোচক (সমালোচনার শেষে নাম দেওয়া হয়নি) বলেছেন,

'চীনের "সবুজ সমাধি" নাটকখানি করুণ মর্ম্মস্পর্শী প্রণয়কাহিনী, প্রাচীন প্রথানুসারে গদ্যে পদ্যে লিখিত। ইহা অনুবাদ কুশলতায় আয়ুষ্মতীর পরেই [তৃতীয় অধ্যায়ে অনুবাদ কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে 'আয়ুষ্মতী' সম্বন্ধে এই সমালোচকের মত উদ্ধৃত হয়েছে।] স্থান পাইবার যোগ্য।'

('প্রবাসী' ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ-২৫০)

এই সমালোচক 'দৃষ্টিহারা' সম্বন্ধে বলেছিলেন,

'অনুবাদ কার্য্যটি······সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মূলের রস কোথাও ব্যাহত হয় নাই।'

(ঐ)

সত্যি সত্যি এই রূপক নাট্যখানি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই জাতীয় নাটক বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। 'নিদিধ্যাসন', 'রাজা' ও 'নাথু সর্দ্দার'ও অনুবাদের গুণে উপভোগ্য হয়েছে। ভাষার সহজতায় নাটকগুলি স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। অনুবাদে নাটকগুলির অভিনয়োপযোগিতা অক্ষুণ্ণ আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক 'ধূপের ধোঁয়ায়' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এটি দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান নিয়ে লেখা হাস্যমধুর মিলনান্ত নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি পৌরাণিক। কাহিনীতেও পৌরাণিক ঘটনার সূত্র রয়েছে। 'সীতা' 'উর্মিলা' প্রভৃতির কনিষ্ঠা 'শ্রুতকীর্তি'র দুর্জয় অভিমানই নাটকীয় রস জমিয়ে তুলেছে। রামায়ণের সীতার সঙ্গে 'সীতা' চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। নাটকের রহস্যমধুর পরিবেশে পতিব্রতা সীতার মধ্যে রঘুকুলের রাজ-বধূর যোগ্য গাম্ভীর্য বজায় আছে। ভগ্নীদের সঙ্গে সম্ভাষণের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠাভগিনীসুলভ স্নেহশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নকুলিকা', 'কুরঙ্গিকা', প্রভৃতির রসিকতা নাটকটিকে রসসমৃদ্ধ করেছে। নাটকখানিতে সঙ্গীতের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু বসন্তোৎসবের সমারোহ থাকাতে সঙ্গীতের আধিক্যকে বাহুল্য বলে মনে হয় না। বিষয় বস্তুর লঘুত্বের জন্যও বেশী পরিমাণে সঙ্গীত সন্নিবেশ অস্বাভাবিক হয়নি। 'ভারতী' ১৩২২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ-২০৫) 'তেহাই' নাটিকাটিও তাঁর মৌলিক রচনা। এই নাটকে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'হিংটিং ছট' ('সোনার তরী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কবিতার ভাবের মিল আছে। নাটকের শিরোনামার নীচে লেখা আছে,

(সাহিত্য-রসাশ্রিত দার্শনিক-দানাদার নাট্যরঙ্গ)

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র হচ্ছে 'আমি' অর্থাৎ অহং এবং 'মগজ', 'কাগজ', 'গজকাঠি', 'বর্গীয় জ, (ওরফে জগন্নাথ, ওরফে জগৎ-পিতামহ)', 'উড়ে পাণ্ডা', 'কামার', 'কুমার', 'দালাল', 'তাঁতি', 'ঢাকী', 'টিকৃটিকি', প্রভৃতি। রামধনুর সকল রং পৃথিবীতে কোন না কোন রূপে পাওয়া যায়, কিন্তু বেগুনী রং কিসে—এই অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়ে এই নাট্য বিষয়ের অবতারণা। নাটকের সব কথাবার্তাই অসংলগ্ন এবং অদ্ভুত। এই অসংলগ্নতার রসই নাটকের উপজীব্য। এতে জগৎপিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনায় অহংরূপী, মগজ, কাগজ ইত্যাদির সংলাপ অনেক ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। নাট্যকার অহংবোধ-

সম্পন্ন 'বুদ্ধির ঢেঁকি' এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কণ্টকিত কাগজ (সাধারণ লিখবার কাগজ এবং পত্র-পত্রিকা উভয় অর্থে) সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। এই হাস্যরসিক ব্যঙ্গপটু নাট্যকারকে 'হসন্তিকা'র কবি বলে চিনতে দেরী হয় না। 'ধূপের ধোঁয়ায়' এবং 'তেহাই' উভয় নাটকেরই অভিনয়সাফল্য অর্জনের গুণ আছে।

খ—উপন্যাস

সত্যেন্দ্রনাথের 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। এটি নরওয়ের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক 'Jonas Lie' এর 'Livsslaven' উপন্যাসের অনুবাদ। পাত্র-পাত্রীর সংলাপ অংশে খুব স্বাভাবিক চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদ, দেশজ শব্দ ইত্যাদির মিশ্রণে ভাষায় বাংলার খাঁটি সুরটি থাকায় উপন্যাসখানি মৌলিক উপন্যাসের মত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অংশ সাধুরীতিতে রচিত। সমালোচক 'শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা' এই গ্রন্থের সমালোচনায় ('ভারতী' ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ-৬৭০) বলেছেন যে এর 'বর্ণনাভঙ্গিতে বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য' আছে। পাত্র পাত্রী বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও লেখকের সহৃদয় পরিচর্যায় এরা সর্বদাই স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের গদ্যে এমন একটা ছন্দ ও সুর আছে যে পাঠকের কৌতূহল আগাগোড়া জাগ্রত থাকে। সুসমালোচক 'মুদ্রারাক্ষস'ও ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এই উপন্যাসের ভাষার প্রশংসা করেছেন। এই উপন্যাসটির উপজীব্য শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জীবন। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ের উপন্যাস সে সময়ে আর ছিল না। এই বিষয়ের উপন্যাসের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে নব আদর্শ স্থাপন করার দরুণ মুদ্রারাক্ষস সত্যেন্দ্রনাথকে সাধুবাদ দিয়ে বলেছেন,

'এইরূপ একখানি দরিদ্র জীবনের করুণ কাহিনী ভাষান্তরিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ কবিহৃদয়েরই পরিচয় দিয়াছেন—আমাদের নিজস্ব যাহা অভাব ছিল তাহা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন,—এজন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

* * *

এই আদর্শে আমাদের দেশী নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইলে আমরা দেশকে প্রাণ দিয়া চিনিতে পারিব, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সন্তানের সেই সেবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।'

(পৃ-৬৯৬)

বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় উপন্যাস পরবর্তীকালে অনেকগুলি রচিত হয়েছে। এই বিষয়ের অনুবাদ উপন্যাসের মধ্যে 'কুলি', 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি'* প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৩২৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতী'তে একটি 'বারোয়ারী উপন্যাসে'র সূত্রপাত হয়। উপন্যাসটি শুরু করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। এই উপন্যাস রচনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বড় বড় সাহিত্যিক হাত দিয়েছিলেন। ঐ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত চারটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। উপন্যাসটি বারোয়ারি বলে কাহিনীটি সুসংবদ্ধ হয়নি। তবে তার দায় সত্যেন্দ্রনাথের একার নয়। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের লেখা অংশটুকুতেও কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। 'ডঙ্কানিশান'‡ এর চমকপ্রদ ব্যতিক্রম। এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানির মধ্য দিয়ে সত্যেন্দ্র-প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দিক্ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কাহিনীবিন্যাস এবং চরিত্র চিত্রণের উৎকর্ষ, মহৎ আদর্শ স্থাপন এবং নাটকীয় গতি—শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের এই গুণগুলি 'ডঙ্কানিশানে' পাওয়া যাবে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি এবং ঘটনা ঐতিহাসিক। কিন্তু শুধু ঐ কারণেই যে এই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে গৃহীত হয়েছে, এমন নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য, এবং মূল্য—ইতিহাস-রস পরিবেষণের সার্থকতায়। ইতিহাস এ উপন্যাসে আমাদের জীবন থেকে দূরে নয়। প্রাণচঞ্চলতায় ইতিহাস উঠেছে জেগে—পুরানো ঘটনাগুলি উপন্যাসের রাজ্যে ঘটেছে নতুন করে। এই গুণ উপন্যাসকে গতি দিয়েছে—চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছে

* মূল—মুল্‌ক্ রাজ্ আনন্দ্, অনুবাদ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

‡ 'প্রবাসী' ১৩৩০ আষাঢ়-কার্ত্তিক।

সজীব করে। চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রে ভবিষ্যৎ রাজার যোগ্য বলিষ্ঠতা রণকুশলতা ইত্যাদির সঙ্গে অনুভূতিশীল হৃদয়ের সংযোগ তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছে। শঠ ইন্দ্রমূর্ত্তি এবং রাণী ধনশ্রীর চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সর্দারদের চরিত্র বিশেষ পরিস্ফুট। এত প্রাণবন্ত করে লিখতে গিয়েও ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার প্রতি লেখকের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। 'সবাই-রাজার-দেশ' বৈশালীর দুর্গাভ্যন্তরের চিত্র মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা বরাবর তাঁর সর্বমানবে প্রেমের নিদর্শন পেয়েছি। 'ডঙ্কানিশানে' অকুলীন মাতার সন্তান হিসেবে চন্দ্রগুপ্তের অপমান এবং কৌলিন্যের মোহে যোগ্য ব্যক্তিকে ফেলে অনুপযুক্তের সমাদর প্রসঙ্গ উঠেছে। মানবত্বের এই অপমানের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের সব অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠছিল, কৌলিন্যের ধ্বজাধারীদের মুখোস পড়ছিল খুলে—এমনি সময়েই রচনায় ছেদ পড়ল। এই উপন্যাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

'সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিংশশতাব্দীর আদর্শ উপন্যাস হইত।

('ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'প্রবাসী' ১৩৩০ মাঘ, পৃ-৪৫৩)

বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে আর কোনটিতেই এতগুলি সুলক্ষণ একত্র দেখা যায়নি।

গ—গল্প

সত্যেন্দ্রনাথ একটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন। গল্পটির নাম 'দিবাস্বপ্ন' ('অলিভশ্রীনার হইতে')। এটি 'প্রবাসী' ১৩১৮র কার্ত্তিক সংখ্যার দশম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি, ভালবাসা, নৈপুণ্য সব কিছু অগ্রাহ্য করে মাতা গর্ভস্থ সন্তানকে যে বর দিতে চাইলেন তা' এই—শিশুর ধ্যানের বস্তু তার কাছে সব চাইতে বাস্তব হতে পারবে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে হবে চিরঅতৃপ্ত। এই আশ্চর্য বরে শিশুর মধ্যে যেন কি এক আলোকের অনুভূতি বিদ্যুতের মত

খেলে গেল। 'হয়তো সে যাহা কখনও দেখিবে না—সেই আলোক! —যাহা অন্যত্র বাস্তব—সেই আলোক।' এই ধরণের গল্প সম্ভবতঃ বাংলায় আর নেই। এই কারণে এই অনুবাদের বিশেষ মূল্য আছে। গল্পটির গম্ভীর রচনাভঙ্গি বক্তব্য বিষয়ের গাম্ভীর্যের যোগ্য বাহন হয়েছে।

ঘ—প্রবন্ধ

সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কতকগুলি অনুবাদ এবং বাণী সংকলন জাতীয়। কখনও কখনও অনুবাদ কবিতার ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধই লিখে ফেলেছেন। এগুলিকে 'প্রবন্ধ ও কবিতা' নামের পর্যায়ে ফেলা যায়। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ, গ্রন্থ এবং নাট্যাভিনয়ের সমালোচনামূলক। বাকীগুলিতে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা। সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র প্রবন্ধ সংগ্রহের নাম 'চীনের ধূপ।' এগুলি প্রধানতঃ অনুবাদ। এগ্রন্থে আছে,

'চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদিগের ভাব-সম্পুট'

(ভূমিকা, 'চীনের ধূপ')

এর সম্বন্ধে ১৩১৯ সালের 'ভারতী' কার্তিক সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল,

'এই পুস্তিকায় চীন মহাদেশের কয়েকটি মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মতের আলোচনা ও উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে কং বা কংফুশিয়োর সহজজ্ঞান প্রণোদিত "সমূহবাদ" (Communism) এবং লোৎসু ঋষির প্রবর্ত্তিত তত্ত্ববাদ (Taoism) বা ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ হয়। এই গ্রন্থে এমন অনেক বাণী আছে, যাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে, জীবনযাত্রার অনেক জটিল প্রশ্ন সমাধানের সহায়তা ঘটিবে। কঠিন ভাবগুলিকে সহজ, সরল ও সুমধুর ভাষায় প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব সত্যেন্দ্রবাবুর অসামান্য। এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে সেই কথাটাই বিশেষ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। তত্ত্বকথা মাত্রেই যে নীরস ও ভীতিপ্রদ নহে—লেখার গুণে যে তাহা সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে,

সত্যেন্দ্রবাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।'

(সমালোচনা, 'সমালোচক', পৃ-৭৮৭)

'প্রবাসী' ১৩১৭র আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'চীনের উপনিষৎ' প্রবন্ধের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'প্রাচীন সভ্যতার দুই প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষ ও চীনদেশকে ভাবের দ্বারায় সম্মিলিত করার জন্য এবং এসিয়াকে অভেদ প্রমাণ করার জন্য আমরা বুদ্ধদেবের মত লৌৎসু ঋষির কাছেও ঋণী।'

এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কয়েকজন চিন্তাশীল নেতা (স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওকাকুরা) বারবার করে অখণ্ড এসিয়ার কথা বলছিলেন। তার সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ এসিয়ার অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী অপর এক মনীষীর বাণী বাঙালীর আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

শুধু চীনদেশ নয়, নানান্ দেশের 'মনীষীদের ভাবসম্পুট' সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় আছে। 'প্রবাসী' ১৩২০র বৈশাখ সংখ্যায় 'কর্ম্মীজনের মনের কথা' (পৃ-৭৫) প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ফরাসী দেশের বীর নেপোলিয়নের নানা বিষয়ক অনেকগুলি বাণীর অনুবাদ করা হয়েছে। ১৩১৮র 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ-৪৫২) প্রকাশিত 'ভাবুকের নিবেদন' প্রবন্ধেও ফরাসী দেশের চিন্তানায়ক 'রুশো'র মানব-জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বাণী সংগৃহীত হয়েছে। জার্মান দার্শনিক Nietzsche-এর উক্তি সংকলিত হয়েছে 'আভিজাত্যের নির্ভর ভিত্তি'তে ('প্রবাসী' ১৩২০ ভাদ্র, পৃ-৫৮৮)। আরব দেশের ধর্মপ্রচারক হজরত মহম্মদের বাণী সঞ্চয়ন 'মহাপুরুষের উক্তি' ('প্রবাসী ১৩১৯ আষাঢ় পৃ-৩০১) প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে,

'পিতার তুষ্টিতে ভগবান সন্তুষ্ট। পিতার অসন্তোষে ভগবানের রোষবহ্নি ইন্ধন সংযুক্ত হইয়া উঠে।'

—এই উক্তির পর পাদটীকায় সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,

'হজরত মহম্মদের এই সকল সুস্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও পিতৃদ্রোহী ঔরঙ্গজেবকে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা কি করিয়া পরম ধার্ম্মিক বলেন?'

'প্রবাসী' ১৩১৬র অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬১৮ পৃষ্ঠাতে 'কালা ও গোরা' (১৭ই জুনের 'নিউএজ' পত্রিকা থেকে) নামে এক সংবাদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ হলেও রচনাটিতে গল্পরস আছে। মানবত্বের লাঞ্ছনার একটি মর্মন্তুদ চিত্র এতে বিধৃত হয়েছে। এই বিষয়ের নির্বাচনে সত্যেন্দ্রনাথের মানব-প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়। এই রকম অন্যায়ের প্রতিবাদমূলক আর একখানি রচনার অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেখানি 'শয়তানের মুখে শাস্ত্রকথা' নামে ১৩১৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ-৭৩২) প্রকাশিত হয়েছিল। জারের আমলের নিগ্রহনীতির সমর্থক কোন রুশ, খৃষ্টধর্মে প্রাণদণ্ডদানের সমর্থন এমন কি বিশেষ নির্দেশ আছে এই মর্মে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। টলষ্টয় তার প্রতিবাদে যে প্রবন্ধখানি লেখেন, উপরোক্ত প্রবন্ধটি তারই অনুবাদ। এ পর্যন্ত আলোচিত সব কটি প্রবন্ধই অনুবাদ। 'চীনের ধূপে'র প্রবন্ধগুলির অনুবাদদক্ষতা ও লিখনভঙ্গি সম্বন্ধে 'সমালোচক' যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এগুলির সম্বন্ধেও সেই অভিমতই প্রযোজ্য।

'মিকাডোর নূতন খাতা' ('প্রবাসী' ১৩১৮ বৈশাখ পৃ-৬০) রচনাটিকে 'প্রবন্ধ ও কবিতা' নাম দেওয়া যায়। এতে লেখক জাপানের সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই রচনার প্রধান অঙ্গ সে দেশের রাজ দরবারে নববর্ষের দিনের অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানে পঠিত জাপানী সনেট বা 'তান্‌কা'র পরিচয় প্রদান। এই প্রসঙ্গে কবি দুখানি চমৎকার তান্‌কার অনুবাদ দিয়েছেন। তান্‌কা দুটি উদ্ধারযোগ্য,

১

'কুয়ার দড়িটি
বেড়িয়া ঝুম্‌কালতা
বেড়েছে নিশীথে ;
আমি তৃষার্ত্ত হেথা,
জল ভিখ্ মাগি কোথা !'

২

'নিথর রাত্রি,
ফুট্‌ফুটে জ্যোৎসনা!
আকাশ-যাত্রী
হাঁসগুলি যায় গোপা!
পেঁজা মেঘে পাখা বোনা!'

প্রবন্ধের শেষভাগে জাপান এবং সমগ্র প্রাচ্যের আর্টের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ ও কবিতা শ্রেণীর আর একটি রচনা পাওয়া যায় ১৩২৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ-৫৬৯)। সেটির নাম—'প্রজাতন্ত্রের রাজকবি।' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা প্রজাতন্ত্রের রাজকবি জন জি. নাইহার্ট (John. G. Neihardt) এবং সে দেশের রাজকবি নির্বাচন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলে সবশেষে নাইহার্টের একখানি প্রসিদ্ধ কবিতার অনুবাদ দিয়েছেন লেখক। কবিতাটির নাম 'কামনা'। কবির কামনা—জীবনের অপরাহ্ণ যেন কখনও না ঘনায়। তিনি বলেছেন,

'ভরা দিনের আলোর পরেই পরাণ আমার গভীর নিশা মাগে।'

এই রচনাটি পূর্বে আলোচিত 'মিকাডোর নূতন খাতা'র মত পুরোপুরি প্রবন্ধ জাতীয় নয়। কবির বক্তব্য যেন অনুবাদ কবিতাটির ভূমিকা স্বরূপ। সমস্ত রচনাটির এক নাম এবং কবিতার অন্য নাম হওয়াতেই এটিকে প্রবন্ধ ও কবিতা বলে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থসমালোচনামূলক রচনা 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ('ভারতী' ১৩২০ শ্রাবণ, পৃ-৪৬৫), প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কবিতা গ্রন্থের আলোচনা। যথারীতি সমালোচনার ভঙ্গিতে কবিতাগুলির প্রশংসা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'প্রবাসী' ১৩২৬ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'পুস্তক-পরিচয়ে' 'জোনাকীর আলো' নামক এক গ্রন্থের সমালোচনার শেষে সমালোচকের নামের স্থানে শুধু 'স' লেখা আছে। এটি সত্যেন্দ্রনাথেরই রচনা কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এর মধ্যে সমালোচকের যে রস-বোধের পরিচয় রয়েছে

তাতে এ রচনা সত্যেন্দ্রনাথের হওয়া অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। গ্রন্থের গল্পগুলির প্রশংসা বা ত্রুটি নির্দেশ করতে করতে একস্থানে লেখক বলেছেন,

'দেবতা পাপেরই দণ্ডবিধান করিলেন এরূপ মনে করিয়া লইয়া উহার উপর লেখক বড় বড় হরপে যে যে নীতিকথাকে দাঁড় করাইয়াছেন, মানুষকে তাহা অন্যায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে, মানুষ এমনতর কচি খোকা নয়।'

সমগ্র আলোচনাটি মোটামুটি উৎসাহদায়ক। উৎসাহদান সমালোচকের কর্তব্য একথা রচয়িতা ভোলেননি। ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী'র ১০৯৮ পৃষ্ঠায় 'সহরে ফাল্গুনী' (সচিত্র) নামে সত্যেন্দ্রনাথের একটি রচনা দেখা যায়। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় এবং তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দর্শক হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই রচনাটির বিষয়। সবশেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কবিগুরুর প্রতি তাঁর আন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করেছেন,

'চির-বসন্তের বীণ
বাজাও যামিনী দিন
চির-যৌবনের ওগো চির-পুরোহিত!
শীতে ম্লান দুনিয়ায়
লাগালে ফাল্গুনী বায়
সবুজ পাতায় তুমি জাগালে সঙ্গীত।
চির-প্রাণে প্রাণবান
অফুরান তব দান
অমৃত তোমার গান নবীয়ান্ নিতি;
তোমারে কী পারি দিতে—
পারিজাত অবনীতে—
নাই কবি, দিনু তাই অন্তরের প্রীতি।'

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (১৩২৬ চৈত্র, পৃ-৫৬৪) 'হাতকল' নামের একটি প্রবন্ধের শেষে রচয়িতার নামের স্থানে শুধু 'স' লেখা আছে। সরস রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয় এ লেখা সত্যেন্দ্রনাথের হতেও পারে। রচনার আরম্ভও শেষ অংশ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে একথা স্পষ্ট হবে। আরম্ভে,

'আমরা এক হাত লড়ি, গল্প রচনায় হাত পাকাই, ভিতরে প্রাণের খোরাক থাকিলে সব কিছুতেই হাত দি, নতুবা বন্ধুর দরজায় গিয়া হাত পাতি,—দুনিয়াতে এক কেবল অন্ধ নিয়তির উপরই আমাদের কিছু হাত থাকে না। ইহা হইতেই এবারকার লড়াইয়ে যে বেচারাদের হাত বা হাতের আঙুল কটি খোয়া গেছে, তাদের দুর্ভাগ্যের পরিমাণ উপলব্ধি করা সহজ হইবে।'

উপসংহারে বলা হয়েছে হাতকলের উৎকর্ষ হয়তো যুদ্ধে হাত খোয়া যায়নি এমন মানুষকেও কল ব্যবহারে প্রবৃত্তি দেবে। ফলে অপ্রয়োজন বোধে শরীর থেকে হাত ক্রমে লুপ্ত হবে। এমনি করে কলের উৎকর্ষ ঘটতে থাকলে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন কমতে কমতে সম্পূর্ণ মানুষই অদৃশ্য হয়ে যাবে একদিন। আর তখন কলগুলির,

'এত উৎকর্ষ হইবে যে তারা দিব্য সুনিয়মে খনি হইতে কয়লা খুঁড়িয়া তেল নিঙড়াইয়া তুলিয়া নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারিবে, পরস্পর লড়াই করিবে, এবং বহুদূর ভবিষ্যতে মানুষের সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও করিবে হয়ত, যদি যন্ত্রজগতে সেটা নিতান্তই সময়ের বাজে খরচ বলিয়া বিবেচিত না হয়।'

এইরকম রসবোধের পরিচয় আছে সত্যেন্দ্রনাথের 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে লেখা 'কোষ্ঠী বিচার' ('ভারতী' ১৩২২ আষাঢ়, পৃ-৩১৮) প্রবন্ধেও। প্রবন্ধের শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে বলা আছে,

'[পণ্ডিত-সম্রাট্, শাস্ত্র-বিদাম্বর, শ্রীমৎ নবকুমার কবিরত্ন, জ্যোতির্ব্বেদী, ভৃগুভূষণ, মিহির-মহার্ণব, খনা-বচন-খনিত্র, বরাহ-বিদ্যা-বারিধি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কৃতম্-সারম্বাৎ Sirস্য চিত্ত-চিকিৎসকস্য ডাক্তারস্য ঠাকুরোপাধিকস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথস্য শুভ-কোষ্ঠী বিচারম্।]'

এই প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রের লেখকের হাস্যরসসৃষ্টির কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এইরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে সুদুর্লভ। শব্দ নিয়ে খেলা করে ভাষাকে অর্থচ্ছটায় উজ্জ্বল করেছেন তিনি। বাংলা ভাষার উপর তাঁর যে কতখানি দখল ছিল এইসব রচনা তার প্রমাণ। ভাষাকে যখন যেমন প্রয়োজন অবলীলাক্রমে তখনি তেমনি ভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনার আর একটি নিদর্শন 'ভারতী' ১৩২৩ এর ভাদ্র সংখ্যার 'অতি পাণ্ডিত্যের উপদ্রব'।

সত্যেন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধ বাংলা ১৩২৫ সালের বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলিক তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এই প্রবন্ধটি ছন্দোবিদ্ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এর আগে বাংলা ছন্দের আলোচনা খুব বেশী হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে কবিত্বময় ভাষা ও আংশিক ভাবে রূপকের অন্তরাল থেকে প্রকাশ করে এই প্রবন্ধের লিখন ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য এনেছেন। বাংলা ছন্দশাস্ত্র নির্মাণের পথে তাঁর এই প্রবন্ধের সহায়তা আছে।

এইবারে সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কথা বলব। ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (পৃ-৬১৭) 'কাব্য ও কবি', ঐ পত্রিকার ঐ সালেরই পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ-৭৩৭) 'কাংস্যকণ্ঠ কবি', ঐ পত্রিকার ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'নব্যকবিতা' (পৃ-৪৯৪) এবং 'ভারতী' ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ-৯৯১) 'যুগোত্তর সাহিত্য', প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আছে। 'নব্যকবিতা' ও 'যুগোত্তর সাহিত্য' প্রবন্ধ হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি এবং সুসংবদ্ধতা এই প্রবন্ধগুলির বিশেষ গুণ। সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা যে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, তা 'যুগোত্তর সাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়লে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাতে তিনি যুগ ও সাহিত্যকে পঙ্ক ও পঙ্কজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আরও অনেক কিছুর জন্মই পঙ্কে, কিন্তু আপন বিশিষ্টতায় 'পঙ্কজ' হয়েছে 'পঙ্কজ'। তেমনি একটি যুগে নানা কিছু

জন্মাতে পারে, কিন্তু পঙ্কজের মত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু না থাকলে তা খাঁটি সাহিত্য হবে না। পঙ্কজের সঙ্গে যে সাহিত্যের তুলনা, তাকেই তিনি বলেছেন 'যুগোত্তর সাহিত্য'। তার নীচে সাহিত্যের আরও কতকগুলি স্তর নির্দেশ করেছেন, যেমন, 'যুগন্ধর সাহিত্য', 'যুগোদ্ধারণ সাহিত্য' এবং 'যুগানুগ' বা 'যুগোচ্ছিষ্ট' বা 'যুগোঞ্ছ' সাহিত্য। যুগন্ধর সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

'এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপর যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও খানিকটা এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্তু-ভিত্তির বিপুল পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে, কিন্তু রস-সম্পদের প্রাচুর্যে দেশকালকে অতিক্রম করে।······এ সাহিত্য যে পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে অমরতা অর্জ্জন করে। 'যুগোদ্ধারণ সাহিত্য' যুগধর্মে পরিবর্তন আনে।'

'আনন্দমঠ' রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র, 'গোরা' রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, 'Comrades' রচয়িতা গোর্কি, 'নীলদর্পণ' রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিকে তিনি যুগোদ্ধারণ সাহিত্যিক বলেছেন। জাতীয় সঙ্গীত, যুদ্ধসঙ্গীত প্রভৃতিকেও তিনি এই শ্রেণীতেই ফেলেছেন। যুগানুগ, যুগোচ্ছিষ্ট বা যুগোঞ্ছ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এক কথায়,

'অনুকরণে এর জন্ম, অনুসরণে এর পুষ্টি, আর যুগধর্মের অনুমরণে এর মৃত্যু।'

'হসন্তিকা' গ্রন্থের 'কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি' কবিতার এক অংশকে সামান্য পরিবর্তিত করে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি পংক্তি যোগ করে শেষোক্ত ধরণের সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

'পাতি লেখকের প্রিয় আদর্শ,
Mediocrityর হৃদয়-হর্ষ,
খাড়া-বড়ি-থোড়ে মহোৎকর্ষ
সাধিত হতেছে ইথে।
বাদ্‌লা-ফড়িং ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
পিপঁড়ে উড়েছে ভর দিয়ে পাখে,
—ভয় শুধু পাছে ধরে খায় কাকে
পাখনা না পালটিতে।'

সাহিত্যের এই প্রকৃতিবিভাগ এবং নামকরণ অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির বাক্যবিন্যাস কবির বক্তব্যকে যেন পদ্মের এক একটি দলের মত করে বিকশিত করেছে। কবিত্বের পরিচয় ভরা উপমার ব্যবহার ভাবকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছে। 'নব্য কবিতা' থেকে দু একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

(১) 'নব্য কবিতা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির লীলাভূমি, বিশ্বপ্রকৃতির মত সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া কিছুই বলিতে চায় না। ওড়্নার সূক্ষ্ম অন্তরালে সুন্দর চোখের মৌন দৃষ্টির মত, কিছু না বলিয়াও সে অনেক বলে; হেমন্তের হিমায়মান আকাশপটে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের নক্ষত্রপুঞ্জের নীরব সংক্রমণের মত আলোক হয়তো সে যথেষ্ট দেয় না, কিন্তু আনন্দ দেয় প্রচুর।

(২) কবিতা বাগ্মীতা নয়, বাচালতা নয়, এমন কি রসিকতাও নহে। উহা শুধুই আন্তরিকতা; উহা একান্ত রূপে অন্তরের সামগ্রী, এক অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এই লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকা আরেক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যখন অভিসার করে তখন তাহার অবগুণ্ঠন ধরিয়া টানিলে সে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ এমন করিয়াই ঢাকে যে তাহা কোন মতেই আর খুলিতে পারা যায় না। ভাষার শিবিকায় সে রাজপথেও যাতায়াত করে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ করিয়া।'

এই ভাষাও রচনা ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঙ—পত্র

সবশেষে সত্যেন্দ্রনাথের পত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করব। ১৩৩৭ সালের 'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ (পৃ-১৫২) ও মাঘ (পৃ-৩২৬) সংখ্যায় সুহৃদ্ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রগুলির থেকে কবির কিছু চরিত-পরিচয় পাওয়া যায়। কবিজীবনের সাধনায় সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দ্বিতীয় পত্রটিতে,

'যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ একশত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহুদূরে। Keats এ বয়সে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রস সৌন্দর্য্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যুখণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি ?-?-?-'

ঐ পত্র এবং পরবর্তী পত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় শিশুর ক্রন্দনে তাঁর দুঃখানুভব এবং সহানুভূতির সঙ্গে কয়েদীর প্রেমকাহিনী বর্ণন থেকে। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মত এই পত্রগুলিতে উদ্ধৃত রয়েছে। 'হোমশিখা' সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসাসূচক উক্তি এবং সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অসহিষ্ণুতাপূর্ণ নিন্দাসূচক মন্তব্য। ধীরেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ' ইত্যাদি— গানটি সত্যেন্দ্রনাথের 'কোন দেশেতে তরুলতা' গানটির দ্বারা 'suggested' বলে মনে করতেন—এ কথা পাওয়া যায় পঞ্চম পত্রটি থেকে। 'কুহু ও কেকা'র একটি কবিতার ('দার্জ্জিলিঙের চিঠি') এবং 'তীর্থ সলিল' ও 'তীর্থরেণু' গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা আছে কোন কোন পত্রে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের কথাও পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম পত্রটির ইতিতে কবি লিখেছেন,

'আমার সম্মান নিত্য
হইতে বিশ্বাসী ভৃত্য।'

এইরকম ছোটখাট শ্লোক তৈরীর অভ্যাস তাঁর ছিল তা পঞ্চম ও ত্রয়োদশ পত্রেও দেখা যায়। পত্রগুলিতে অনেক জায়গায় তাঁর রসবোধের পরিচয় স্ফূর্ত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র-কবিতাও আছে। শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-ভবনে' সত্যেন্দ্রনাথের দুখানি অপ্রকাশিত পত্র রক্ষিত আছে। সত্যেন্দ্রনাথের লেখা ছন্দ সম্বন্ধীয় কোন পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন—'ছন্দ' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গ্রন্থের 'সংযোজন'

অংশে তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের লেখা পত্রটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমলচন্দ্র হোমের কাছেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলিরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের গল্পরচনাগুলির পরিচয় মোটামুটি এই। এই সব রচনার সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

'পরিচিতিতে' উল্লেখ করা হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমত সংগ্রহ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সে সব সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। ১৯২৯ এর ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ এর বঙ্গলক্ষ্মী,—১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৬ সালের সাহিত্য, ১৩১৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী,—১৩২১, ১৩২৩ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩২৪ কার্তিক-চৈত্র এবং ১৩২৬ এর শ্রাবণ সংখ্যা ভারতী প্রভৃতি অপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে অন্য কোন সূত্রে এই অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত কোন কোন রচনার সন্ধান পেলে তালিকায় সেগুলির নাম সন্নিবেশ করেছি। কিন্তু সে সব রচনার প্রকার বর্ণন বা পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বা মাসের উল্লেখ করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। পরিশিষ্ট ক-তে পত্রিকার নামের পাশে বন্ধনীতে পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং রচনার নামের পাশে বন্ধনীতে রচনার প্রকার নির্দেশিত হয়েছে। 'গ্রন্থের নাম' অংশে সংকলিত গ্রন্থ বা রচনাগুলি যে-সব গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে। যে-সব রচনা কোনও গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, 'গ্রন্থের নাম' স্তম্ভ সেখানে অবশ্যই অপূর্ণ রয়েছে। কোন রচনা, গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হবার সময় নামান্তরিত বা পাঠান্তরিত হয়ে থাকলে পাদটীকায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রয়োজন বোধে পাদটীকায় কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয়েছে। গ্রন্থগুলির প্রকাশের সাল জানা গেছে বটে, কিন্তু সেগুলি কোন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল সব ক্ষেত্রে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিশিষ্ট খ-য়ের তালিকায় লেখকদের নাম বর্ণানুক্রমে সাজান হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সকল সমালোচনার শেষে রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না (কখন আবার নামের পরিবর্তে '?' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে)। কাজে কাজেই সে-সব স্থলে লেখকের নামের বদলে পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট গ-য়ের প্রমাণপঞ্জীর স্তম্ভে লেখকদের নামের তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেওয়া হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কোন কোন রচনা ছদ্মনামে বা সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তালিকায় সেই সব রচনার নীচে ঐসব নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যে-সব রচনার শেষে শুধু 'স' লেখা আছে, সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথেরই কিনা এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকতে পারে। 'শ্রীসত্যেন্দ্র' নামে লেখা সাহিত্য-সমালোচনা মূলক রচনাটি সত্যেন্দ্রনাথের হওয়াই সম্ভব। 'বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি' ছদ্মনামে প্রকাশিত দুলাইনের কবিতা,

'কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি ॥'

পরে 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে ঈষৎ পরিবর্তিত ও দীর্ঘায়িত রূপে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'নবকুমার কবিরত্ন' নামটির কথা সুধী সমাজে বিশেষ পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'Fruit Gathering' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়। বাংলা ১৩৪০ সালে Harijan পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের 'মেথর' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই অনুবাদটিও রবীন্দ্রনাথের করা। ইংরেজি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'Indian Literature' (By—Annadasankar and Lila Ray) গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের 'সাম্য-সাম' কবিতার কিছু অংশের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা নয় এবং এগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকলেও তাঁর রচনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন অভিমত এতে নেই বলে পরিশিষ্টের তালিকায় এগুলিকে স্থান দেওয়া হয়নি।

পরিশিষ্ট—ক

সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩০৭	...	...	*সবিতা —কবিতা, পুস্তিকা	হোমশিখা
১৩০৮	ফাল্গুন	সাহিত্য (৭০৬)	†দেখিবেকি —ঐ, অনুবাদ	...
১৩১২	...	...	সন্ধিক্ষণ —কবিতা, পুস্তিকা	বেণু ও বীণা (২য় সংস্করণ)
১৩১৩	আশ্বিন	...	... (কবিতা-গ্রন্থ)	বেণু ও বীণা
১৩১৪	ঐ	...	... ঐ	হোমশিখা
১৩১৫	জ্যৈষ্ঠ	সাহিত্য (৮৬)	জাপানী কবিতা (অনুবাদ) ক—বাতুলতা খ—জ্যোৎস্নার কুহক গ—বাতাসের শাস্তি ঘ—সৌন্দর্য্য ও সাধুতা ঙ—পুষ্প জন্ম চ—স্বদেশ ছ—কংফুশিওর কথা জ— অক্ষয় প্রেম ঝ—কোকিল ঞ—ঘুম পাড়ানিয়া গান	তীর্থ সলিল
ঐ	আশ্বিন		(কবিতা গ্রন্থ, অনুবাদ)	তীর্থ সলিল

* হোমশিখার প্রথম সংস্করণে কবিতার শেষে লেখা আছে ১৩০৫ সাল এটি সম্ভবতঃ রচনা-কাল নির্দ্দেশক।

† ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-'র 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-' পুস্তিকায় বলেছেন—"ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ সনে তাঁহার প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুদ্রিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মাসিক পত্রে সর্ব্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (ফাল্গুন, ১৩০৮) তাঁহার 'দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে)' কবিতা মুদ্রিত হয়।" কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদায় আরতি'র ভূমিকায় 'কবি-পরিচিতি'তে বলেছেন "তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়।"

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৫	ফাল্গুন	সাহিত্য (৫৯২)	হিমাচলের ডালি (কবিতা গুচ্ছ) ক—হিমালয়ষ্টক খ—কাঞ্চন শৃঙ্গ গ—মেঘলোকে	কুহু ও কেকা
১৩১৬	আষাঢ়	সাহিত্য	মুণ্ডারিগানও কবিতা—ঐ (অনুবাদ) ক—নৃত্য-নিমন্ত্রণ খ—বিবাহান্তে বিদায় গ—অনাথ	তীর্থ রেণু
ঐ	আষাঢ়	ভারতী (১৪৯)	যক্ষের নিবেদন (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	শ্রাবণ	প্রবাসী (২২৮)	মেথর (ঐ)	ঐ
ঐ	আশ্বিন	প্রবাসী (৪৪৫)	শুদ্ধ (ঐ)	...
ঐ	ঐ	ঐ	বিপদের দিনে (কবিতা-অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ	রহস্যময় (ঐ)	ঐ
ঐ	কার্ত্তিক	ভারতী (৩৬৩)	মিশর কবিতা (ঐ) ক—পথিক-বধূ খ—মিলনানন্দ গ মনোজ্ঞা ঘ—মরণ ঙ—মিশর-মহিমা	ঐ
ঐ	অগ্রহায়ণ	প্রবাসী (৬১৭)	কাব্য ও কবি—প্রবন্ধ শ্রীসত্যেন্দ্র—	...
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৬১৮)	কালা ও গোরা—প্রবন্ধ, অনুবাদ	...
ঐ	পৌষ	ঐ (৭৩২)	শয়তানের মুখে শাস্ত্র কথা (ঐ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৭৩৭)	কাংস্য-কণ্ঠ কবি—প্রবন্ধ	...
ঐ	ঐ	ঐ (৭৩৮)	রণ-মৃত্যু—কবিতা, অনুবাদ	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ (৭৪২)	পান্তম্—কবিতা-গুচ্ছ, অনুবাদ ক—অতুলন খ—সন্ধ্যার সুর	ঐ

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৬	পৌষ	প্রবাসী (৭৪৩)	ছেলে ভুলান গান (কবিতা, অনুবাদ)	সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা
ঐ	মাঘ	ভারতী (৫৫৬)	সিপাহীর বিশ্রাম (কবিতা, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (৬৩০)	চীনের কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, ঐ) ক—বসন্তের প্রত্যাবর্ত্তন খ—অশ্রু গ—বাসন্তী স্বপ্ন ঘ—মণিহারা ঙ—সে	ঐ
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৯৯২)	দৃষ্টিহারা (নাটক, অনুবাদ)	রঙ্গমল্লী
ঐ	ঐ	ঐ (১০০৩)	নুরুদ্দিন জামীর কবিতা (কবিতা গুচ্ছ, অনুবাদ) ক—বিরহী খ—চিরবিচিত্র গ—প্রজ্ঞা ঘ—ভাবের ব্যাপারী	তীর্থরেণু
১৩১৬	চৈত্র	ভারতী (৭০০)	কেন ? (কবিতা)	...
১৩১৭	বৈশাখ	ভারতী (৪৮)	ধারা (কবিতা)	*ফুলের ফসল
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	ঐ (১৩৮)	তান্‌কা (কবিতা-গুচ্ছ, অনুবাদ) ১—কিনো ২—গোকু ৩—শ্রীমতী উকন্‌ ৪—আসায়াসু ৫—শ্রীমতী দৈনী-নো-সাম্মি ৬—মিচি-নোবু-ফুজিবারা ৭—শ্রীমতী সাগামি ৮—শ্রীমতী হোরিকার	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ (১৪৬)	গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে (কবিতা, অনুবাদ)	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (২০০)	চম্পা (কবিতা)	ফুলের ফসল

* পাঠান্তরিত

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৭	আষাঢ়	প্রবাসী (২৩১)	চীনের উপনিষৎ (প্রবন্ধ, অনুবাদ)	ফুলের ফসল
ঐ	ঐ	ঐ (২৩৪)	নব্য অলঙ্কার (কবিতা, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ভারতী (২৪৯)	ডিরোজিওর কবিতা (কবিতা গুচ্ছ, ঐ) ক—বালবিধবা খ—বৌ-দিদি	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (২৫৮)	জিন (কবিতা, অনুবাদ)	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৩০৬)	বিশ্বকর্ম্মার প্রতি (কবিতা)	* হসন্তিকা
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৩৪৭)	বর্ষা (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৩৪৪)	চুম্বন (?)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৩৩৫)	কুংফুশিও কথামৃত	
ঐ	ঐ	ঐ (৩৬৮)	প্রেম (কবিতা, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ (৩৭৫)	দুর্দ্দিনে ঐ (কবিতা)	
ঐ	ভাদ্র	ভারতী (৪২০)	অমৃতং বাল ভাষিতং (কবিতা, অনুবাদ)	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৪২০)	খোকার আগমনী (কবিতা, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ (৪২০)	স্নেহের নিরিখ ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৪৪১)	কাঁটাবনের প্রজাপতি (প্রবন্ধ ও কবিতা) ক—খেয়ালীর খেয়াল (কবিতা) খ—অনুদ্যোতক ঐ	
ঐ	ঐ	ঐ (৪৬১)	পতঙ্গ ও প্রদীপ (কবিতা, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
ঐ	ঐ	ঐ (৪৭২)	আমার দেবতা ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অভেদ ঐ	ঐ

* নামান্তরিত। গ্রন্থের নাম 'বিশ্বকর্ম্মার প্রতি B. E'.

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৭	ভাদ্র	ভারতী (৪৮২)	পাগলা-ঝোরা (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	পৌষ	ঐ (৩৭৫)	গরু ও জরু (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	মাঘ	ঐ (৪৯৪)	নব্য-কবিতা (প্রবন্ধ)	
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (৫৬৭)	স্বর্গ (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (৫৭৩)	পদ্মার প্রতি (কবিত)	কুহু ও কেকা
ঐ	ফাল্গুন	ভারতী (৯৪২)	খেয়ালীর গান (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৬৮২)	এস (কবিতা)	ফুলের ফসল
ঐ	ঐ	ঐ (৬৯৬)	মিশরের মিশ্রী (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ) ক—বন্যায় খ—ধানমাড়া গ—আভাস ঘ—অভয়মন্ত্র	*মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ভারতী (১০৪৬)	বর্ষ বিদায় (কবিতা)	† ফুলের ফসল
ঐ			ললিতা-সপ্তমী (কবিতা-গ্রন্থ, অনুবাদ)	তীর্থরেণু
১৩১৮	বৈশাখ	প্রবাসী (১)	ইরানে নওরোজ (কবিতা, অনুবাদ)	‡ মণিমঞ্জুষা
১৩১৮	ঐ	ভারতী (২)	বর্ষবরণ (কবিতা)	ফুলের ফসল
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৪৬)	মৌন বিকাশ ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৫৯)	প্রবাসী (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৬০)	মিকাডোর নূতন খাতা (প্রবন্ধ ও কবিতা)	...
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	ঐ (১৮৭)	নমস্কার (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	ঐ (১৮৯)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	ঐ	**বাণী	আমরা (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	আষাঢ়	ভারতী (২৫৬)	সবুজ সমাধি (নাটিকা, অনুবাদ)	রঙ্গমল্লী

* নামান্তরিত। গ্রন্থের নাম 'মিশর'।
† পাঠান্তরিত।
‡ নামান্তরিত। গ্রন্থের নাম 'নওরোজের গান।
** Ref. প্রবাসী ১৩১৮ শ্রাবণ, পৃ-৪৩৭

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৮	আষাঢ়	প্রবাসী (২৫৭)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, ঐ)	জন্মদুঃখী
ঐ	শ্রাবণ	প্রবাসী (৩৯২)	ক্ষণিকের গান (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ভারতী (৩৯৩)	কেতকী (কবিতা)	ফুলের ফসল
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৪১৯)	সাগর-তর্পণ ঐ	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	ঐ (৪২৫)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	ঐ	ঐ (৪২৯)	ঝুলন (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ভাদ্র	ঐ (৫২৪)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	ঐ	......	(কবিতা গ্রন্থ)	ফুলের ফসল
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৫৮৮)	সংসারের সার (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৬৫৪)	দার্জ্জিলিঙের চিঠি (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	ঐ (৬৭৭)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (১০)	দিবাস্বপ্ন (গল্প, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৫৮)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	ঐ	ঐ (৭২)	তারেই (কবিতা, অনুবাদ)	*মণি-মঞ্জুষা
ঐ	অগ্রহায়ণ	ঐ (১৮৯)	নব্যতুরস্কের জাতীয়-সঙ্গীত (কবিতা, অনুবাদ)	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (১৯৮)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	পৌষ	ঐ (২৮১)	চীনের জাতীয় সঙ্গীত (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (ঐ)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	মাঘ	ঐ (৩৫৯)	ঐ ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৪০৩)	বরভিক্ষা (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৮৬)	যোগাদ্যা ঐ	ঐ
ঐ	ফাল্গুন	প্রবাসী (৪৩৩)	রহসি ঐ	ঐ

* পাঠান্তরিত।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৮	ফাল্গুন	প্রবাসী (৪৩৪)	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
ঐ	ঐ	ঐ (৪৪৯)	কবিপ্রশস্তি (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	ঐ (৪৫২)	ভাবুকের নিবেদন (প্রবন্ধ, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ভারতী (১১০৪)	বাসন্তিকা (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (১১১৫)	বরণ (কবিতা)	
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৬০২)	অধম ও উত্তম (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৬০৬)	বৈরাগ্য ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ ঐ	জন্মদুঃখী (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী
১৩১৯	বৈশাখ	ভারতী (৮৮)	আকাশের খোকা খুকী (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (১১৮)	গরুর গাড়ীর গান ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ † (১৩৫)	নববর্ষে ঐ	ঐ
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	ঐ (২১১)	বিশ্ববন্ধু (কবিতা)	কুহু ও কেকা
ঐ	ঐ	ভারতী (২২১)	ওগো ঐ	*ঐ
ঐ	আষাঢ়	প্রবাসী (৩০০)	নাঙ্গাপন্থীর গান (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ) (ক) অরূপগুরু (খ) আত্মনিবেদন	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৩০১)	মহাপুরুষের উক্তি (প্রবন্ধ, অনুবাদ)	
ঐ	ঐ	ঐ (৩১২)	জৈন কবিতা (কবিতাগুচ্ছ,) ঐ (ক) চৈত্যবন্দনা (খ) ধূপারতি (গ) নমস্কার	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৩২৪)	বিরহাতঙ্ক (কবিতা, অনুবাদ)	ঐ
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৪১৭)	সাগরের গান ঐ	ঐ

† প্রবাসী সূচীপত্রের উল্লেখ অনুযায়ী পৃঃ ১৩৭ নয়।

* পাঠান্তরিত।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩১৯	শ্রাবণ	প্রবাসী (৪৩৪)	বিরাট ঐ	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৬১৭)	চকোরের গান (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৬৭৬)	জলটুঙি (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৬৮৬)	বিশ্বকর্ম্মার বিজয় যাত্রা ঐ	ঐ
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (৯৪)	জয়ন্তী ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৯৫)	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৯৬)	আয়ুষ্মতী (কাব্যনাট্য, ভাবানুবাদ)	রঙ্গমল্লী
ঐ	ঐ	ঐ (১০৬)	শত্রু-শাতন-সূক্ত (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (১১০)	নীলকণ্ঠ পাখী (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (১২৬)	রাখী-বিসর্জ্জন ঐ	
ঐ	ঐ	ভারতী (৭২৪)	নিদিধ্যাসন (নাটিকা, ভাবানুবাদ)	রঙ্গমল্লী
ঐ	অগ্রহায়ণ	প্রবাসী (১৭১)	দেশের কোল (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (১৮৩)	চায়ের পেয়ালা ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (২০২)	বিশ্বের প্রার্থনা ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (২১৩)	অনুশোচনা ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (২২১)	যুদ্ধ শেষে ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (২২৮)	জাপানী হাসির গান ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ ঐ	কপোত-কূজন ঐ	ঐ
ঐ	পৌষ	ঐ (২৯৩)	স্বরূপের আরোপ ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৮৬)	নব্য চীনের জাতীয় সঙ্গীত ঐ	ঐ
ঐ	ফাল্গুন	প্রবাসী (৫২৩)	প্রণয়-হিল্লোল-শায়িনী ঐ	ঐ
ঐ	চৈত্র	ঐ (৬৩৪)	বঙ্কিমচন্দ্র ঐ	ঐ
ঐ	দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি		* (উপন্যাস, অনুবাদ)	জন্মদুঃখী

* "ইহা ধারাবাহিক রূপে এক বৎসর কাল 'প্রবাসী'তে (১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল।" ভূমিকা, জন্মদুঃখী।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম		গ্রন্থের নাম
১৩১৯	রাখী পুর্ণিমা		* (কবিতা গ্রন্থ)		কুহু ও কেকা
ঐ	...	...	** (নিবন্ধ গ্রন্থ)		চীনের ধূপ
ঐ	...	...	(নাট্যানুবাদ গ্রন্থ)		রঙ্গমল্লী
১৩২০	বৈশাখ	প্রবাসী (৭৫)	কর্ম্মীজনের মনের কথা	(প্রবন্ধ, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৮০)	যৌবন-সীমান্তে	(কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৮৮)	দেশের মায়া	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৮)	বাল্মীকির মৃত্যু	ঐ	ঐ
ঐ	আষাঢ়	প্রবাসী (৩৬৫)	ডেবিড হেয়ার	কবিতা	অভ্র-আবীর
ঐ	আষাঢ়	প্রবাসী (৩৬৮)	রাত্রি বর্ণনা	(কবিতা)	হসন্তিকা
ঐ	ঐ	ঐ (৩৮২)	ইন্দ্রজাল	ঐ	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৩৮৭)	তান্‌কা সপ্তক	ঐ	ঐ
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৪৬৫)	সনেট-পঞ্চাশৎ	(প্রবন্ধ)	...
ঐ	ভাদ্র	ঐ (৫৭০)	সিন্ধু-তাণ্ডব	(কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৫৯২)	মহাসরস্বতী	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫৮৮)	আভিজাত্যের নির্ভর ভিত্তি	(প্রবন্ধ, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৫৯৯)	সমুদ্রাষ্টক	(কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৬১১)	বর্ষা-নিমন্ত্রণ	ঐ	ঐ
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৬৮২)	রাজা ও রাখাল	(নাটিকা, ভাবানুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৭২৬)	বন্যাদায়	(কবিতা)	বিদায়-আরতি
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৭৬০)	বন্দীদেবতা	(কাব্যনাট্য, অনুবাদ)	...
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (৩৭)	পুরীর চিঠি	(কবিতা)	অভ্র-আবীর

* এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি উক্ত বাংলা সালে, এবং ইংরেজী ১৯১২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র ১৩৬১র শারদীয় জনসেবক পত্রে 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন যে এর প্রকাশ-কাল ইংরেজী ১৯১১র ১০ই সেপ্টেম্বর।

** ইংরাজী ৫ অক্টোবর, ১৯১২।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩২০	কার্ত্তিক	প্রবাসী (৭৬)	ইংলণ্ডের নূতন রাজ কবির কবিতা (কবিতা, অনুবাদ) ক—পাপিয়া খ—গান গ—সাধ	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	ঐ (৮০)	রাজর্ষি রামমোহন (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৯৪)	* বন্যাদায় (কবিতা)	বিদায়-আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী (৭৭৫)	চিত্র শরৎ (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৮০৯)	লাজাঞ্জলি ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৮৩২)	বিদেশিনী (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	অগ্রহায়ণ	প্রবাসী (১৯২)	৺দীনবন্ধু মিত্র (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (২০৭)	চিরন্তনী (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	পৌষ	প্রবাসী (২৩০)	আভ্যুদয়িক (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৩৩৮)	ইজ্জতের জন্য ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ভারতী (১০০৭)	একটি গান (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৬৪৮)	মৃত্যু স্বয়ম্বর (কবিতা)	অভ্র-আবীর
১৩২১	বৈশাখ	সবুজপত্র (৬৭)	সবুজপাতার গান (কবিতা)	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৭৬)	স্বাগত ঐ	ঐ
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	ঐ (২৩৮)	ভিক্ষা (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	আষাঢ়	সবুজপত্র (২০৬)	আষাঢ়ের গান (কবিতা)	†অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৩৭০)	দোসর ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৩৭৭)	মহাকবি মধুস্দন ঐ	ঐ
ঐ	শ্রাবণ	ঐ (৪৯৯)	বিশ্ববেদন (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	...	... (কবিতা-গ্রন্থ)	তুলির-লিখন
ঐ	ভাদ্র	প্রবাসী (৫৪০)	শতবার্ষিকী (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	চৈত্র	ঐ (৬২৫)	সেবাসাম ঐ	বিদায়-আরতি

* পুনর্মুদ্রিত। প্রথম মুদ্রণ—ভারতী ১৩২০ আশ্বিন, পৃ ৭২৬

† ঈষৎ পরিবর্তিত।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩২২	বৈশাখ	ভারতী (৩১)	শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল (কবিতা) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	হসন্তিকা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (১৮০)	অ! ঐ	ঐ
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	ভারতী (২০৪)	রাজা ভড়ং ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (২৮৭)	আমরা (কবিতা)	* বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৩০৮)	এসেছে সে এসেছে ঐ	† ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৩১৯)	পরমাত্ম ঐ	ঐ
ঐ	আষাঢ়	ভারতী (২৫৫)	তেহাই (নাটিকা)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৩১৮)	কোষ্ঠীবিচার (প্রবন্ধ) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...
ঐ	আষাঢ়	প্রবাসী (৪২৯)	মিস্ত্রালের কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ) ক—ঝিঁঝি, খ—মিলন গীতি গ—গোত্র-সঞ্জীবন ঘ—বন্ধুবিরহে	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৩৫৬)	কবর-ই-নূরজাহান (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	ঐ (৪৪১)	দেড়ে টিকটিকি (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫১১)	তাজ (কবিতা)	অভ্র-আবরী
ঐ	ঐ	ঐ (৫২৮)	তাজের প্রথম প্রশস্তি (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ভাদ্র	ভারতী (৫১০)	কাজরী-পঞ্চাশৎ (কবিতাগুচ্ছ)	অভ্র-আবীর
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৬১৬)	দিল্লী-নামা (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৫৪৫)	শক্র (নাটিকা, ভাবানুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৬০৯)	আফ্‌তাব্‌ (কবিতা, অনুবাদ)	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৭২৪)	রাজা (নাটিকা, অনুবাদ)	...

* নামান্তরিত। গ্রন্থের নাম 'গুণী দরবার'।

† নামান্তরিত। গ্রন্থের নাম 'গান'।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩২২	মধ্যশরৎ	...	কাব্যগ্রন্থ, অনুবাদ	মণি-মঞ্জুষা
ঐ	পৌষ	সবুজপত্র (৬১৫)	মনীষী-মঙ্গল (কবিতা)	*অভ্র-আবীর
ঐ	মাঘ	প্রবাসী (৪১৪)	বস্তুতন্ত্রসার ঐ —বস্তুতান্ত্রিক চূড়ামণি	**হসন্তিকা
ঐ	ফাল্গুন	ভারতী (১০৯৮)	সহরে "ফাল্গুনী" (প্রবন্ধ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (১১১০)	সরস্বতী (কবিতা)	অভ্র-আবীর
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৫৮৯)	গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি (কবিতা)	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৫৯৯)	জাতির পাঁতি ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ভারতী (১২১০)	জর্দ্দাপরী ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (১২১৫)	নীলপরী ঐ	ঐ
ঐ	বাসন্তী পূর্ণিমা		(কাব্য-গ্রন্থ)	অভ্র-আবীর
১৩২৩	বৈশাখ	প্রবাসী (৯৯)	অর্ঘ্য-পঞ্চক (কবিতাগুচ্ছ) ক—বঙ্গবাল্মীকি খ—বাণীর পূজারী গ—বিধান দাতা ঘ—যশোধন ঙ—অগ্রহারী	বেলা শেষের গান
ঐ	ভাদ্র	ভারতী	অতি পণ্ডিতের উপদ্রব —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	... ...
ঐ	আশ্বিন	প্রবাসী (৫৮৫)	যশ-অপযশ (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (২০)	কানু ও হনু (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ	পরবাসী ,,	...
ঐ	ঐ	ঐ	কুসঙ্গে ,,	...
ঐ	ঐ	ঐ (৩৯)	দূরের পাল্লা (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৭৮)	হরফ রিপাবলিক ,, —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	হসন্তিকা

* ঈষৎ পরিবর্তিত।

** ঈষৎ পরিবর্তিত ও দীর্ঘায়িত।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩২৩	কার্ত্তিক	ভারতী (৭৫৩)	*শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্র সারঃ (কবিতা) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৭৬৭)	সিগার সঙ্গীত ঐ —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	ঐ
ঐ	অগ্রহায়ণ	প্রবাসী (২০৩)	মা ফলেষু কদাচন (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	পৌষ	ঐ (২৩০)	পরখ ঐ	...
ঐ	ঐ	ঐ (২৫৮)	মহানামন্ (কবিতা)	বিদায়-আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৯১)	যুগোত্তর সাহিত্য (প্রবন্ধ) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...
ঐ	মাঘ	প্রবাসী (৩৩৬)	ছুঁচ ও তলোয়ার —(কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ভারতী (১০৫৫)	কেরাণীস্থানের জাতীয় সঙ্গীত (কবিতা) —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	হসন্তিকা
ঐ	পৌষপার্ব্বণ		(কবিতাগ্রন্থ)	ঐ
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৮১০)	শ্রদ্ধা-হোম (কবিতা)	বেলা শেষের গান
১৩২৪	ভাদ্র	প্রবাসী (৪৫৬)	জমির মালিক (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ভারতী (৪৫৯)	হিন্দোল-বিলাস (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫২৮)	দাবীর চিঠি ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৫৩৪)	বাঙালী পল্টনের গান ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৫৮৩)	তেলুগু গান (কবিতা-গুচ্ছ, অনুবাদ) ক—সন্ধ্যা প্রদীপ, খ—মন্দির দ্বারে	...
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫৯২)	দো-রোখা একাদশী (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (৪৩২)	মুসলমানের কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ)	...

* ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও দীর্ঘায়িতরূপে পুনর্মুদ্রিত। প্রথম প্রকাশ—প্রবাসী, ১৩২২, মাঘ, (৪১৭)

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
			ক—ভাব গ্রাহী খ—মেষ পালক ও হজরত মুসা গ—আমি-তুমির পারে	
১৩২৫	বৈশাখ	প্রবাসী (৬১)	মাতা মনু (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ভারতী (৩)	জয়ধ্বনি ঐ	...
ঐ	ঐ	ঐ (৪)	ছন্দ সরস্বতী (প্রবন্ধ)	...
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	প্রবাসী (১৩৮)	হঠাতের হুল্লোড় (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (১৪৫)	ভাটনেরার যুদ্ধ (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ভারতী (১৭৭)	স্বপ্ন-সুন্দরী (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	প্রবাসী (১৭৮)	মালা চন্দন ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	শ্রাবণ	ঐ (৪৩৬)	আটকে বাঁধা ঐ	...
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৫০১)	শরতের গান ঐ	...
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫৩৫)	আঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ সঙ্গীত (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৫৩৬)	ভিক্ষার দীক্ষা ঐ	...
ঐ	ঐ	ঐ (৫৪৫)	মাওরী জাতির যুদ্ধ সঙ্গীত ঐ	...
ঐ	ঐ	ঐ (৫৫৭)	গিরি রাণী (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	কার্ত্তিক	ভারতী (৫১৯)	শরৎ সুন্দরী ঐ	...
ঐ	পৌষ	প্রবাসী (২৬৮)	দীপক (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ভারতী (৭৪৭)	কবির তিরোধান (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	মাঘ	প্রবাসী (৩২৬)	কাফ্রি কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ)	......
			ক সূর্য্যোদয়ের প্রার্থনা খ—সাঁঝাই গ—অ-অ-অ- ঘ—কাফ্রি আত্মা ঙ—মানুষের জীবন চ—নিদ্রার প্রতি	
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (৪৩৯)	নব জীবনের গান (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৪৫৪)	বিশপ লেক্রয় (কবিতা)	...

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম		গ্রন্থের নাম
১৩২৫	ফাল্গুন	ভারতী (৮৪৮)	পাতিল প্রমাদ বা প্রসহ্য প্রতিবাদ	(কবিতা)	বিদায় আরতি
১৩২৬	আষাঢ়	ঐ (২০০)	বুদ্ধ পূর্ণিমা	ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (২৪৩)	নীরব নিবেদন	ঐ	বিদায় আরতি
ঐ		ভারতী (৩০৮)	মার্কিন কবিতা	(কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	শ্রাবণ	প্রবাসী (৩৭১)	অরুন্ধতী	(কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ভাদ্র	ঐ (৫০৪)	দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা	ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	অগ্রহায়ণ	ঐ (১৫৯)	সমালোচনা—জোনাকীর আলো —স	(প্রবন্ধ)	...
ঐ	পৌষ	ঐ (২১৫)	সিঙ্হলে সূর্য্যোদয়	(কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী (৭২৬)	ঝর্ণার গান	ঐ	ঐ
ঐ	মাঘ	প্রবাসী (৩৪৮)	নরম-গরম-সংবাদ	ঐ	ঐ
ঐ	ফাল্গুন	ভারতী (৮৪৫)	ধূপের ধোঁয়ায়	(নাটিকা)	ধূপের ধোঁয়ায়
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৫৬৪)	হাতকল —স	(প্রবন্ধ)	ঐ
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৯৮)	সাল তামামী	(কবিতা)	বেলা শেষের গান
১৩২৭	বৈশাখ	ভারতী (৩)	সাল পহেলী	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৯৭)	বর্ষ বোধন	ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	শ্রাবণ	সবুজ পত্র (২৩৩)	চিঠি	ঐ	
ঐ	ভাদ্র	ভারতী (৩৬৩)	ময়ূর মাতন	ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৩৭৮)	তিলক	ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৪১৯)	বর্ষার মশা	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৪৬৯)	সর্ব্ব দমন	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৪৮২)	একটি তামিল কবিতা	(কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ভাদ্র	প্রবাসী (৪৮৬)	ছন্দ-হিন্দোল	(কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৪৮৯)	স্বদেশ-প্রীতি	(কবিতা, অনুবাদ)	...

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩২৭	আশ্বিন	ভারতী (৪৭০)	ভোরাই (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫৬৩)	মল্লিকুমারী ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৫৭২)	করিবার কিছু নাই (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (২৫)	ইন্‌সাফ (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৩০)	রাজা কারিগর ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৩৭)	সাঁঝাই ঐ	,,
ঐ	ঐ	ভারতী (৫৪৯)	আলোর পাথার ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৫৯০)	ভোমরার গান ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৬০৪)	প্রশ্নোত্তর (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	মাঘ	প্রবাসী (৩৩৭)	কবি দেবেন্দ্র (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৩৪৬)	যুক্ত বেণী ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৩৪৯)	একটি চামেলির প্রতি ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৩৫১)	ইচ্ছামুক্তি ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৩৭৯)	বুদ্ধ বরণ ঐ	,,
ঐ	ঐ	ঐ (৩৮১)	বড়দিনে ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী (৭৯৩)	সরযূ ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৮১৫)	ঘুম্‌তী নদী ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৮২১)	কোনো নেতার প্রতি ঐ	,,
ঐ	ফাল্গুন	প্রবাসী (৪৫৭)	কোনো ধর্ম্ম ধ্বজের প্রতি ঐ	,,
ঐ	ঐ	ঐ (৪৬৪)	শিরাজ-ই-হিন্দ্‌ ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৪৬৮)	ফরিয়াদ ঐ	,,
ঐ	ঐ	ভারতী (৮৮৯)	হিন্দুস্থান (কবিতা, অনুবাদ)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৮৯০)	বারোয়ারী উপন্যাস (উপন্যাস)	বারোয়ারী
ঐ	চৈত্র	প্রবাসী (৫২০)	চরকার গান (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী (৯৪৫)	আখেরী (কবিতা)	বেলা শেষের গান
১৩২৮	বৈশাখ	ঐ (৩১)	কয়েকটি গান ঐ	,,

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
			(১—৩০)	
১৩২৮	বৈশাখ	প্রবাসী (৭৪)	সুরার কাহিনী (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	শ্রাবণ	ঐ (৫৬৯)	প্রজাতন্ত্রের রাজকবি (প্রবন্ধ ও কবিতা)	...
ঐ	আশ্বিন	ভারতী (৫৪৫)	নমস্কার (কবিতা)	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৫৬২)	গান্ধিজী ঐ	*ঐ
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (৬০৪)	ভীম জননী ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ (৬৩৮)	স্কন্দ-ধাত্রী ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	পৌষ	ঐ (৮০৫)	সুশ্বেতা ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ	ঐ	ঐ (৮৩৩)	চরকার আরতি ঐ	ঐ
ঐ	মাঘ	ঐ (৯৩৯)	কয়াধু ঐ	বিদায় আরতি
ঐ	ফাল্গুন	ঐ (১০৩৭)	ভারতের আরতি ঐ	বেলা শেষের গান
ঐ			উপন্যাস	বারোয়ারী
১৩২৯	বৈশাখ	ঐ (৪)	কে ! (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	আষাঢ়	ঐ (৩০২)	জ্যৈষ্ঠী মধু ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	**ঝরণা	ঝর্ণা ঐ	ঐ
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৩৮৮)	†ঝর্ণা ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৬০০)	†ঝর্ণা ঐ	ঐ
ঐ	ফাল্গুন	ভারতী (৯৯৯)	বিদেশী কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ)	...
			(১—৯)	
ঐ	চৈত্র	ঐ (১১২৬)	ঐ ঐ	...
			(১—৬)	
১৩৩০	বৈশাখ	প্রবাসী (৫৯)	কবি জুবিলি (কবিতা)	†† বেলা শেষের গান
ঐ	জ্যৈষ্ঠ	প্রবাসী (২১৯)	গান ঐ	বিদায় আরতি

* ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

** দ্রঃ—ভারতী ১৩২৯, শ্রাবণ, পৃঃ ৩৮৮।

† পুনর্মুদ্রিত। প্রথম প্রকাশ—'ঝরণা' ১৩২৯, আষাঢ়।

†† ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩৩০	জ্যৈষ্ঠ	ঐ (২৩৯)	বৈশাখের গান (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ভারতী	গান (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ)	...
			ক—গান খ—ভুল ভাঙা	
			গ—সুন্দরীর অর্ঘ্য ঘ—নির্ব্বিরোধ ও স্বর্গ	
			ঙ—পাকা মুসলমান চ—মৃত্যু ও টেক্স	
			ছ—বিরাট মানব জ—শিশু ঝ—মূর্খ	
ঐ	আষাঢ়	প্রবাসী (২৮৯)	ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)	...
ঐ	ঐ	ঐ (৩৬০)	মুর্ত্তি মেখলা (কবিতা)	বিদায় আরতি
ঐ	ঐ	ঐ (৪০০)	সিংহ বাহিনী ঐ	ঐ
ঐ	শ্রাবণ	ভারতী (৩০৪)	বিদেশী কবিতা (কবিতাগুচ্ছ, অনুবাদ)	
			ক—দুরাশা খ—ভালবাসা	
			গ—বন্ধুতা ঘ—যৌবন ও মদিরা	
			ঙ—যুবক ভিক্ষুক চ—আপ্তোপদেশ	
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৪৪১)	ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)	...
ঐ	ভাদ্র	ভারতী (৩৯৫)	ফুলশর (কবিতা)	...
ঐ	ঐ	ঐ (ঐ)	গাঁয়ের মানুষ ঐ	...
ঐ	ঐ	প্রবাসী (৫৯৮)	ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)	...
ঐ	আশ্বিন	ঐ (৭৬১)	ঐ ঐ	...
ঐ	আষাঢ়	ভারতী (১৯৯)	গান (কবিতা)	
ঐ			(কবিতা গ্রন্থ)	বেলা শেষের গান
১৩৩১			ঐ	বিদায় আরতি
১৩৩৬	শ্রাবণ		(নাটক)	ধূপের ধোঁয়ায়
১৩৩৭	ঐ	বিচিত্রা (১৪৯)	কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম (কবিতা)	...
ঐ	ভাদ্র	ঐ (২৮৫)	গুঞ্জামালা (কবিতা)	...
ঐ	আশ্বিন	ঐ (৪২৮)	নাথু-সর্দ্দার (নাটিকা, ভাবানুবাদ)	...
ঐ	কার্ত্তিক	ঐ (৫৭৩)	দেবরাত (কবিতা)	...

সাল	মাস	পত্রিকা	রচনার নাম	গ্রন্থের নাম
১৩৩৭	অগ্রহায়ণ	বিচিত্রা (৭১৮)	নটকবি গিরিশচন্দ্র (কবিতা)	...
ঐ	পৌষ	ঐ (৩)	বিশ্বরূপ ঐ	...
ঐ			(কবিতা সঞ্চয়ন)	কাব্য-সঞ্চয়ন
১৩৪৯	অগ্রহায়ণ	প্রবাসী (১৫২)	লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ (পত্রগুচ্ছ)—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	...
ঐ	মাঘ	ঐ (৩২৬)	ঐ	
১৩৫২	বৈশাখ		(কবিতা সঞ্চয়ন)	সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা
১৩৬০	আশ্বিন	কল্পতরু	(অপ্রকাশিত কবিতা)	

ক—পাটের ফুল খ—শেয়াল কাঁটা
গ—টগর ফুল

—(শান্তি পালের সৌজন্যে)

পরিশিষ্ট—খ

সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিমতের তালিকা

(বর্ণানুক্রমিক)

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সত্যেন্দ্র', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩০৯

২। অমলচন্দ্র হোম—'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি', ভারতবর্ষ ১৩২৯ ভাদ্র

৩। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র'

৪। অশোকবিজয় রাহা—'কাব্যের শিল্পরূপ' বৈশাখী ১৩৫০

৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩২৯ আষাঢ় ২২, বুধবার

৬। কমলা দাশগুপ্ত—'সমাজতান্ত্রিক সত্যেন্দ্রনাথ' (?), সমসাময়িক ১৩৬২ কার্ত্তিক

৭। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—'সত্যেন্দ্র-স্মরণে', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১০

৮। কাজী নজরুল ইসলাম—'কবি-সত্যেন্দ্র', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৩

৯। ঐ —'ফণি-মনসা'

১০। কালিদাস রায়—'সত্যেন্দ্র-স্মরণে', ভারতী ১৩৩০ আষাঢ়, পৃ ২৪৩

১১। কালীচরণ মিত্র—'সত্যেন্দ্রনাথের কথা', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৯

১২। ঐ—'স্বর্গারোহণে', ভারতী ১৩৩০ আষাঢ়, পৃ ২৪১

১৩। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—'স্মরণে', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৭

১৪। কুমুদরঞ্জন মল্লিক—'কবি সত্যেন্দ্রনাথ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৮

১৫। শ্রীগঃ—'সমালোচনা—কুহু ও কেকা', ভারতী ১৩২৯ আশ্বিন, পৃ ৬৬৮

১৬। গিরিজাকুমার বসু—'সত্যেন্দ্র স্মৃতি', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৮

১৭। গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়—'রঙ্গমল্লী', ভারতী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২০৩

১৮। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'সত্যেন্দ্র পরিচয়', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৮৩

১৯। ঐ—'কবি-পরিচয়', ভূমিকা—বিদায়-আরতি

২০। শ্রীচুনীলাল মিত্র এম. এ. বি. টি.—'কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা', উদ্বোধন ৪৯ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৫৩ মাঘ, পৃ ৪৫

২১। দিলীপকুমার রায়—'অনামী'

২২। ঐ—'ছান্দসিকী'

২৩। দেবীদাস মুখোপাধ্যায়—'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৬

২৪। নরেন্দ্র দেব—'সত্যেন্দ্র নামা', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৬

২৫। ঐ—'সত্যেন্দ্রনাথ', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৬

২৬। ঐ—'সত্যেন্দ্র পরিচয়', ভারতবর্ষ ১৩৩৭ আষাঢ়

২৭। প্রবাসী—'?', 'পুস্তক পরিচয়—মণি মঞ্জুষা', ১৩২২ আশ্বিন পৃ ৮২২

২৮। ঐ—'পুস্তক-পরিচয়—রঙ্গমল্লী', ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৫০

২৯। ঐ—'পুস্তক-পরিচয়—হসন্তিকা', ১৩২৪ চৈত্র, পৃ ৬০১

৩০। ঐ—'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—তীর্থরেণু', ১৩২৪ চৈত্র, পৃ ৬০১

৩১। ঐ—'সঙ্কলন ও সমালোচন—আমরা', ১৩১৮ শ্রাবণ, পৃ ৪৩৭

৩২। ঐ—'সঙ্কলন ও সমালোচন—সবুজ সমাধি', ১৩১৮ শ্রাবণ, পৃ ৪৩৫

৩৩। ঐ—'সমালোচনা—দৃষ্টিহারা', ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৫০

৩৪। প্রবোধচন্দ্র সেন—'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'

৩৫। প্রমথ চৌধুরী—উৎসর্গ পত্র—'পদচারণ'

৩৬। ঐ—'৺সত্যেন্দ্রনাথ', সবুজ পত্র ১৩২৯ আষাঢ়, পৃ ৬২৮

৩৭। প্রমথ নাথ বিশী—'বাংলার লেখক—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর'

৩৮। প্রিয়ম্বদা দেবী—'সত্য', ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১১

৩৯। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—'সত্যেন্দ্র-তর্পণ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৫

৪০। বুদ্ধদেব বসু—'সাহিত্য চর্চা—বাংলা ছন্দ'

৪১। বুদ্ধদেব বসু—'An Acre of Green Grass'
৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্য-সাধক চরিত মালা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর'
৪৩। ঐ—'ঐ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'
৪৪। ভারতী—'উদীয়মান-কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', ১৩১৮ ভাদ্র, পৃ ৪৯৬
৪৫। ভারতী—'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩০৭
৪৬। ভারতী—'সমালোচনা—তীর্থরেণু', ১৩১৭ আশ্বিন, পৃ ৫৩২
৪৭। ঐ—'সমালোচনা—ফুলের ফসল', ১৩১৮ অশ্বিন, পৃ ৬২৭
৪৮। ঐ—১৩২৩ আশ্বিন, পৃ ৭১৪
৪৯। মুদ্রারাক্ষস—'পুস্তক পরিচয়—অভ্র-আবীর', প্রবাসী ১৩২৩ অগ্রহায়ণ, পৃ ২০৪
৫০। ঐ—'ঐ—কুহু ও কেকা', প্রবাসী ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ ৬৯৪
৫১। ঐ—'ঐ—তুলির লিখন', প্রবাসী ১৩২১ আশ্বিন, পৃ ৭৮১
৫২। ঐ—'ঐ—বেলাশেষের গান', প্রবাসী ১৩৩০ কার্ত্তিক, পৃ ১২১
৫৩। মোহিতলাল মজুমদার—'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ২য় সংস্করণ
৫৪। ঐ —'কবি করুণানিধানের কবিতা', বিচিত্রা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ
৫৫। ঐ —'কাব্য-মঞ্জুষা'
৫৬। ঐ —'বাংলা কবিতার ছন্দ'
৫৭। ঐ —'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১২
৫৮। যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—'সত্যেন্দ্র-তর্পণ', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১৬
৫৯। যতীন্দ্রমোহন বাগচী—'কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৮
৬০। যতীন্দ্রমোহন বাগচী— 'ঐ', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৩১০
৬১। ঐ —'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য'
৬২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছন্দ'
৬৩। ঐ —'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৪

৬৪। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'ঐতিহাসিক উপন্যাস', প্রবাসী ১৩৩০ মাঘ, পৃ ৪৫৩

৬৫। শান্তি ভট্টাচার্য—'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ', বসুমতী ১৩৫৭ চৈত্র, পৃ ৮২৯

৬৬। সত্যব্রত শর্ম্মা—'সমালোচনা—জন্মদুঃখী', ভারতী ১৩১৯ আশ্বিন, পৃ ৬৭০

৬৭। সমালোচক—'সমালোচনা—চীনেরধূপ', ভারতী ১৩১৯ কার্ত্তিক, পৃ ৭৮৭

৬৮। সু—'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৮

৬৯। সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় খণ্ড

৭০। সুধীর কুমার মিত্র—'সত্যেন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মকথা', বিচিত্রা ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ ৭৯৫

৭১। সুনীলময় ঘোষ—'সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বরূপ', ঊষা ১৩৬১, ১১শ-১২শ সংখ্যা, পৃ ৪১৭

৭২। সুবোধচন্দ্র রায়—'মহাপ্রস্থান', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৯৭

৭৩। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'পরলোকে কবি সত্যেন্দ্র', ভারতী ১৩২৯ পৃ ৩১৭

৭৪। ঐ—'সত্যেন্দ্র-স্মরণে', প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ ৫৭৭

৭৫। সুরেশচন্দ্র রায়—'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ', প্রবাসী ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৫২

৭৬। ঐ ঐ, ঐ, মাঘ, পৃ ৩২৬

৭৭। সৈয়দ আলী আহ্‌সান—'কবি সত্যেন্দ্রনাথ', পরিচয় ১৩৪৮ পৌষ পৃ ৫১২

৭৮। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—'সত্যেন্দ্র-স্মরণে', ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ৩৯৪

৭৯। হরপ্রসাদ মিত্র—'কবি সত্যেন্দ্রনাথের কথা', শারদীয় জনসেবক ১৩৬১, পৃ ১১৫

৮০। ঐ—'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ'

পরিশিষ্ট—গ

প্রমাণপঞ্জী

(বর্ণানুক্রমিক তালিকা)

১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক. খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের হাস্যরস

২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ক. ত্রিবেণী। খ. হাসির গান

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ক. রবীন্দ্র জীবনী ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

৪। প্রমথ চৌধুরী

ক. সনেট-পঞ্চাশৎ

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক. কড়ি ও কোমল। খ. মানসী। গ. চিত্রা

ঘ. চৈতালি। ঙ. কল্পনা। চ. নৈবেদ্য।

ছ. উৎসর্গ। জ. বলাকা। ঝ. পলাতকা।

ঞ. পূরবী। ট. মহুয়া। ঠ. পরিশেষ।

ড. আধুনিক সাহিত্য

৬। সাহিত্য পরিষৎ

ক. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড

৭। J. Logie Robertson, M. A.

ক. Selections From Burns.

পরিশিষ্ট—ঘ

বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা